জ্ঞানগঞ্জ

ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ

জ্ঞানগঞ্জ

ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ

প্রাচী

রাম শঙ্কর ভট্টাচার্য্য
৬ ই আগাষ্ট ২০০৬

জ্ঞানগঞ্জ

মহামহোপাধ্যায়

ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ

এম্. এ. ডি লিট্

(পদ্মবিভূষণ)

প্রাচী পাবলিকেশনস্

Gayanganj

Dr. Gopinath Kaviraj

প্রকাশক ঃ
জয়দীপ রায়চৌধুরী
প্রাচী পাবলিকেশন্স
বাকসারা, হাওড়া ৭১১ ১১০
ফোন ঃ ২৬৫৮-০০৮৪

চতুর্থ সংস্করণ (বইমেলা ২০০৫)

প্রচ্ছদ ঃ শ্রী অজয় ঘোষ

অক্ষর বিন্যাস ঃ
ইমেজ প্রসেসর
ফোন ঃ ২৩৫১-৯৩৭২

মূল্য ঃ ৬০ টাকা মাত্র।

প্রকাশকের নিবেদন

ভৌমলীলা যেমন আছে, সেইরূপ অপ্রাকৃত লীলাও আছে ; ইহা শ্রমসাধ্য নিঃসন্দেহ। "অপ্রাকৃত" ভূমি-দিব্যভূমি ; সেখানে জড়া, ব্যাধি ও মৃত্যু নাই। উহা চিন্ময়ভূমি কোনক্রমে ঐ ভূমিতে স্থানলাভ বা দর্শন করিতে হইলে তপস্যা ও যোগের মাধ্যম ব্যতীত সম্ভব নয়।

যাঁহারা তথায় বাস করেন তাঁহারা সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান। শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস, শ্রীশ্রীরামঠাকুর, শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী, শ্রীশ্রীরামদাস কাঠিয়াবাবা, শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী ও শ্রীশ্রীত্রৈলঙ্গ স্বামী, কালীপদ গুহরায় ও অন্যান্য বহু মহাপুরুষের জীবন বহুভাবে তথায় অপ্রাকৃত আত্মার সঙ্গে-যোগযুক্ত ছিলেন। প্রাকৃত ভূমি যেমন আছে তেমনি অপ্রাকৃত ভূমিও আছে।

জ্ঞানগঞ্জ বা জ্ঞানপীঠ নামক স্থান বলিতে অষ্টপাশ বা সকল প্রকার পাশমুক্ত স্থানকেই বুঝিয়া থাকি ; হিমালয়ের বিভিন্ন অংশ দক্ষিণ ভারতের কিছু কিছু পর্বতের উপর সমুদ্রতীরবর্তী-অঞ্চলে পূর্ব-ভারতের আসামের "কামাখ্যা" ও জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে তিব্বতের বিভিন্ন অংশে পাঞ্জাব ও কাশ্মীর অঞ্চলে নৈনিতাল ও নেপালের মধ্যবর্তী পূর্ণগিরি অঞ্চলে সাধক, যোগীদের বাসভূমি. ইহা ছাড়াও বিন্ধ্যাচল, গির্ণার, ভৈরবঘাট, শ্রীশৈলম প্রভৃতি স্থানের সঙ্গে জ্ঞানগঞ্জ বা জ্ঞানপীঠের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠভাবে যেমন আছে—তেমনই সমস্ত তীর্থাদির সঙ্গে পরম্পরা রূপে এবং সাধনক্ষেত্রে বা তপভূমির সঙ্গে এই জ্ঞানগঞ্জ বা জ্ঞানপীঠের যোগ অবিচ্ছেদ্য, এই সকল স্থান সাধু, সন্ত, সন্ন্যাসী, যোগী, পরমহংসগণ, কুমারী ও ভৈরবী মাতাদের আবির্ভাব সহজেই হইয়া থাকে উপরন্তু বুভুক্ষুগণ এই সকল স্থানের মাহাত্মের সঙ্গে পরিচিত হয়ে পরিতৃপ্ত হন।

গোপীনাথ কবিরাজের বহুগ্রন্থে জ্ঞানগঞ্জের প্রসঙ্গের কথা উল্লেখ আছে — তা'ছাড়াও পরমগুরু শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের অধিকাংশ লীলাতে এবং ব্যবহারিক জীবনেও জ্ঞানগঞ্জের সমস্ত নির্দেশনার কথা লিখিত আছে। এই স্থানগুলোতে নানাশ্রেণীর সাধুসন্ত, বিভিন্ন প্রকার শক্তির অধিকারী হইলেও সকলেই পুজ্য ও মহাশ্বৈর্যপূর্ণ। পুরুষদেহে ও নারীদেহে যাঁহারা বাস করেন তাঁহাদিগকে পরমহংস বা ভৈরবী মাতা নামে পরিচিত। এই ভূমিসকল অপ্রাকৃত অথচ

প্রাকৃতভূমির সংগেই সর্বদা সম্বন্ধযুক্ত। জ্ঞানগঞ্জের নির্দেশ অনুসারেই সবকিছুর গবেষণার ও সব কার্য প্রতিমুহূর্তে পরিচালিত হইতেছে এখানে এই সকল পরম যোগিগণের এবং পরমযোগিণীদের আজ্ঞা বহনকারীরা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া আছেন। তাঁহাদের আজ্ঞা-অনুসারেই যোগীশিক্ষা ও বিশেষ জ্ঞান লাভ করিবার অধিকার জন্মে। কোন কোন বিশেষ ভূমিতে তাঁহাদের আজ্ঞা ব্যতিরেকে ঐ সকল স্থানে যাতায়াত করা সম্ভব নয়। একমাত্র সাধু সন্তগণই পরমযোগসিদ্ধি মহাপুরুষগণ সেখানে যাইতে সক্ষম।

জ্ঞানগঞ্জের প্রধান কার্যালয় মনোহর তীর্থ নামে পরিচিত। তা অতি দুর্গম হইলেও অত্যন্ত রমণীয় স্থান ; ইহা জ্ঞানগঞ্জের অন্যান্য পরমহংসদেবের গুরুদেব ব্রহ্মর্ষি "মহাতপার" আসন তাই ইহাই একমাত্র পরমসিদ্ধ যোগীদিগের মহাতীর্থ।

পরম গুরুদেব শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের মুখে উমা ভৈরবী, ত্রিপুরা ভৈরবী প্রভৃতি মাতাগণের নাম উল্লেখ আছে, ইহা ছাড়াও ক্ষেপা ভৈরবী নামে একমাতার বয়স বর্তমানে প্রায় ১২০০ (বারশত) বৎসর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পরমহংসদেবগণ ও ভৈরবীমাতাগণ নানা স্থানে এবং জ্ঞানগঞ্জেই অধিক সময় বাস করেন ; নির্দেশানুসারে তাঁহারা মনোহর তীর্থেও গমন করনে। জ্ঞানগঞ্জ এবং জ্ঞানপীঠের পরমহংসদেবগণ বা যোগিগণ সর্বদা যোগযুক্ত থাকাতে তাঁহাদের সর্বদাই থাকে। রোগ, শোক নাই বলিলেই চলে উপরন্তু তাঁহাদের কোনা অভাব নাই।

পরমগুরুদেব শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব অন্যান্য জ্ঞানগঞ্জ ও জ্ঞানপীঠগুলির মধ্যে একটির কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন যে জলন্ধর (পাঞ্জাব) হইতে গোগা পর্যন্ত যানবাহন আছে তারপর হাঁটিয়া যাইতে হয়। দুইমাস সময় লাগে। উত্তর তিব্বতের কথাও উল্লেখ আছে।

জ্ঞানগঞ্জে সর্বদাই আনন্দ। নিরানন্দ কিছু নাই ওখানে রশ্মি চন্দ্রের মতো শ্রীনিমানন্দ পরমহংসদেব তাঁহাকে (পরমগুরুদেবকে) জ্ঞানগঞ্জে প্রথম লইয়া গিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীভৃগুরাম পরমহংসদেব তাঁহাকে যোগশিক্ষা দেন। শ্রীশ্যামানন্দ পরমহংসদেব বিজ্ঞানের শিক্ষা দেন। এই সমস্ত ঘটনা যাঁহাদের লইয়া ঘটিয়াছিল তাঁহার মধ্যে শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংদেব ও শ্রীশ্রীরামঠাকুরের সংস্পর্শে গোপীনাথ কবিরাজ আসিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব গোপীনাথ কবিরাজের গুরুদেব। রামঠাকুরের সঙ্গে গোপীনাথ কবিরাজের পরিচয় হয় ১৯২৩ সালে। তিনি ঠাকুর মহাশয়কে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন, উপরন্তু ঠাকুর মহাশয় কাশীতে আসিলে পর কবিরাজ মহাশয় নিত্য তাঁহার সঙ্গ করিতেন। ঠাকুর মহাশয়ের নিকট হিমালয়

শমণের অত্যাশ্চর্য কাহিনীসমূহ শ্রবণ করিয়া তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছিল যে হিমালয়ের কৌশিকী আশ্রম, জ্ঞানগঞ্জের ন্যায় কোন্ স্থান। পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য সেইহেতু এই পুস্তিকাতে তাঁহার লিখিত শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ ও রামঠাকুরের অত্যাশ্চর্য জীবনী সন্নিবেশিত হইয়াছে।

ভারতবিশ্রুত মণীষী ও সাধক মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজের পরিচয় কাহারো বলিবার অপেক্ষা রাখে না। এ দেশের অধ্যাত্ম সাধনার মর্মকেন্দ্র বারাণসীতে তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ রহিয়াছেন। উচ্চকোটী সাধকদের সান্নিধ্যে, কৃপা ও সৌহার্দ্য লাভের সুযোগ ও তাঁহার কম হয় নাই।

এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু মহাপুরুষদের অলৌকিক জীবনতত্ত্ব, সূক্ষ্মলোকের. দিব্য অনুভূতি ও আত্মিক উপলব্ধি, আর এইসব বর্ণিত হইয়াছে ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের লেখনী মুখে---তাঁহার অসামান্য প্রতিভা, ভূয়োদর্শন ও বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধির সাহায্যে। এই মহামূল্যবান গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আর বেশী কিছু বলার প্রয়োজন নাই।

আজিকার দিনের দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় জীবনে এই ধরনের আধ্যাত্ম-সাহিত্যে সত্যকার শান্তি ও কল্যাণ আনয়নে সাহায্যে করিবে, ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এই বিশ্বাসই এই ধরনের মহৎ গ্রন্থ প্রকাশনার কাজে আমাদের প্রেরণা যোগাইয়াছে।

"ইতি"
প্রকাশক

সূচিপত্র

শ্রীশ্রী স্বামী অভয়ানন্দ পরমহংস (আনুমানিক ১৯১২ খৃঃ)

জ্ঞানগঞ্জ

তৎস্থানং কোটি-ব্রহ্মাণ্ড-মহাশূণ্যাদ্ বিলক্ষণম্
মানং তস্যাপি কিমপি বিদ্যতে নৈব শাম্ভবি ।।
তত্র ভূমিং স্বপ্রকাশামাকাশঞ্চ তথাবিধম্।
জলং তথাবিধং বিদ্ধি তেজশ্চৈব তথাবিধম্ ইত্যাদি।।

তদ্রূপ বাস্তব জ্ঞানগঞ্জের ভূমি আকাশ জল তেজ সবই স্বপ্রকাশ, অর্থাৎ সেখানে মাটি নাই, আকাশ প্রভৃতিও নাই, একমাত্র চৈতন্যই ভূমি প্রভৃতিরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। যেটি ব্যবহারিক জ্ঞানগঞ্জ সেইটি সিদ্ধ পুরুষ প্রভৃতির পরিচিত, কিন্তু যেটি পারমার্থিক জ্ঞানগঞ্জ সেটি যোগের চরম শিখরে উত্থিত না হইলে উপলব্ধি করা যায় না। তাই বলা হয় তিব্বতের স্থান বিশেষে জ্ঞানগঞ্জ অবস্থিত যেখানে অধিষ্ঠাতৃ বর্গের সহানুভূতি না থাকিলে প্রবেশ করা যায় না। এমন কি সে স্থানের সন্ধানও পাওয়া যায় না।

পারমার্থিক জ্ঞানগঞ্জের সন্ধান সকলের পক্ষে জানা সম্ভপর নহে। তবে কেহ কেহ যে জ্ঞানগঞ্জের সন্ধান প্রাপ্ত হন বলিয়াা শুনিতে পাওয়া যায় তাহা ব্যবহারিক জ্ঞানগঞ্জের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট জানিতে হইবে।"

তিব্বতে অবস্থিত "সত্য জ্ঞানাশ্রম" বা "জ্ঞানমঠ" নামক গুপ্ত মঠের কথা উল্লিখিত হইয়া তাহা জ্ঞানগঞ্জের সহিত সংসৃষ্ট বলিয়া মনে হয়। এই মঠ হিমালয়ের উপরে তিব্বত প্রান্তে অবস্থিত। ইহার পাঁচ মাইল ব্যবধানে চিরতুষার প্রদেশ। এই মঠে যে প্রকার জ্ঞান পাওয়া যায় তাহার তুলনা পৃথিবীতে আর কোন স্থানে নাই। প্রসিদ্ধ আছে যে রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকালে সিদ্ধপুরী, আমপুরী ও জ্ঞানপুরী নামক তিনজন পর্যটক ভ্রমণ করিতে করিতে ব্রহ্মদেশে কিছুদিন অবস্থানের পর এই গুপ্তস্থানে আসিয়া স্থায়ীভাবে বাস করিতে আরম্ভ করেন। এখানে যোগ, অমৃতসিদ্ধি অন্যান্য বিজ্ঞান বিষয়ক তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হইত।

গুরুদেব জ্ঞানগঞ্জের যেরূপ বর্ণনা দিয়াছিলেন, ঠাকুর মহাশয়ের কৌশিকী আশ্রমের বর্ণনা অনেকাংশে অনুরূপ ছিল।

সিদ্ধভূমি অনেক আছে—শাস্ত্র পাঠে তাদের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং কোন কোন শক্তিশালী মহাত্মা নিজের জীবনে ঐ সম্বন্ধে কিছু কিছু প্রত্যক্ষ অনুভব ও প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কথিত আছে, যে জ্ঞানগঞ্জ আমাদের এই পরিচিত পৃথিবীর একটি গুপ্ত স্থান বিশেষ-কিন্তু ইহা এমন গুপ্ত যে, বিশিষ্ট শক্তির বিকাশ না হইলে এবং ঐ

স্থানের অধিষ্ঠাতার অনুজ্ঞা না হইলে মর্ত্য জীবের এইস্থান দৃষ্টিগোচর হয় না। সিদ্ধভূমি মাত্রেরই ইহাই বৈশিষ্ট্য। সিদ্ধভূমি স্বয়ং প্রকাশ হইলে জীব ঐ স্থান হইতে কোন প্রকার শক্তির আনুকূল্যপ্রাপ্ত না হয় তাহাদের পক্ষে উহার দুর্ভেদ্য ভেদ করা অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

জ্ঞানগঞ্জের আলোচনাকালে স্মরণ রাখা উচিত যে, এই স্থান সাধারণ ভৌগোলিক স্থানের ন্যায় নহে। ইহা যদিও গুপ্ত ভাবে ভূ-পৃষ্ঠে বিদ্যমান আছে তথাপি ইহার প্রকৃত স্বরূপ বহুদূরে। প্রকৃত যোগী ভিন্ন এই স্থানের সন্ধান কেহ পাইতে পারে না, ইহাতে প্রবেশ লাভ করা তো দূরের কথা। তবে অধিকারিগণের অনুগ্রহ হইলে এই জগতের সাধারণ মানুষও সেখানে যাইতে সমর্থ হয়। ভৌম জ্ঞানগঞ্জ কৈলাসের পরে এবং উর্দ্ধে অবস্থিত। কিন্তু তাহা হইলে ও উহা সাধারণ পর্যটকের গতিবিধির অতীত। জ্ঞানগঞ্জ, রাজরাজেশ্বরী মঠ, এবং পরম গুরুদেবের শ্রীমন্দির স্তরবিন্যাসের দৃষ্টিতে বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত। জ্ঞানগঞ্জই সকলের নিম্নস্তর, রাজ-রাজেশ্বরী মঠ মধ্য স্তর এবং পরমগুরু মহাতপার স্থান সর্ব্বোচ্চ। এই স্থানটি যোগী নির্মিত। জ্ঞানগঞ্জ ও তেমনি যোগী বিশেষের তীব্রতম যোগ সাধনার প্রভাবে বিশ্বকল্যাণের মহালক্ষ্য পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছে।

প্রথমটিকে আমরা গুরুধাম অথবা গুরুরাজ্য বলিয়া নামকরণ করিয়াছি— দ্বিতীয়টিকে জ্ঞানগঞ্জ বলিয়াছি এবং তৃতীয়টির কোন নাম নির্দেশ করি নাই, কারণ উহা এখনও অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্ত অবস্থায় ফুটিয়া উঠে নাই, প্রথম যোগভূমিরূপ গুরুরাজ্যটি আগম শাস্ত্রে বিশুদ্ধ, অধবা নামে সাঙ্কেতিক ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

জ্ঞানগঞ্জের সত্তা বাস্তবিক পক্ষে গুরুরাজ্যেরও অতীত। যথার্থভাবে দেখিতে গেলে এই জ্ঞানগঞ্জই উচ্চতর গুরুরাজ্যের ভূমিস্বরূপ, অর্থাৎ জ্ঞানগঞ্জ হইতে জ্ঞানগঞ্জের লক্ষ্যস্থান পরমা-প্রকৃতি পর্য্যন্ত যে বিশাল রাজ্য রহিয়াছে তাহা পূর্বে জ্যোতি মাত্র ছিল, রাজ্যরূপে পরিণত ছিল না, কিন্তু উহা মহা খণ্ডযোগীর কালদেহানুষ্ঠিত কর্মের প্রভাবে রাজ্যরূপ ধারণ করিয়াছে। পুস্তকে ইহাই বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে।

জ্ঞানগঞ্জের উপর আলোকপাত ও শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দের জীবনী

যে মহাপুরুষের পুণ্যময় স্মৃতি আলোচনা করিবার জন্য আজ প্রবৃত্ত হইয়াছি, তিনি একজন আদর্শ চরিত্র মুক্তযোগী। এই প্রকার শুদ্ধ ও পবিত্র জীবন, কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির পরাকাষ্ঠা, ও মাধুর্য্যের অপূর্ব সম্মিলন, জগতে অতি বিরল। তাঁহার পুণ্যজীবন পর্য্যালোচনা করিয়া নিজে ধন্য হইব, এই আশাতেই আজ এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিতে উদ্যত হইয়াছি। তাঁহার জীবন-চরিত লিখিবার ধৃষ্টতা আমার নাই। যাঁহার লোকাতীত জীবনের এক কণা বুঝিতে পারিলে মনে হয় এ জীবন সফল হইল, যাঁহার অসংখ্য বিভূতির দুই একটি সামান্য স্ফুরণমাত্র প্রত্যক্ষ দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়, যাঁহার স্থূল দেহ পর্য্যন্ত আমাদের সূক্ষ্মতম বিচারের অনায়ত্ত, তাঁহার জীবনচরিত রচনা করিবার প্রবৃত্তি আমার হইতে পারে না।

জীবন-চরিত রচনা বড় কঠিন জিনিস; কঠিন কেন, বোধ হয় এক প্রকার অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। একজনের জীবন আর এক জনে ঠিক ঠিক বুঝিয়া লিখিতে পারে কি না, তাহা সন্দেহের বিষয়। নিজের জীবন নিজেই সম্যক্ বুঝিতে পারা যায় না, অন্যে তাহার কতটুকু বুঝিবে! যে যতই জ্ঞানী হয় ততই তাহার নিজের জীবনও তাহার নিকট রহস্যময় মনে হইতে থাকে। যে বিরাট শক্তি জগতের অন্তরে বাহিরে, অণু ও মহতে খেলা করিতেছে, যাহার খেলা আমরা শুধু অহংকার প্রযুক্ত মোহের আবরণ বশতঃ দেখিতে পাই না, তাহা যে প্রতি জীবনে খেলিতেছে তাহাতে আর সন্দেহ কি? আমরা বুঝিতে না পারিলেও তাহাকে অস্বীকার করিতে পারি না। অহংকারনিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে সেই বিরাট শক্তির ক্রীড়া যে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে সমর্থ হয়, জীবনের প্রতি ক্ষুদ্র ঘটনাতেও সে মহিমার আভাস দেখিতে পায়, মহাশক্তির খেলা দেখিয়া সে ধন্য হইয়া যায়।

যতদিন পর্য্যন্ত অহংকার দ্বারা দৃষ্টি আচ্ছন্ন থাকে ততদিন পর্য্যন্ত জীবন-চরিত রচনার চেষ্টা হইতে পারে, হইয়াও থাকে। কিন্তু তাহার পরে আর হয় না। তাই মহাপুরুষগণের জীবন-চরিত নাই; যাহা আছে, তাহা কতকগুলি প্রাণহীন স্থূল ঘটনার সন্নিবেশ মাত্র। তাহা বৃত্তান্ত হইতে পারে, কিন্তু জীবন নহে।

বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো নু বিজ্ঞাতুমর্হতি।।

ভবভূতির এই বর্ণনা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। লোকোত্তর পুরুষের চিত্ত বজ্র হইতেও কঠোর, আবার কুসুম হইতেও কোমল। উহাতে একই সময়ে বিরুদ্ধ গুণের সমাবেশ

দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবান্ যেমন যাবতীয় বিরোধের একাধার, অথচ তিনি গুণাতীত ও নির্লিপ্ত, তাঁহার ভক্তগণও সেই প্রকার। কে তাঁহাদের চরিত্র-বর্ণনার সাহসী হইবে?

কাল-প্রভাবে সদ্ধর্মের আদর্শ মলিন হইয়া গিয়াছে। মনুষ্য ঋষিজনোচিত দিব্যভাব হইতে চ্যুত হইয়া জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য ভুলিয়া গিয়াছে, অসারকে সার বিবেচনা করিয়া তাহারই অন্বেষণে অমূল্য সময় ও শক্তি ব্যয় করিতেছে। শাস্ত্রে ও ঋষিবাক্যে বিশ্বাস হারাইয়াছে—সে তপস্যা নাই, সে সরলতা নাই, সত্যের সহিত পরিচয় না থাকাতে সে শ্রদ্ধা ও সত্যানুরাগও নাই। তাহার দেহ অশুদ্ধ, মন অপবিত্র, হৃদয় সংকীর্ণ, দৃষ্টি ক্ষীণ ও বুদ্ধি জড়ভাবাপন্ন। সে কি কখনও ধর্মের যথার্থ রূপ দেখিতে পারে? দেখিতে পারে না বলিয়াই তাহার সংশয় কাটেনা, বিচারের মোহ ছোটে না, সত্যের উদার ও মাধুর্য্যময় রূপের আকর্ষণ অনুভবে আসে না। সেইজন্যই তাহার বিক্ষিপ্তচিত্তের চাঞ্চল্য কোন উপায়ে দূরীভূত হয় না। যে সুধার আস্বাদনের জন্য অমরধামের অধীশ্বর হইতে ক্ষুদ্রতম কীট পর্যন্ত নিরন্তর সতৃষ্ণভাবে নানাদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, যাহার ক্ষীণ আভাস পাইলেও মুগ্ধ জীব ক্ষণিকের জন্য নিজেকে কৃতকৃত্য মনে করে, যাহা না পাওয়া পর্যন্ত সে কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করে না, তাহার অশান্তিরও বিরাম হয় না, বাসনা-বদ্ধ বহির্ম্মুখ জীবকে সেই অমৃতধারা পান করাইবার জন্য যুগে যুগে মহাপুরুষগণ কল্যাণময়ী জগন্মাতার প্রেরণাতে মর্ত্যভূমিতে সদ্‌গুরুরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন।

আমি জানি, এ স্মৃতি-চর্চা করিবার অধিকার আমার নাই। শুচি ও সংযত না হইয়া যেমন দেবগৃহে প্রবেশ ও দেবার্চনা করিতে পারা যায় না, সেই প্রকার মলিন ও চঞ্চল অন্তঃকরণের পক্ষে পুণ্যশ্লোক মহাপুরুষের স্মরণও নিষিদ্ধ। ইহা জানিয়াও, নিজের অযোগ্যতা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াও—আমি যে বর্তমান প্রসঙ্গালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহার কারণ আছে।

যিনি যোগ ও বিজ্ঞানের উচ্চ শিখরে আরূঢ় হইয়া শাস্ত্রের রহস্যসকল নিজের অচিন্ত্য বিভূতি-বলে যোগ্য অধিকারীকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া ও বুঝাইয়া দিতে সমর্থ, যিনি আদর্শ যোগী, আদর্শজ্ঞানী ও আদর্শ ভক্ত, যিনি মন্ত্রার্থবিৎ সত্যসংকল্প মহাত্মা, যিনি পরমতত্ত্বের প্রদর্শক ভগবানের অনুগ্রহশক্তির সঞ্চারিণী মূর্ত্তিস্বরূপ, যিনি ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া এই ত্রিবিধ স্ফুরণাত্মক মহাত্রিকোণের মধ্যবিন্দুতে সামঞ্জস্যময় অবস্থার অধিষ্ঠাতা, যাঁহার নিকটে দেশ ও কালের সত্তা অলীক ও কল্পিত—এক কথায় যিনি প্রকৃত সদ্‌গুরু শ্রীভগবানের প্রকটরূপ। তাঁহারই কৃপায় আজ যেন আমরা তাঁহাকে বুঝিয়া তাঁহারই প্রদর্শিত পথে, তাঁহারই উদ্দেশ্যে জীবনের পথে অগ্রসর হইতে পারি।

অগ্নি যেমন নিজের সঙ্গ প্রভাবে অশুদ্ধ বস্তুকেও উপেক্ষা বা অনাদর না করিয়া আত্মসাৎ করিয়া পবিত্র করিয়া লয়, তেমনই মহাপুরুষের বিশুদ্ধ সঙ্গ কলুষিত চিত্তকেও অনুকূলভাবে অবশ্যই প্রভাবিত করিবে—এই আমার ভরসা। শ্রীভগবানের করুণার উপরে দীন ও পতিত জনেরও দাবী আছে। অশুদ্ধদেহে শিশু যেমন পবিত্রতা বা অপবিত্রতার বিচার না করিয়া গর্ভধারিণীর অঙ্কে উঠিবার জন্য ব্যাকুলভাবে কর প্রসারণ করে, জননীও তেমনই ঐ প্রকার শিশুকে অঙ্কে উঠাইতে কখনই দ্বিধা বোধ করেন না। মাতৃ-অঙ্কের এমনই অপূর্ব্ব মহিমা যে, উহার পূতস্পর্শে শিশুর মল-ক্ষালন আপনা-আপনিই সম্পন্ন হইয়া যায়।

বিন্ধ্যাচল হইতে প্রায় ষোল মাইল দূরে একটি আশ্রম ছিল,—সেখানে বহুসংখ্যক সাধু মহাত্মা সমবেত হইয়াছিলেন। তখন সেখানে একটি গুহাতে শ্যামা ভৈরবী মাতা অবস্থান করিতেছিলেন। যুবকদ্বয় একদিন মাত্র সেখানে থাকিলেন। ভৈরবী মাতা উভয়ের খুব যত্ন করিলেন ও আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কিছুকাল পরে মহাপুরুষ পুনর্ব্বার আসিয়া তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইতেই দেখিতে পাইলেন—এক অপূর্ব-স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন—উত্তরাপথের মধ্যে এ একটি প্রসিদ্ধ অথচ অতি দুর্গম যোগাশ্রম।

চারিদিকে উত্তুঙ্গ পর্ব্বতমালা নীল মেঘরাজির ন্যায় শোভা পাইতেছে, মধ্যে মধ্যে নির্ঝরিণী ও গিরিনদী ঝংকার সহকারে প্রবাহিত হইতেছে। উপত্যকার মধ্যস্থলে প্রায় ৭/৮ মাইল স্থান ব্যাপিয়া একটি বিরাট আশ্রম। আশ্রমের চারিদিকে প্রাকার বেষ্টন, প্রাকারের চারিদিকে জলপূর্ণ পরিখা, বাহিরের সঙ্গে যাতায়াতের জন্য পরিখার উপরে একটি রমণীয় ধনুরাকার সেতু। আশ্রমটি স্তরে স্তরে সজ্জীকৃত,—শিক্ষার ক্রম অনুসারে স্তরগুলি সজ্জিত। আশ্রমে যোগ ও বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা অতি চমৎকার। দীক্ষার পরে শিক্ষার জন্য ব্রহ্মচর্য্য অবস্থায় অধিকাংশ সময় এইস্থানে সকলকেই অতিবাহিত করিতে হয়। বিজ্ঞানের বিভাগটি স্বতন্ত্র—তাহা সম্পূর্ণরূপে একজন পৃথক আচার্য্যের অধীন। তাঁহার নাম শ্রীশ্রীমৎ শ্যামানন্দ পরমহংস। আশ্রমের মুখ্য অধিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ পরমহংস। এই স্থানটি অতি পুরাতন, প্রবাদ আছে ইহার প্রাচীন নাম—"ইন্দ্রভবন" ছিল। পরে ৫/৬ শত বৎসর পূর্ব্বে এই প্রাচীন স্থানের সংস্কার করিয়া পূজনীয় শ্রীযুক্ত জ্ঞানানন্দ স্বামী ইহার ব্যবস্থা ও সংরক্ষণের ভাব গ্রহণ করেন। এখনও তিনিই ইহার মুখ্য অধিষ্ঠাতা আছেন। এখানে বহুসংখ্যক লোক অবস্থান করেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত শ্রেণী উল্লেখযোগ্য—

১। ব্রহ্মচারী যুবক।

২। কুমারী। ইঁহারাও ব্রহ্মচারিণী।

৩। বিজ্ঞান-শিক্ষার্থী। ইঁহাদের অধিকাংশই প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত।

৪। সিদ্ধ পরমহংস। এই শ্রেণীর যে সকল মহাত্মা এখানে আছেন তাঁহাদের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। ইহাদের বয়ক্রম খুব অধিক, এত অধিক যে সাধারণ লোকের বিশ্বাসযোগ্য নহে। ২০০/৩০০ হইতে সহস্রাধিক বৎসরের লোকও এখানে বর্তমান আছেন। সিদ্ধ মহাপুরুযগণের মধ্যে অনেকেই 'আহার' করেন না—তবে যাঁহারা ততটা উৎকর্য লাভ করেন নাই তাঁহারা সামান্য কিছু গ্রহণ করে মাত্র।

ভোলানাথ জ্ঞানগঞ্জে ৮/১০ দিন থাকিলে পূজ্যপাদ নীমানন্দ স্বামী আপন গুরুদেব শ্রীশ্রীমৎ মহাতপার নিকটে তাহাকে লইয়া যান ও তাঁহার সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। শুনিতে পাওয়া যায়, মহাতপার বয়স প্রায় ১২০০ বৎসর অতীত হইয়াছে। তিনি একজন অতি-শক্তিশালী মহাযোগী পুরুষ। তিনি সাধারণতঃ উক্ত যোগাশ্রমে থাকেন না। তাঁহার কোন আশ্রম নাই। তিব্বতে যে স্থানে তিনি থাকেন সেখানে একটি গুহা আছে—তাহাতে রাজরাজেশ্বরী দেবীর পাষাণমূর্ত্তি স্থাপিত আছে, তাই তাহাকে 'রাজরাজেশ্বরী মঠ' বলা হয়। বস্তুতঃ সেখানে ঘর-বাড়ী কিছুই নাই। সেখানে যাঁহারা থাকেন তাঁহাদের ঘর-বাড়ীর আবশ্যকতাও নাই। মহর্যি মহাতপা অধিকাংশ সময় এই স্থানেই বাস করেন—কদাচিৎ যোগাশ্রমে আসেন। কখন কখন আপন গুরু-মাতা ক্ষেপামাইর নিকট মনোহর তীর্থেও গমন করেন। হিমবৎ প্রদেশে উক্ত যোগাশ্রমের ন্যায় আরও কয়েকটি মঠ আছে। সেগুলিও রাজরাজেশ্বরীর শাসনভুক্ত। মহর্যি সাধারণতঃ কথাবার্তা বড় বলেন না, সর্বদাই আপনভাবে বিলীন থাকেন,—বাহ্য জগতের কোন সংবাদ রাখেন না। তাঁহার প্রধান শিষ্য শ্রীশ্রীমদ্‌ভৃগুরাম পরমহংসদেব ঐ সকল মঠের প্রধান অধিষ্ঠাতা ও কার্যকর্তা। তিনি পরিদর্শক, নিয়ামক, পরীক্ষক—একাধারে সবই।

আমরা পরমহংস নীমানন্দ, শ্যামানন্দ ও জ্ঞানানন্দের কথা বলিয়াছি—তাঁহারা এই ভৃগুরাম স্বামীরই গুরুভ্রাতা। তবে যোগৈশ্বর্য্যে ভৃগুরাম স্বামী একমেবাদ্বিতীয়ম্‌।

মহর্যি মহাতপাঃ ভোলানাথকে শিরঃস্পর্শ পূর্বক শক্তিসঞ্চার করিয়া বীজমন্ত্র দান করিলেন—দীক্ষা প্রদান করিয়া শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন। দীক্ষান্তে শিক্ষার জন্য কিছুদিন যোগাশ্রমে অবস্থান করিতে হয়। ওখানকার শিক্ষা-প্রণালী অতি-বিচিত্র। পরমহংস শ্যামানন্দের নিকট ভোলানাথ সূর্যবিজ্ঞান শিক্ষা করেন ও পরমহংস

ভৃগুরাম স্বামী তাঁহাকে যোগ শিক্ষা দেন। এই শিক্ষা দীর্ঘকালব্যাপী। বহুবৎসর পর্যন্ত অক্লান্ত অধ্যবসায়, অসীম ধৈর্য্য ও বিপুল পরিশ্রম সহকারে ভোলানাথ বিজ্ঞান ও যোগ উভয় বিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জ্জন করেন।

বিজ্ঞানের কথা শুনিয়া কেহ যেন মনে না করেন, ইহা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ন্যায় জড়-বিজ্ঞান। বস্তুতঃ জড় বলিয়া কোন পৃথক্ বস্তু নাই। যাহাকে আমরা সাধারণতঃ জড় বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকি, তাহাও একান্তভাবে জড় নহে। 'বিশিষ্ট-জ্ঞানই' বিজ্ঞান শব্দের অর্থ। তথাকথিত জড় ও চেতন। উভয়ই বিজ্ঞানের বিষয়। সূর্য্য ইহার কেন্দ্রস্বরূপ ও প্রধান আশ্রয় বলিয়া ইহাকে সূর্য্য-বিজ্ঞানও বলা হইয়া থাকে। শাস্ত্রে আছে যে, এমন একটি পদার্থ আছে যাহার জ্ঞান লাভ করিলে সর্ব-বিষয়ক বিজ্ঞান স্বতঃই উপলব্ধ হয়। শ্রুতির এই অনুশাসন ব্রহ্মবিজ্ঞান অবলম্বন করিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছে। কিন্তু সে বিজ্ঞানের স্বরূপ কি, কি উপায়ে তাহা কার্য্যক্ষেত্রে আয়ত্ত করিতে হয়, তাহা যিনি বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিয়াছেন, তিনি জানেন যে সূর্য্যই সকল প্রকার বিজ্ঞানের মূলস্তম্ভ। সৃষ্টি স্থিতি সংহার—এক কথায় জাগতিক ও ব্যবহারিক যাবতীয় ব্যাপারই সূর্য্যাধীন। ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির প্রসার সূর্য্য হইতেই হইতেছে। শুধু তাহাই নহে। সূর্য্যই দেবযান পথের লক্ষ্যস্বরূপ। ইঁহাকে মুক্তিদ্বার বলিয়া বর্ণনা করিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান—স্বরূপোপলব্ধি—করিতে হইলে সৌরতত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ একান্তভাবে আবশ্যক। অতএব যোগের যাহা চরম উদ্দেশ্য বিজ্ঞানেরও তাহাই। সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, বিজ্ঞানও এক প্রকার মহাযোগ এবং যাহাকে আমরা যোগ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকি, মূলতঃ তাহাও বিজ্ঞান ভিন্ন আর কিছু নহে। শুধু প্রণালীতে ভেদ আছে মাত্র। সুতরাং সাধকের পক্ষে উভয়ই সমভাবে আবশ্যক। যোগপথে বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানপথে যোগ পরম সহায়ক।

সূর্য্য-বিজ্ঞান আয়ত্ত হইলে অন্যান্য বিজ্ঞান—যাহা উহারই অঙ্গমাত্র—সহজেই আয়ত্ত হয়। যোগশাস্ত্রে সর্বজ্ঞাতৃত্ব এবং সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব নামক বিশিষ্ট সিদ্ধি যেমন যাবতীয় খণ্ডসিদ্ধির চরম উৎকর্ষ, বিজ্ঞান-রাজ্যে সৌর-বিজ্ঞানেরও তদ্রূপ প্রাধান্য লক্ষিত হয়। চন্দ্র-বিজ্ঞান, নক্ষত্র-বিজ্ঞান, বায়ু-বিজ্ঞান, স্বরবিজ্ঞান, দেব-বিজ্ঞান প্রভৃতি সৌর-বিজ্ঞানের অন্তর্গত খণ্ড-বিজ্ঞান বিশেষ।

ভোলানাথ অনন্যসাধারণ প্রতিভা-বলে যোগ ও বিজ্ঞান উভয়ক্ষেত্রে সমভাবে প্রবীণতা লাভ করেন। এরূপ মণিকাঞ্চনযোগ অন্যত্র দুর্লভ। প্রাচীন ঋষিগণের মধ্যে শিক্ষার যে উৎকর্ষ ছিল, তিনি গুরুকৃপা ও স্বীয় অধ্যবসায় বলে তাহাই উপার্জ্জন

করিয়াছেন। তাই জগৎ, জগদীশ্বর ও অনাদি মহাশক্তির রহস্য প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইয়াছেন—প্রাকৃতিক শক্তিমালাকে স্বকীয় ইচ্ছার বশবর্তিনী করিবার অধিকার লাভ করিয়াছেন, লক্ষ্য এবং নিজের মধ্যে কোনও প্রকার আবরণ থাকিতে দেন নাই। শুধু শাস্ত্রবাক্য শুনিয়া ধর্ম-জীবন লাভ হয় না। শাস্ত্রবাক্য আর্য হইলেও, এক হিসাবে অভ্রান্ত হইলেও পূর্ণজ্ঞান প্রসব করিতে পারে না। শুধু বাক্য হইতে বস্তু বিষয়ক প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে না, আর প্রত্যক্ষ ব্যতিরেকে আবরণ ভঙ্গও হয় না। গুরুপদেশ অবলম্বনপূর্বক ধৈর্য্য, শ্রদ্ধা, সংযম ও অধ্যবসায়ের সহিত অক্লান্ত ভাবে কঠোর তপস্যা করিয়া তিনি যে গভীর সত্য হৃদয়ের অন্তর্দেশে উপলব্ধি করিয়াছেন, যে সংশয়রহিত পরিপূর্ণ বিজ্ঞান-তত্ত্ব আয়ত্ত করিয়াছেন, তাহা শুধু গ্রন্থপাঠ দ্বারা সম্ভবপর হইত না।

ব্রহ্মচর্যের দ্বাদশবর্ষ কাল কঠিন পরিশ্রম করিয়া তিনি সাধনা করিয়াছেন। যে বিরাট শক্তি জগতের অন্তরে থাকিয়া অনন্যভাবে সমগ্র জগৎকে চালিত করিতেছেন, যাঁহার নিয়ন্ত্রণে চন্দ্র-সূর্য্য-নক্ষত্র-বায়ু-বরুণ প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থ স্ব-স্ব নির্দ্দিষ্ট কর্ম যথানিয়মে সম্পাদন করিয়া থাকে, তিলমাত্র কর্তব্যচ্যুত হইতে সমর্থ হয় না—যাঁহার মঙ্গলময় বিধানে সন্তান-প্রসবের পূর্ব হইতেই তাঁহার আহারের জন্য মাতৃস্তন্যে অমৃত-ধারার ব্যবস্থা হইয়া তাকে, সেই বিশ্বজননী আনন্দময়ী মহাশক্তির উপর নির্ভর করিতে পারিলে জীবের আর কোনও বিষয়ে চিন্তা করিবার আবশ্যকতা থাকে না। যখন সুখে-দুঃখে, উত্থানে-পতনে, অন্তরে-বাহিরে শয়নে-স্বপনে-জাগরণে সর্বাবস্থায় একমাত্র তাঁহারই মঙ্গলময় সত্তা প্রত্যক্ষ হয়, তখন ক্ষুদ্র অহঙ্কার সূর্যালোকে নক্ষত্রপংক্তির ন্যায় কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া যায় তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় জীবন এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়, যাহাতে সাধকের অহঙ্কার দমিত হইয়া প্রকৃত নির্ভরশীলতার উপলব্ধি ঘটিতে পারে সাধক নির্ভরশীল হইতে পারিলে তাহার কোন ভয় বা উদ্বেগ থাকে না—ভগবান স্বয়ংই তাহার যোগ-ক্ষেম বহন করিয়া থাকেন।

যোগবিভূতি সম্বন্ধে নানা লোকের নানা ধারণা আছে। এইস্থলে প্রসঙ্গতঃ মাত্র দুই একটি কথা বলা হইতেছে। আত্মজ্ঞানের উন্মেষ না হইলে প্রকৃত যোগবিভূতি প্রকাশিত হয় না। ভগাবন শঙ্করাচার্য্য তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'দক্ষিণামূর্তি-স্তোত্রে' 'সর্বাত্মভাব'কে মহাবিভূতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সুরেশ্বরাচার্য উহার বার্তিকে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে পুরুষ ধাবমান হইলে ছায়া যেমন তাহার অনুসরণ করে, তদ্রূপ আত্মা বা ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধ হইলে ঐশ্বর্য স্বভাবতঃই প্রকটিত হয়—আত্মা হইতে ঐশ্বর্যের পৃথক্ সত্তা নাই। ব্রহ্মচর্য অবস্থায় বিন্দুর শোধন ও স্থিরতা সম্পাদিত

হয়,—উহাই জীব দেহের সত্ত্ব। উহা শুদ্ধ ও স্থির হইলে, অর্থাৎ সাধনবলে দেহ শুদ্ধ হইলে—ভূতশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি অধিকৃত হইলে—সিদ্ধি সকল আপনিই উপস্থিত হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হয় না।

ভোলানাথ এই অবস্থায় যোগিজন বাঞ্ছিত অতীব দুর্লভ ও দুষ্কর নাভি-ধৌতি ক্রিয়া প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতি দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া ও কঠোর নিয়ম পালন করিয়া বহুপ্রকারের ক্ষমতাসম্পন্ন হইয়াও অনেকে নাভি-ধৌতির অধিকার লাভ করিতে পারেন না। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, প্রকৃত যোগমার্গে এই ক্রিয়ার স্থান কত উচ্চ। বলিতে গেলে, যোগের ইহাই একপ্রকার শেষ ক্রিয়া। কিরাত-ধৌতি নাভি-ধৌতিরই উন্নত অবস্থা বিশেষ। একটি মখমল বা অন্য কোন প্রকার শুদ্ধ বস্ত্রের ২৫/৩০ হাত দীর্ঘ খণ্ড গ্রহণ পূর্বক উহাকে নাভি হইতে মুখ পর্যন্ত যথাবিধি অনুলোম ও বিলোম প্রণালীতে পুনঃপুনঃ চালনা করিতে হয়। এই ধৌতি-কার্য্যে ভাল অভ্যাস না থাকিলে 'চাত্বর' বা আকাশ গমনের ক্ষমতা পূর্ণ হয় না। দীর্ঘকালের চেষ্টাতে প্রচলিত কুম্ভকের দ্বারাও উঠা যায় বটে, কিন্তু উত্থিত অবস্থায় কথাবার্তা বলা চলে না এমন কি কেহ কেহ বাহ্যজ্ঞান পর্যন্ত হারাইয়া বসেন। এতদ্ব্যতীত উর্দ্ধবায়ুমণ্ডলে চলিবার কালে সময় সময় প্রতিকূল প্রবাহশীল বায়ুর আঘাত লাগিয়া পতনের ভয় জন্মে। নাভি-ধৌতিতে পরিপক্কতা লাভ করিলে দেহ শূন্যময়* হইয়া যায়—সমগ্র দেহের সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করিবার ক্ষমতার বিকাশ হয়। তখন একটি লোমকূপের দ্বারে একটি অতি-বৃহৎ পদার্থ ও প্রবেশ করাইতে পারা যায়।* শরীরের যে কোন অংশকে তখন নিজের ইচ্ছানুসারে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ করিতে পারা যায়। কিরাত-ধৌতি দ্বারা দেহ শুদ্ধ করিয়া উহার কোন অঙ্গে বায়ু পূর্ণ করিয়া রাখার নামই কিরাত-কুম্ভক। এই কুম্ভকের বলে শূন্যে উঠিলে কথা বলিতে কোন বাধা হয় না, এমন কি কথা বলিতে বলিতেও উঠা যায়। বাহ্যজ্ঞান থাকে অথচ বাহ্যবিষয়ে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ততা জন্মে। নাসিকাদি দ্বারা বায়ুগ্রহণ করিলে সাধারণতঃ তাহা হয় না। পরকায়া প্রবেশাদির পক্ষেও সাধারণ কুম্ভক অপেক্ষা কিরাত-কুম্ভক অধিকতর উপযোগী। কিরাত-

---

* পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ভৃগুরাম পরমহংসদেব আকাশ-মার্গেই যাতায়াত করেন —তিনি কখনও ভূমি স্পর্শ করেন না। স্থূল দেহ লইয়া সূর্যালোকে গমন করিবার ক্ষমতা বর্তমান যুগে একমাত্র তাঁহারই আছে, এরূপ শুনিত পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, তাঁহার স্থূলদেহ আমাদের দেহের ন্যায় পাঞ্চভৌতিক ও যাট্‌কৌশিক দেহ নহে। ইহা 'সিদ্ধ দেহ'।

* এইজন্যই ''অমনস্ক'' ''যোগীবীজ'' প্রভৃতি যোগশাস্ত্রীয় গ্রন্থে 'যোগদেহ' কে 'আকাশ দেহ' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

কুম্ভকের দ্বারা যখন দেহে বিশুদ্ধ বায়ু ভরিয়া লওয়া যায়, তখন কিছুতেই অভিভূত করিতে পারে না। অতি প্রবল ও শক্তিশালী তেজোরাশির দর্শন ও সংস্পর্শেও তখন জ্ঞান নষ্ট হয় না।

১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে আমি সর্বপ্রথম বাবাজীর শ্রীচরণ দর্শন লাভ করি। সে আজ অনেক দিনের পুরাতন কথা। কিন্তু এখনও সেদিনটি আমার স্মৃতি ফলকে উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে। তখন অপরাহ্ন হইয়াছে, বেলা বোধ হয় চারটে হইবে। একটি বাঙ্গালী ব্রহ্মচারী যুবকের সহিত হনুমান ঘাটের সমীপস্থ আশ্রমে (দিলীপগঞ্জ, বিশুদ্ধানন্দ কুটির) দ্বিতল গৃহে আমি মহাপুরুষের সাক্ষাৎকারের জন্য গমন করি। যাইয়া দেখি, সমস্ত গৃহটি লোকে পরিপূর্ণ, একপ্রান্তে একখানা তক্তাপোষের উপর ব্যাঘ্রচর্মের আসনে মহাপুরুষ উপবিষ্ট আছেন। সুন্দর সদানন্দ মূর্তি, প্রসন্ন বদন, উজ্জ্বল চক্ষুঃ দীর্ঘ-বিলম্বিত শ্মশ্রু, প্রশস্ত ললাট, পরিধানে গৈরিক কৌষেয় বসন,— দেখিলেই মনে হয়, যেন প্রজ্ঞান ও করুণা মূর্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক ত্রিতাপ তাপিত মর্ত্যধামের উদ্ধার সাধনের জন্য অবতীর্ণ। ভারতীয় সিদ্ধ পুরুষ ও দার্শনিক মণ্ডলীর মধ্যে অগ্রগণ্য মহা-মহেশ্বর অভিনবগুপ্তপাদের কূর্চোজ্জ্বল শান্ত মূর্ত্তির স্মৃতি যে পবিত্র মূর্তি তৎশিষ্যগণ কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে—বাবাজীর দর্শনমাত্র আমার চিত্তে জাগিয়া উঠিয়াছিল। আমি ঘরে ঢুকিয়াই বাবাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পালঙ্কের সম্মুখে বামদিকে উপবেশন করিলাম। ব্রহ্মচারীজী একটু দূরে স্থান করিয়া বসিয়া পড়িলেন! বাবা আমার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় থাকি, কি করি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি উত্তর দিলাম আমি নবাগত,—বসিয়া সব দেখিতে লাগিলাম।

ঐ সময়ে বাবা সূর্যবিজ্ঞানের কিছু কিছু খেলা দেখাইতেছিলেন। সূর্য বিজ্ঞান কি তাহা জানিতাম না। পূর্বে শুনি নাই। শুনিলাম ইহার দ্বারা সৃষ্টি, সংরক্ষণ ও ধ্বংস সবই হইতে পারে। তিনি তিব্বতের অন্তঃপাতী জ্ঞান-গঞ্জ নামক গুপ্ত যোগাসনে যোগ সাধনার জন্য বহুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। তখন ঐখানে নানা প্রকার বিজ্ঞান-শিক্ষাও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ সকল বিজ্ঞানের মধ্যে সূর্য্য বিজ্ঞান মুখ্য। দেখিলাম ঘরের মধ্যে প্রার্থীর ইচ্ছামত কাহারও হাতে কাহারও রুমালে, কাহারও চাদরের খুটিতে নানা প্রকার সুন্দর সুন্দর গন্ধ শুধু দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি স্পর্শ দ্বারা দিতেছিলেন। এই সকল গন্ধ যে শুধু আকর্ষক ছিল তাহা নহে, এগুলি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইত। অনেক সময়ে কাপড় কাচিলেও গন্ধ দূর হইত না। যে যাহা চাহিতেছিল তাহাকে তাহাই দিতেছিলেন, চন্দন, গোলাপ, হেনা, খসখস, চম্পক, বেল, যুঁই প্রভৃতি নানা গন্ধ দিতেছিলেন। কাহারও কাহারও সঙ্গে যোগ ও আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গেও কথা

বলিতেছিলেন—জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দিতেছিলেন। কখন কেহ জ্ঞানগঞ্জ আশ্রম সম্বন্ধে কিছু জানিবার ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলে সে বিষয়েও সমুচিত উত্তর প্রদান করিতেছিলেন।

বহু ব্যাপার দেখিলাম, বহু রকম কথা শুনিলাম। ব্রহ্মচারীজী কিছুক্ষণ থাকিয়া চলিয়া গেলেন দেখিয়া ও শুনিয়া আমি বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলাম।* কারণ, ঐ প্রকার জোরের সহিত আমি কাহাকেও তত্ত্বোপদেশ দিতে দেখি নাই। ঐ প্রথম দর্শনেই আমার মন তাঁহার শ্রীচরণে নত হইয়া পড়িল। বুঝিলাম, আমি যাহা এতদিন অন্বেষণ করিতেছিলাম, এখানে তাহা পাইব। কবি বলিয়াছেন—"মনো হি জন্মান্তরসঙ্গতিজ্ঞম্,'। জন্মান্তরের সম্বন্ধমূলক সংস্কার সকল চিত্তক্ষেত্রে বিদ্যমান থাকে, পরে বিশিষ্ট উদ্দীপক কারণের যোগাযোগ হইলে ঐ সকল সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া স্মৃতিরূপে পরিণত হয়। তখন পূর্বজন্মের অনুভূত সম্বন্ধ প্রভৃতি চিত্তের আপেক্ষিক বিশুদ্ধি অনুসারে স্পষ্ট অথবা অস্পষ্টভাবে ভাসিয়া উঠে। বাবাজীকে দর্শন করিবামাত্রই আমার যেন বোধ হইতে লাগিল—'ইনি আমার চিরদিনের পরিচিত, যেন কত দিনের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ আজ অর্দ্ধ-স্বচ্ছ আবরণের ব্যবধান ভেদ করিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে।" তিনিও আমাকে প্রথম দর্শনের মুহূর্ত হইতেই অতি পরিচিতের ন্যায় স্নেহের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"বাবা, যোগশাস্ত্রে আছে যে প্রকৃতি বা উপাদানের

---

* এই বর্ণনার একটি শ্লোক এইরূপ —

আনন্দান্দোলিতাক্ষঃ স্ফুটকৃততিলকো
ভস্মনা ভালমধ্যে
রুদ্রাক্ষোল্লাসিকর্ণঃ কসিতকচভরো
মালয়া লম্বকূর্চঃ।
রক্তাঙ্গো যক্ষ—পঙ্কোল্লসদসিতগলো
লম্বমুক্তোপবীতঃ
ক্ষৌমং বাসো বসানঃ শাশিকরধবলং
বীরযোগাসনস্থঃ।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইহার প্রায় সতর বৎসর পরে শ্রীঅভিনব গুপ্তের সাক্ষাৎ শিষ্যপরম্পরার মধ্যে পরিগণিত সাধক শ্রেষ্ঠ কাশ্মীরের সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার বালকৃষ্ণ কৌলকে আমি তাঁহারই অনুরোধে শ্রীগুরুদেবের নিকট আনিয়া তাঁহার সহিত পরিচয় করাইয়া দিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। বালকৃষ্ণ কাশীস্থ তদানীন্তন হিন্দু কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাপক ছিলেন। বালকৃষ্ণ স্বয়ং ও অভিনবগুপ্তের ন্যায় লম্বকূর্চধারী ছিলেন।

আপূরণ—অনুপ্রবেশ বশতঃ একজাতীয় পদার্থ অন্যজাতীয় পদার্থে পরিণত হয় (জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাং')। ইহা কি প্রকারে সম্ভবপর?'' তিনি বলিলেন—হাঁ, তা হইতে পারে। জগতের সকল পদার্থেই সকল পদার্থের উপাদান আছে। এই যে গোলাপ ফুলটি দেখিতছে, ইহাতে না আছে এমন কোন পদার্থ এ জগতে নাই। তবে গোলাপের উপাদান ইহাতে অধিক মাত্রায় আছে এবং অন্যান্য উপাদান অল্পমাত্রায় আছে, সেইজন্য ইহাতে গোলাপের প্রাধান্যবশতঃ তাহারই ক্রিয়া লক্ষিত হয়। অন্যান্য উপাদানের সত্তা সাধারণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। কিন্তু যিনি যোগী অথবা বিজ্ঞানবিৎ তাঁহার দৃষ্টিতে সবই প্রতিভাত হয়। ইচ্ছা করিলেই তিনি ক্রিয়াকৌশলে যে কোন উপাদানকে বাহ্যজগৎ হইতে তাহার স্বজাতীয় উপাদান আকর্ষণপূর্বক পুষ্ট করিতে পারেন। পূর্বে যাহা অব্যক্ত ছিল, তখন তাহা অভিব্যক্ত হইবে এবং যাহা অভিব্যক্ত ছিল তাহা ক্রমশঃ অব্যক্ত হইয়া বিলয় প্রাপ্ত হইবে। এই প্রণালীতে জগতের যে কোন বস্তু যে কোন বস্তুতে পরিণত হইতে পারে। দেবভার হইতে পশুভাব-প্রাপ্তি আবার পশুভাব হইতে দেবভাব প্রাপ্তি—উভয়ই সম্ভবপর। প্রকৃতির গুণ-প্রধানভাবে হইতেই সৃষ্টির খেলা চলিতেছে। ''যে কোন বস্তুতে উপাদানগত আপেক্ষিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইলে উহা অদৃশ্য ও অব্যক্ত হইয়া যাইবে।'' এই বলিয়া তিনি পূর্বকথিত গোলাপটিকে একটি জবাফুলে পরিণত করিয়া যোগশাস্ত্রোক্ত জাত্যন্তর-পরিণাম বিজ্ঞানের দ্বারা প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিলেন।

ইহার পর প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে যাইতে লাগিলাম। বেলা পড়িয়া আসিলেই মন উচাটন হইয়া পড়িত, কোন লৌকিক কার্য ভাল লাগিত না, আশ্রমে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িতাম। তখন বৈকাল বেলা বাবাজী বেড়াইতে বাহির হইতেন, আমিও প্রায়ই সঙ্গে সঙ্গে যাইতাম। কখনও গঙ্গাতটে হনুমান ঘাট হইতে অসি-সঙ্গম পর্যন্ত, কখনও বা নৌকা-যোগে গঙ্গাবক্ষে পঞ্চগঙ্গা ঘাট হইতে অসি বা নাগোয়া পর্যন্ত, আবার কোন কোন দিন আদিকেশব পর্যন্ত বেড়াইয়া আসিতেন। এক এক দিন, কুরুক্ষেত্র ও দুর্গা-বাড়ীর পার্শ্ব দিয়া সঙ্কটমোচনের দিকে যাওয়া হইত। সঙ্গে অনেক লোক থাকিত। ঠিক সূর্য্যাস্তের সময় আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিতেন। সূর্য্যাস্তের পরে তিনি কখনই বাহিরে থাকিতেন না।

১৩২৪ সালে একদিন দিলীপ গঞ্জের আশ্রমে সাংখ্য দর্শনের কথা-প্রসঙ্গে প্রকৃতি ও পুরুষের তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিল। আমি বাবাজীকে কথা প্রসঙ্গে সৃষ্টি-তত্ত্বের বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তখন প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছিল। বাবাজী বলিলেন,—দুইটি জিনিষের সংঘর্ষ না হইলে কোন কার্য্য উৎপন্ন হয় না।

জগতে যে কোন বস্তু দেখিতে পাও, সব এই সংঘর্ষের ফলেই উৎপন্ন হইয়াছে ও হইতেছে। প্রকৃতি ও পুরুষের স্বরূপ বিচার এখন ছাড়িয়া দাও যাহা কিছু দেখিতে পাও সর্বত্রই এই নিয়ম প্রবল। সকল বস্তুতেই প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ের অংশ আছে— অণু পরমাণুতে পর্যন্ত এই বিভাগ রহিয়াছে। যাহাতে প্রকৃতির ভাগ অধিক, পুরুষের অংশ অল্প, তাহাতে পুরুষ-ভাব অভিভূত হইয়া থাকে, প্রকৃতিভাবে প্রাধান্য লাভ করে। সেই প্রকার পুরুষাংশের প্রাধান্যবশতঃ পুরুষভাবের বিকাশ হয়। সৃষ্ট পদার্থ মাত্রই দুইটি প্রতিকূল শক্তির সংঘর্ষ হইতে জাত হয় বলিয়া এই নিয়ম সর্বত্র বর্তমান।" বাবাজীর আসনে একটি গোলাপ ফুল পড়িয়া ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"বাবা, এই গোলাপ ফুলটি স্ত্রী কি পুরুষ? ইহাতে প্রকৃতির অংশ অধিক আছে, কি পুরুষের অংশ অধিক আছে।" তিনি গোলাপ ফুলটিকে হাতে লইয়া একবার তাকাইয়া দেখিলেন। পরে বলিলেন যে, এটি স্ত্রী-পুষ্প এবং স্ত্রীর লক্ষণাদি দেখাইয়া বুঝাইয়া দিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—"একটি পুরুষ গোলাপ আনিতে পার কি? তাহা হইলে একটি ব্যাপার দেখাইয়া বুঝাইয়া দিব।" সেখানে অন্য ফুল ছিল না। তখন অপরাহ্ন-ভ্রমণের জন্য বাহির হইবার সময় হইয়াছিল। আমি বলিলাম—'এখানে তো আর অন্য গোলাপ নাই। আপনি যদি আদেশ করেন তাহা হইলে বাহিরে যাইয়া আনিতে পারি।" তিনি বলিলেন—"থাক্—প্রয়োজন নাই। তুমি এই গোলাপ ফুলটির পাঁপড়িগুলি একটি একটি করিয়া খুলিয়া ফেল। তারপর ওটি আমাকে দাও।" আমি তাহাই করিলাম। বাবাজী দলহীন পুষ্পটিকে হাতে লইয়া দুই একবার উর্দ্ধাধঃ সঞ্চালন করিলেন, বলিলেন—"সূর্য্যরশ্মি অবলম্বনে পুং-গোলাপের বীজ আকর্ষণ করিয়া পুষ্পটির গর্ভাধান করিলাম। এখন এইটিকে একটি ক্ষুদ্র কোমল আবরণের মধ্যে অথবা তোমার মুষ্টির অভ্যন্তরে কয়েক মিনিট আবদ্ধ করিয়া রাখ। বাহিরের শীতলবায়ু যেন ইহাকে বিশেষভাবে স্পর্শ করিতে না পারে। দেখিবে, কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটি অভিনব, বৃহদাকার ও অত্যন্ত সুগন্ধি গোলাপের সৃষ্টি হইবে।" দলহীন ফুলটিকে আমি নিজের মুষ্টি-মধ্যে রাখিলাম ও মাঝে মাঝে একটু একটু খুলিয়া দেখিতে লাগিলাম। প্রায় পাঁচ মিনিট পরেই দেখিতে পাওয়া গেল যে, একটি অতি বৃহৎ গোলাপফুল নির্মিত হইয়াছে—ইহা আয়তনে ছিন্ন পুষ্পটির দ্বিগুণ হইবে। বর্ণ ও গন্ধেও উভয়ে অনেকটা প্রভেদ দেখিতে পাওয়া গেল।

তিনি বলিলেন "এই প্রকারে স্বভাবের নিয়মে সর্বত্রই প্রকৃতি পুরুষের যোগের সৃষ্টি হইতেছে। যিনি বিজ্ঞানবিদ, যিনি স্বভাবের উপাসক, স্বভাবের আরাধনা করিয়া—তিনিও ওই প্রকার সৃষ্টি-সাধন করিতে সমর্থ, উর্দ্ধতম স্তর হইতে সর্বনিম্নতম ভূমি পর্যন্ত সর্বত্রই তাঁহার শক্তি অব্যাহত"।

তখনও আমার দীক্ষা হয় নাই। একদিন সন্ধ্যাবেলা আহ্নিক করিতে উঠিবার কিছু পূর্বে আমি বাবার তক্তাপোষের পার্শ্বদেশে বসিয়া আছি। শাস্ত্রালাপ হইতেছিল। হঠাৎ বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি হার্টের অসুখ হইয়াছিল? এখনও তোমার হার্ট দুর্বল দেখিতেছি।" আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, 'হাঁ, বাবা' ছয় বৎসর পূর্বে আমার অসুখ হইয়াছিল। তাহার জন্য প্রায় এক বৎসর কাল আমাকে ভুগিতে হইয়াছে। অনেক কষ্ট পাইয়াছিলাম। তবে এখন অপেক্ষাকৃত ভাল আছি।" বাবা বলিলেন, দীক্ষা হইলে সব সারিয়া যাইবে, কোন চিন্তার কারণ নাই।" বলিয়া আমার খাদ্যক্রম সম্বন্ধে কিছু কিছু নিয়ম বলিয়া দিলেন। তাঁহারা এই অপ্রত্যাশিত করুণার নিদর্শন পাইয়া আমি ধন্য হইলাম।

আমি অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গ করিয়াছি। কোন কোন স্থানে অল্পবিস্তর প্রাণের আকর্ষণও যে না হইয়াছিল, তাহা নহে। বিশেষতঃ একজন মহাপুরুষের অপার্থিব কৃপা ও ভালবাসা আমি অযোগ্য হইয়াও প্রায় সাত বৎসর কাল অবিচ্ছিন্নভাবে ভোগ করিয়া আসিয়াছি। অনেক সময়ে তাঁহাকে আত্মজীবনের আদর্শ স্বরূপ বলিয়া মনে করিয়াছি ও নীরবে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছি। যেমন সাধনা, তেমন পাণ্ডিত্য (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নবীন ও প্রাচীন সর্ববিষয়ে), তেমন শাস্ত্র-বিশ্বাস, সদাচার ও উদার হৃদয় আমি পূর্বে আর কোথাও দেখি নাই।

ইঁনির নাম ভার্গব শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ। ইনি পরা অপরা বিদ্যায় এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় সমভাবে শিক্ষিত ছিলেন। ইঁহার পূর্বনাম শশিভূষণ সান্যাল ছিল। ইঁনি গৃহস্থ হইয়াও অন্তঃসন্ন্যাস সম্পন্ন ছিলেন। মনুষ্যত্বের একটি অক্ষুণ্ণ আদর্শ ইহারই জীবনে আমি প্রথমে উপলব্ধি করিয়াছিলাম। ইহার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় প্রায় আট বৎসর পূর্বে * তখন হইতেই ঘনিষ্ঠভাবে ইহার সঙ্গে আমি মিলামিশা করি এবং ইহার জীবনের প্রভাব আমার ব্যক্তিগত জীবনের উপর পতিত হইতে আরম্ভ হয়। পূজ্যপাদ রামদয়াল মজুমদার প্রভৃতি মহাত্মা ইহার সম্পর্কে আসিয়া

---

(১) যোগত্রয়ানন্দের জীবনী "সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ" নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে—বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

(২) আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ চার খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

(৩) মানবতত্ব একখানি অপরূপ গ্রন্থ। জনসাধারণের নিকট হইতে উপযুক্ত সাহায্য ও পরামর্শ পাইলে—এই অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল,

(৪) যোগত্রয়ানন্দের অন্যান্য মূল্যবান পুস্তক সমুহ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

(৫) রামদয়াল মজুমদারের "গীতা পরিচয়" প্রকাশিত হইয়াছে। ক্রমশঃ "গীতা" প্রকাশিত হইবে।

আধ্যাত্মিক জীবনে যথেষ্ট উপকার লাভ করিয়াছিলেন। মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে আমি ১৯০৬ সাল হইতেই পরিচিত ছিলাম এবং তাঁহার প্রবর্তিত "উৎসব পত্রিকা" প্রথম হইতেই আমার অধ্যাত্মজীবনের প্রধান সহায়ক ছিল। তিনিও যাঁহাকে গুরুরূপে শ্রদ্ধা করিতেন তিনি যে কত উচ্চস্তরের মহাপুরুষ তাহা আমি বুঝিতে না পারিলেও ধারণা করিয়া লইয়াছিলাম। ভার্গব শিবরামকিঙ্কর "আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপ" "মানবতত্ত্ব" প্রভৃতি গ্রন্থের সহিত আমি পূর্ব হইতেই পরিচিত ছিলাম। কিন্তু ইহার পবিত্র জীবনের তুলনায় ইহার অসামান্য পাণ্ডিত্যও তুচ্ছ মনে হইত। ইহার নিকট আমি লৌকিক ও অলৌকিক উভয় বিষয়ে ঋণী ছিলাম এবং ইহাকে আমি ধর্মজীবনের একপ্রকার উপদেষ্টা গুরু বলিয়াই মনে করিতাম।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁহার নিকটেও আমি কখনই দীক্ষা প্রার্থনা করি নাই। করিলেও তিনি দিতেন কিনা, তাহা জানি না। তবে আমার মনে হইত, আমার কাল পূর্ণ হইলে, যোগ্যতা অর্জ্জিত হইলে, আমি না চাহিলেও আমার প্রাপ্য বস্তু পাইবই। ভগবানের রাজ্যে কেহ কদাপি বাস্তবিক পক্ষে বঞ্চিত হইয়া থাকে না। তাই বাবাজী যখন সেদিন সন্ধ্যাবেলা ইঙ্গিতে আমার নিকট দীক্ষার কথা বলিলেন, হঠাৎ আমার মনে পূর্বভাব ফুটিয়া উঠিল। ভাবিলাম, হয়ত বা এবার সময় হইয়া থাকিবে। যদিও তিনি স্পষ্টতঃ আমাকে কিছুই বলেন নাই, তথাপি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা হইতেই আমি বুঝিয়া লইলাম যে, আমি একটু উন্মুখ হইলেই তিনি নিশ্চয়ই আমাকে কৃপা করিবেন। বুঝিলাম বটে; কিন্তু তখনও কিছুই প্রকাশ করিলাম না। এইভাবে কয়েক দিন কাটিয়া গেল। কত উপদেশ শুনিতাম, কত অলৌকিক ব্যাপার মধ্যে মধ্যে প্রত্যক্ষ করিতাম, ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। একদিন হরিশ্চন্দ্র ঘাটের নিকট দিয়া গঙ্গাতীরে সান্ধ্য ভ্রমণের সময় আমার মনে একটি প্রশ্ন উঠিল, আমি বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—" বাবা, যোগীর পরিচয় কি? যোগ সাধনা করিয়া কি প্রকারে বুঝিতে পারা যায় যে, যোগ সম্যক্ সিদ্ধ হইয়াছে? বাহিরের লোকই বা যোগীকে চিনিবে কি করিয়া? 'শুনিয়া বাবা একটু হাসিয়া বলিলেন, "বৎস, সে সব অনেক কথা— পরে বুঝিতে পারিবে। তবে সংক্ষেপে ইহা জানিয়া রাখ যে, প্রকৃত যোগী সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান হন। যিনি অসম্ভবকেও সম্ভব করিতে পারেন তিনি যোগী। যোগীর নিকটে কিছুই অসম্ভব থাকিতে পারে না।" আমি বলিলাম "এ তো ঈশ্বরের কথা আপনি বলিতেছেন। সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বশক্তিমত্তা ঈশ্বরের ধর্ম—মানুষের ধর্ম নহে। অসম্ভবকে সম্ভব করা মায়ার ব্যাপার,—মায়া ঈশ্বরের অধীন শক্তি-বিশেষ।" বাবা বলিলেন, "যোগীও তো তাই। ঈশ্বরত্ব বা ঐশ্বর্যের বিকাশ না হইলে মনুষ্য কদাপি যোগীপদবাচ্য হইতে পারে না। ঈশ্বরই যোগী যোগীই ঈশ্বর।"

বুঝিলাম কথাটি অতি সত্য। "আত্মার স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্য অবিদ্যার আবরণে আচ্ছন্ন রহিয়াছে বলিয়া তাহার চিত্তে তৃষ্ণা ও বাসনা নিরন্তর উত্থিত হইতেছে। অভাব না থাকিলে আকাঙ্ক্ষা জাগিবে কেন? কিন্তু অভাব তো কল্পিত—অজ্ঞান কাটিয়া গেলে কল্পনা থাকে না—কল্পিত অভাবও থাকে না যাহা থাকে, তাহা নিত্য ও স্থির সত্য। যোগবলে জ্ঞানের সঞ্চার হইলে অবিদ্যা নিবৃত্ত হয় ও আত্মার নিত্যৈশ্বর্য্যের বিকাশ হয়।*

একদিন কথা-প্রসঙ্গে পাতঞ্জল দর্শন ও তাহার ব্যাসভাষ্য সম্বন্ধে আলোচনা হয়। আমি বলিয়াছিলাম, "যোগ সম্বন্ধে,—শুধু যোগ কেন, গভীর মনোবিজ্ঞান সংক্রান্ত,—এরূপ গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় বিরল।' বাবা বলিলেন, "বৎস, গ্রন্থ ভাল কি মন্দ, সে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। গ্রন্থ হইতে জ্ঞান জন্মে না চিত্তের সংস্কার ব্যতিরেকে জ্ঞানের হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই। সদ্গুরু নির্দিষ্ট ক্রম ও প্রণালী অনুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে চিত্তের সংস্কার হইতে পারে না। অসংস্কৃত চিত্তে কি তত্ত্বজ্ঞানের বিকাশ হইতে পারে? শুষ্ক জ্ঞানের কোনই মূল্য নাই।" আমি জাত্যন্তর-পরিণামের কথা উঠাইলাম। বলিলাম, "দেখুন, বর্ত্তমান বিজ্ঞান-জগতে জাত্যন্তর-পরিণাম ও তাহার নিয়ামক কারণ সম্বন্ধে বহু প্রকার সমালোচনা হইয়াছে ও হইতেছে। প্রাণিজগৎ, উদ্ভিদ্জগৎ, এমন কি, স্থাবর জগতেও প্রাকৃতিক নিয়মে জাত্যন্তর সংঘটিত হইয়া থাকে। কখন ও কি ভাবে এই প্রকার পরিণাম ঘটিয়া থাকে, বৈজ্ঞানিকগণ তাহার আলোচনা করেন বটে, কিন্তু পরিণাম-রহস্য তাঁহার ব্যাখ্যা করিতে পারেন না। মূল কারণ তাঁহাদের দৃষ্টিতে গভীর কুহেলিকাচ্ছন্ন—সেই জন্যই এই পরিণামকে তাঁহারা স্বেচ্ছায়ত্ত করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু পাতঞ্জল দর্শনে ও ব্যাসভাষ্যে জাত্যন্তর-পরিণাম তত্ত্বের কারণ-রহস্যের উপপাদন আছে।" বাবা বলিলেন, "সত্য কথা, কিন্তু তাহাতেই বা লাভ কি? তুমি কি বলিতে চাও, পাতঞ্জল দর্শন পড়িয়া কেহ যোগী হইতে পারিবে? কেহ কি জাত্যন্তর-পরিণামের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা শুনিয়া পরিণামক্রম স্বায়ত্ত করিতে পারিবে কিংবা প্রাকৃতিক রহস্য কিয়ৎ পরিণামে উদ্ভিন্ন করিতে পারিবে? তাহা হইতে পারে না। কর্ম না করিলে কোন রহস্যই উদঘাটিত হইবার নহে। আচ্ছা, পাতঞ্জলে জাত্যন্তর সম্বন্ধে কি আছে, তাহা বল।" আমি বলিলাম, "এক জাতীয় বস্তুর অন্য জাতীয় বস্তুতে পরিণত হওয়াকে

---

* ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য সুরেশ্বরাচার্য্য বলিয়াছেন—"ঐশ্বর্যমীশ্বরত্বং হি তস্য নাস্তি পৃথক্স্থিতিঃ। পুরুষে ধাবমানেঽপি ছায়া তমনুধাবতি। অনন্তশক্তিরৈশ্বর্য্যং নিষ্যন্দাশ্চণিমাদয়ঃ। স্বস্যেশ্বরত্বে সংসিদ্ধি সিধ্যন্তি স্বয়মেব হি ॥—মানসোল্লাসঃ ১০—৪—৫
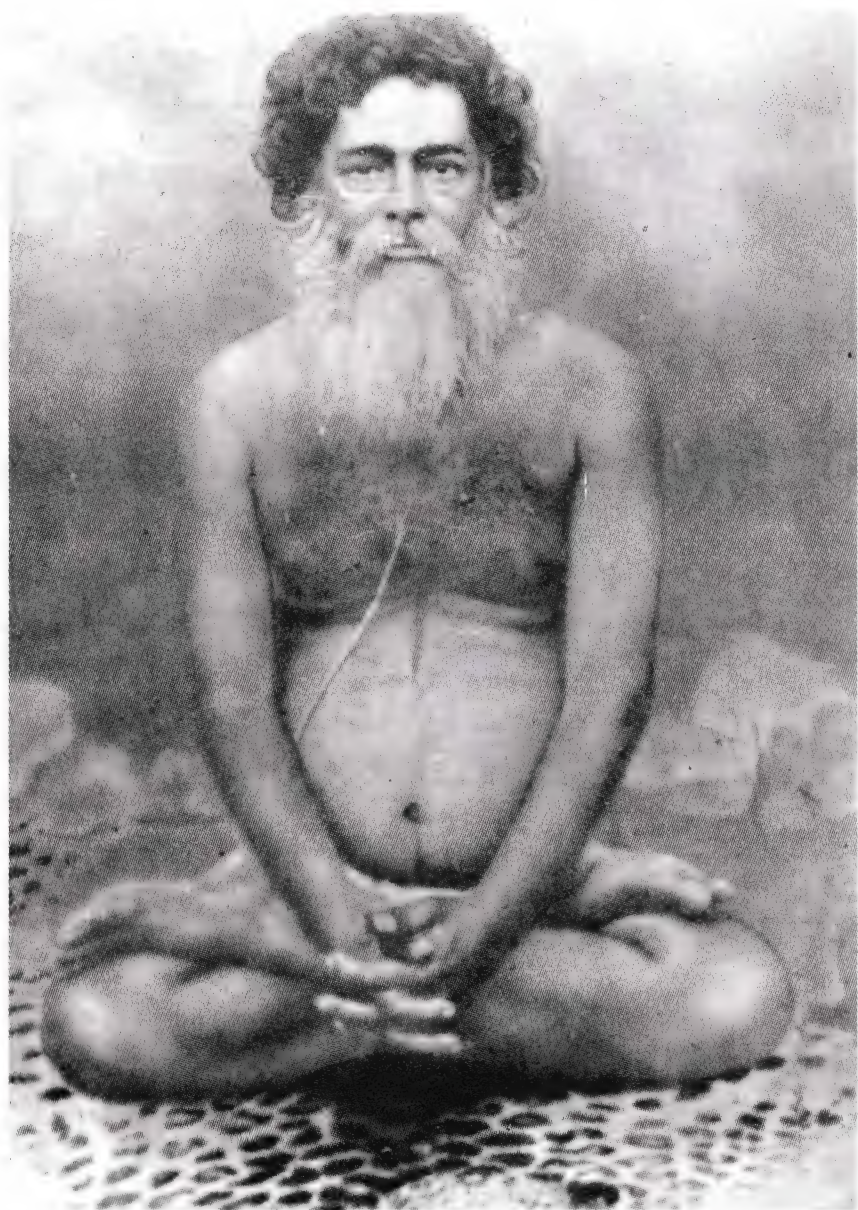
শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস (আনুমানিক ১৯১৪ খৃঃ)

জাত্যন্তর পরিণাম বলে। প্রকৃতি বা উপাদানের আপূরণ হইতে এই প্রকার পরিবর্তন সাধিত হয়। সাংখ্য-মতে প্রকৃতি স্বভাবতঃ পরিণামশালিনী, কোন আগন্তুক কারণ হইতে তাহার পরিণাম হয় না। মূল প্রকৃতি জগতের যাবতীয় কার্য্যের আদি কারণ। তাহা হইতেই নিমিত্ত-ভেদ নিবন্ধন বিভিন্ন কার্য্যের উৎপত্তি হয়। কিন্তু প্রকৃতি হইতে সকল কার্য্য হইতে পারিলেও বস্তুতঃ সকল কার্য হয় না। কারণ, যতক্ষণ পরিণাম-পথের প্রতিবন্ধক অবগত না হয় ততক্ষণ পরিণাম সিদ্ধ হয় না। নিমিত্ত বিশেষের দ্বারা প্রতিবন্ধক বা আবরণ-বিশেষ বিদূরিত হইলে প্রকৃতি অনুরূপ-কার্য্যরূপে আপনিই পরিণাম প্রাপ্ত হয়। সুতরাং নিকৃষ্ট পদার্থ যেমন উৎকৃষ্ট পদার্থে পরিণত হইতে পারে, তেমনই উৎকৃষ্ট পদার্থও নিকৃষ্ট হইতে পারে। উভয়ত্রই প্রকৃতির আপূরণ বা অনুপ্রবেশ আবশ্যক। শাস্ত্রে আছে, নন্দী ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছিল, আবার নহুষ ইন্দ্রপদ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সর্পযোনী প্রাপ্ত হইয়াছিল। কর্ম্মানুসারে সবই সম্ভব। এই জাত্যন্তর পরিণামবাদ কর্ম্মবিজ্ঞানের মূল সূত্র এবং অকাট্য সত্য। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে সত্যের এরূপ ব্যাপক রূপ দেখিতে পাওয়া যায় না।' বাবাজী বলিলেন, "তোমার কথা মানিয়া লইলাম। কিন্তু জাত্যন্তর-বিজ্ঞান পাতঞ্জল দর্শন পড়িয়া কেহ আয়ত্ত করিতে পারে কি? যোগাভ্যাস না করিলে যোগ শাস্ত্রের কোন রহস্যই সম্যক্ প্রকারে বুঝিবার উপায় নাই।" এই বলিয়া বাবাজী আমাকে একটি ফুল লইতে বলিলেন। আমি নিকটস্থ একটি গোলাপফুল হাতে তুলিয়া লইলাম। তিনি ফুলটি আমার হাত হইতে গ্রহণ পূর্বক বলিলেন, "দেখ, এই ফুলটি গোলাপ, কি অন্য কিছু?" আমি বলিলাম, "উহা গোলাপই বটে।" তিনি বলিলেন, "তুমি ইহাকে গোলাপ দেখিতেছ; কিন্তু আমি ইহাতে সবই দেখি। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কোথাও এমন কিছু নাই, যাহা ইহাতে নাই। ইহাতে সবই আছে।" এই বলিয়া তিনি ফুলটিকে হাতে লইয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি সংযোগে টিপিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরেই দেখিলাম, গোলাপ ফুলটি জবাফুলে পরিণত হইয়াছে। ফুলটি নাড়াচাড়া করিয়া দেখিলাম, অতি সুন্দর জবাফুলই বটে।

এই প্রকার বহু সময়ে বহু প্রকার পরিবর্তন সংঘটিত করিয়া শাস্ত্রের রহস্য বুঝাইয়া দিতেন। একবার একটি ফুটন্ত ফুলকে অস্ফুষ্ট কোরকে পরিণত করিয়া প্রতিলোম পরিণাম বিষয়ক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়াছিলেন। তিনি বলেন কুঁড়িতে যেমন ফুল আছে, ফুলেও তেমনই কুঁড়ি আছে। বীজে যেমন বৃক্ষ আছে, তেমনই বৃক্ষেও বীজ আছে। প্রকাশ কাল বা অভিব্যক্তির কারণ সামগ্রী পাইলেই কুঁড়ি পুষ্পরূপে ও বীজ বৃক্ষরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। স্বভাবের নিয়মে সর্বত্রই ইহা হইতেছে। ক্ষেত্র ও

পারিপার্শ্বিক অবস্থা নিচয়ের অনুকূলতা এই জন্যই বিকাশের পক্ষে আবশ্যক। আবার ঐ সকল বাহ্য কারণ যদি পুষ্প হইতে আকর্ষণ করিয়া সরাইয়া দেওয়া যায় অথবা পুষ্প মধ্যে সূক্ষ্মভাবে নিহিত কুঁড়ির সত্তা যদি তাহার সজাতীয় উপাদানের দ্বারা পুষ্ট করা যায়, তাহা হইলে ঐ পুষ্পটি দেখিতে দেখিতে পুনর্বার কোরকে পরিণত হইবে। এইরূপ সর্ব্বত্রই বুঝিতে হইবে।' আমি বলিলাম 'তাহা হইলে ঈশ্বরে যেমন জীবত্ব আছে, তদ্রূপ জীবেও ঈশ্বরত্ব নিহিত আছে, মানিতে হইবে?'' বাবাজী বলিলেন, ''তাহা তো সত্যই। যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে কি জীব চেষ্টা করিয়া ঐশ্বর্য্যলাভ করিতে পারিত? যাহাতে যাহা নাই, তাহাতে তাহা কদাপি আবির্ভূত হইতে পারে না।

১৯১৮ সালের প্রারম্ভভাগে আমি দীক্ষা গ্রহণ করি। ইহার পর হইতে বাবাজীর লোকাত্তর শক্তি অর্ন্তজগতেও অনুভব করিতে আরম্ভ করি। কিন্তু যে সব কথা সাধন-রাজ্যের গুপ্ত ও গোপনীয় বিষয়—তাহা লোক-সমক্ষে প্রচারিত করা সর্বথা অনুচিত মনে করিয়া সে সম্বন্ধে কিছু বলিলাম না।

আর একদিন অনুলোম ও বিলোম পরিণামের কথা উঠিয়াছিল। বাবাজী বলিলেন—''দেখ, উভয়বিধ পরিণামই সত্য। দুগ্ধ হইতে দধি হয়, দধি হইতে নবনীত ও নবনীত হইতে ঘৃত উৎপন্ন হয়। ঘৃতের মধ্যে দুগ্ধের উপাদান আত্মগোপন করিয়া বর্তমান থাকে। যিনি প্রকৃতধর্ম্মী, তিনি ইচ্ছা করিলেই ঐ অন্তর্নিহিত প্রচ্ছন্ন উপাদানকে আশ্রয় করিয়া বিলোমক্রমে ঘৃতকে পুনরায় দুগ্ধে, এমন কি তৃণরাশিতে পরিণত করিতে পারেন। বালকের মধ্যে বৃদ্ধভাব আছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিলেই বালককে দেখিয়া তাহার ভবিষ্যৎ অবস্থা জানিতে পারা যায়। তদ্রূপ বৃদ্ধের মধ্যেও বাল্যভাব নিহিত আছে। তাই বৃদ্ধকে দেখিয়াও তাহার ভুতাবস্থা প্রত্যক্ষ করা যায়। সুতরাং পরিণামক্রমের দর্শন হইতে স্বভাবের নিয়মে অতীতানাগত-জ্ঞান আপনিই উদিত হয়।'' এই বলিয়া একটি প্রস্ফুটিত গোলাপফুলকে তিনি অস্ফুট কোরকাকারে পরিণত করিলেন। পরে সেই কোরকটিকে মার্শেল নীলের কোরকে পরিবর্ত্তিত করিয়া দুই তিন মিনিটের মধ্যেই ফুটাইয়া তুলিলেন।

একদিন সন্ধ্যার পরে পুরীধামে আশ্রমে বসিয়া আছি, বাবাজী আহ্নিক করিয়া আশ্রমের বারান্দায় বিশ্রাম করিতেছিলেন। দুই একটি ভক্ত পাখা দিয়া তাঁহাকে বাতাস করিতেছিলেন। তখন হঠাৎ চৈতন্যচরিতামৃতের একটি বচন আমার মনে পড়িল, যেখানে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধের বর্ণনা আছে (''মৃগমদ নীলোৎপল'' ইত্যাদি) সেই স্থানটি স্মরণ-পথে উদিত হইল। বাবাজীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'বাবা,

চৈতন্যচরিতামৃত, গোবিন্দলীলামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের যে প্রকার অঙ্গ-গন্ধের বর্ণনা আছে তাহা কি স্নিগ্ধ?'' তিনি বলিলেন—'কি কি দ্রব্যের সংযোগে ঐ গন্ধের আভাস পাওয়া যায় বলিয়া লেখা হইয়াছে? একটি একটি করিয়া উল্লেখ করিয়া যাও।'' আমি গোবিন্দলীলামৃতের মতানুসারে নীলপদ্ম, কস্তুরী প্রভৃতি দ্রব্যের নাম করিয়া যাইতে লাগিলাম। বাবাজী এক একটি নাম শুনিয়া হস্তসঞ্চালন করিতে লাগিলেন। যখন সবগুলি দ্রব্য উল্লিখিত হইল, তখন হস্তমুষ্টি আমার নিকটে ধরিয়া বলিলেন—''এই শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধের আঘ্রাণ গ্রহণ কর। যে যে জিনিষের নাম তুমি লইয়াছ, আমি সঙ্গে সঙ্গে সেই সেই উপাদান আকর্ষণ করিয়া লইয়াছি ও সম্মিলিত করিয়া দিয়াছি। দেখ, কেমন বোধ হয়।'' দেখিলাম অপূর্ব্ব দিব্যগন্ধ—জগতে তাহার তুলনা নাই। পরদিন একটি শিশি ভরিয়া ঐ অপূর্ব্ব গন্ধ সূর্য্যরশ্মি দ্বারা তৈয়ার করিয়া দিয়াছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—''বাবা, এতগুলি বিভিন্ন প্রকারের পদার্থ শুধু নাম শুনিবামাত্র আপনি কি প্রকারে আকর্ষণ করিয়া লইলেন?'' তিনি বলিলেন—''তাতে আর কষ্ট কি? যদি নিজের আকর্ষণ করিবার ক্ষমতা থাকে ও উপাদানের জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে আর কঠিন কি আছে? যতদূর পর্যন্ত সূর্য্যরশ্মির বিস্তার আছে, ততদূর যাহা কিছু থাকুক টানিয়া আনা যায়। বৃহৎ বৃহৎ স্থূল বস্তু পর্যন্ত বহু দূরদেশ হইতে অল্প সময়ের মধ্যে আনিয়া উপস্থিত করা যায়। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। সমস্ত জগৎটা বিধাতার যে অপূর্ব কৌশলে চলিতেছে, তাহা তোমরা ধরিতে পার না। তাই তোমাদের নিকট এ সব আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয়। যখন শিখিবে, তখন বুঝিতে পারিবে যে, একটি ব্রহ্মাণ্ড রচনা করাও কিছু অসম্ভব ব্যাপার নহে।''

বাস্তবিক পক্ষে কোন জিনিষেরই বিনাশ হয় না। একখানা পুস্তক অগ্নিতে দগ্ধ ও ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিয়া দেশান্তরে ও কালান্তরে যদি ঠিক সেই পুস্তক খানাই পুনরায় উৎপন্ন করা যায় এবং যদি উহা শুধু দৃষ্টিভ্রম না হইয়া স্থায়িবস্তু বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে কোন বস্তুরই যে ঐকান্তিক বিনাশ হয় না, তাহা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। যদি গঙ্গার এক ঘাটে এক ঘটি দুগ্ধ নিক্ষেপ করিয়া দীর্ঘকাল পরে অন্য ঘাটে জল হইতে বিশ্লেষণ পূর্বক ঠিক সেই দুগ্ধই বাহির করিয়া দেখান যায়, তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, কোন জিনিষেরই স্বরূপনিবৃত্তি কখনই হয় না। এইজন্যই জীব লোক-লোকান্তরে, এমন কি ব্রহ্মলোকে, গমন করিলেও ক্ষমতাশালী বিজ্ঞানবিৎ তাহাকে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারেন।

চিত্তের বিভিন্ন বৃত্তি, কামাদি রিপু জ্বরাদি রোগ, গ্রীষ্মাদি ঋতু, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি ভাব—বিজ্ঞানের আলোকে সবই স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

সূর্য-বিজ্ঞান আয়ত্ত হইলে চন্দ্রবিজ্ঞানাদি যাবতীয় বিজ্ঞান সহজেই বোধগম্য হয়। দক্ষিণ হস্ত ও বাম হস্তের বিরুদ্ধ তড়িৎ-শক্তিদ্বয়ের সংঘর্ষে, এমন কি, নখ-জ্যোতিঃর প্রভাবে পর্য্যন্ত সৃষ্টি হইতে পারে। চাক্ষুষ-জ্যোতিঃর দ্বারা বায়ুর কম্পন হইতে, নক্ষত্রের আলোকে—এমন কি, মানসিক স্পন্দন হইতেও সৃষ্টির প্রবাহ ধরিতে পারা যায়। সৌর-বিজ্ঞান শিখিলে এ সকল বিশেষভাবে পৃথক করিয়া শিখিবার প্রয়োজন হয় না।

একদিন বাবাজী বলিয়াছিলেন, 'বৎস গুরু যে কি বস্তু তাহা তোমরা এখনও চিনিতে পার নাই। যোগী ভিন্ন কেহ গুরুপদবাচ্য হইতে পারেন না। শিষ্যের ঐহিক ও পারত্রিক সকল প্রকার কল্যাণের ভার গুরু স্বহস্তে গ্রহণ করেন। যোগী গুরু আপন ব্যাপক সত্তার প্রভাবে যুগপৎ সর্ব্বত্র এবং সর্বদা জাগ্রদ্‌ভাবে বিদ্যমান থাকেন। ভক্তের আর্তধ্বনি তাঁহাকে আবির্ভূত করায়। আমি সর্ব্বদাই তোমাদের প্রত্যেকের নিকটে রহিয়াছি; তোমরা ক্রিয়াতে উন্নত হইলে তাহা প্রত্যক্ষ বুঝিতে পারিবে।''

গত ১৯২৮ সালে জুন মাসে কলিকাতায়, বাবাজী রূপনারায়ণ নন্দন লেনে অবস্থান কাল আমি সেখানে গিয়াছিলাম। একদিন (বোধ হয় ৭ই তারিখ) সকাল বেলা প্রাতভ্রমণের পরে যোগতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছিল। বাবা বলিতেছিলেন—''ষট্‌চক্রের কথা আমার 'প্রকৃতিতত্ত্বে' কিছু আছে। তাহাও ভুল। সাধারণতঃ অন্যত্র যা দেখা যায়, তাহাও ভুল। উহা এমন জটিল যে, ভাষায় বুঝান যায় না। তবে কমলের দল সম্বন্ধে কিছু কিছু বুঝা ও বুঝানো যায়। দলের সংখ্যা ৪, ৬, ১০, ১২, ১৬, ও ২০। কুণ্ডলিনী জাগিলেই একটি তেজোময় জিনিষ প্রকাশিত হয়। নাভিকুণ্ড হইতে নিম্নপর্যন্ত কুণ্ডলিনী সুপ্তাবস্থায় ছড়াইয়া আছে। সেই তেজোমধ্যে চারিটি স্তর বেশ বুঝিতে পারা যায়। ইহার তিনটি ইড়াদি তিন নাড়ীর তিন বর্ণ হইতে ও চতুর্থটি সমষ্টিবর্ণ হতে উদ্‌ভুত। সাধনবলে এই চারিটি উঠিতে থাকে—ইহার প্রতিবিম্ব তথায় বর্তমান থাকে। উর্দ্ধস্তরে ইড়া ও পিঙ্গলা নিস্তেজ থাকে বলিয়া উভয়ের সাম্যজনিত সুষুম্না উজ্জ্বলভাবে প্রকাশমান থাকে। ইহার উর্দ্ধস্তরের একটি বর্ণ থাকে। মোট ছয়টি বর্ণ তখন ফুটিয়া উঠে। এই প্রকারে ক্রমশঃ বিকাশ হইতে থাকে। আজ্ঞাচক্রে শুধু দুইটি বর্ণ। পঞ্চচক্রের ৪৮টি বর্ণ একাকার হইয়া গেলে তাহার সারাংশ এক হইয়া উর্দ্ধে যায়। ইহাই জ্ঞান চক্ষুঃ। উর্দ্ধে যাইয়াই সেখানকার আবরণ সরাইয়া ফেলে। তখন উপর হইতেও একটি তেজঃ নামিয়া আসে। আজ্ঞাচক্রে উভয় তেজের মিলন হয়। এই জন্য ইহা দ্বিদল। সহস্রারের তেজঃ নিরন্তর আসিতেছে, কিন্তু বিক্ষিপ্তচিত্ত জীব তাহা বুঝিতে পারে না। যখন জ্ঞানের উদয় হয়, তখন তাহা বুঝিতে পারে।

ইহাই আজ্ঞা-চক্রের ব্যাপার, সমস্ত চক্রের শক্তির সার অংশই জ্ঞান—ক্রিয়া হইতেই ইহার বিকাশ হয়। তখন সকল বর্ণ একাকার হইয়া যায়, বৈচিত্র্য থাকে না; অর্থাৎ বৈচিত্র্যের অন্তরে অভেদ দেখা যায়। পরে ভেদ-বোধ কাটিয়া যায়। ক্রিয়া হইতে চক্র-ভেদ হইতে থাকে। নিম্ন নিম্ন স্তরের সারাংশ লইয়া উপরে উঠিতে হয়, সার বাহির করিতে না পারিলে উপরে উঠা যায় না। কেহ যদি জোর করিয়া উঠাইয়া দেয়, তাহা হইলেও উপরে থাকিতে পারে না। আজ্ঞাচক্রে না গেলে বোধ বা উপলব্ধি হয় না। সবই হয় বটে, কিন্তু উপলব্ধিতে আসে না। কুণ্ডলিনী জাগিলেই নাভিপদ্ম ফোটে। এই পদ্ম সকলের দেহেই আছে—কিন্তু মুদ্রিত হইয়া আছে। কুণ্ডলিনীর জাগরণ আর অন্তঃসূর্যের উদয় একই কথা। ইহাই জ্ঞান-সূর্য—ইহার উদয়ে পদ্ম আপনিই ফোটে।'' বলিয়া তিনি বলিলেন, ''আমরা প্রত্যক্ষবাদী। প্রত্যক্ষ ভিন্ন আমরা কিছু মানি না।'' ইহা বলিতে বলিতে তিনি নিজের নাভির চারিদিকে কয়েকবার হাত দিয়া টিপিলেন। দেখা গেল নাভির গ্রন্থি খুলিয়া গিয়াছে—মধ্য হইতে অতি মনোহর ক্লান্তিযুক্ত একটি লাল কমল বাহির হইতেছে। ক্রমশঃ উহা অধিকতর প্রকাশিত হইতে লাগিলে। আমরা শুঁকিয়া দেখিলাম, অতি মনোহর কমলের সৌরভ—আঘ্রাণ করিলাম। ব্রহ্মনালের উপর কমলটি ফুটিয়া ছিল, নীচে মৃণাল। বাবা বলিলেন, ''বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি—এ সব পৌরাণিক বর্ণনা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কুণ্ডলিনী না জাগিলে এই কমল ফুটে না। নাভিতে গ্রন্থিবন্ধন আছে ইহার উন্মোচন ভিন্ন সিদ্ধিলাভের আশা দুরাশা মাত্র।''

কথাপ্রসঙ্গে একদিন সাক্ষী ও লীলা-তত্ত্ব বুঝাইতেছিলেন। আমি বলিলাম, ''বাবা, আপনি যে মহাশক্তির কথা বলেন, তাঁহার সহিত গুণময়ী প্রকৃতির সম্বন্ধ কি?'' বাবা বলিলেন, ''বৎস, মহাশক্তিই ত প্রকৃতিকে লইয়া খেলিতেছেন, আবার তিনি নিজেই নিজের খেলা দেখিতেছেন। প্রকৃতিতে সুধাও আছে, বিষও আছে—আলো-আঁধার দুইই আছে। তবে যেদিকে আলো, সেদিকে আঁধার নাই, যেদিকে অন্ধকার, সেদিকে আলো নাই। কিন্তু আলোর এমনি প্রভাব যে, তাহার আঘাতে অন্ধকার সরিয়া যায়। কিন্তু অন্ধকার আলোককে অপসারিত করিতে পারে না। প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া যিনি মহাশক্তির চরণতলে পৌঁছিয়াছেন, তিনি প্রকৃতির এই খেলা দেখিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার দায়িত্ব নাই। তিনি মহাশক্তির নিমিত্ত-মাত্র হইয়া খেলা করেন। তিনি মায়াতীতও পাপপুণ্যের অনধীন। যাহারা মায়ার অধীন, তাহারা এই খেলা দেখিয়া সত্য বলিয়া মোহিত হয়। কিন্তু যিনি যোগী, জ্ঞানী ও ভক্ত, তিনি খেলা দেখেন মাত্র, তিনি খেলাকে খেলা বলিয়াই জানেন। এই জন্য তিনি নিজে মোহিত না হইয়া

অজ্ঞানীকে খেলা দেখাইতে পারেন। অজ্ঞানীর চোখে আবরণ আছে বলিয়া তাহার নিকটে এক বস্তুতে আবরণ দিয়া অন্য বস্তুর প্রকাশ করা চলে—অবশ্য ইচ্ছার প্রভাববশতঃ। কিন্তু জ্ঞানীর দৃষ্টি নির্মল, তাঁহাকে ঈশ্বরও ভুলাইতে কিংবা মোহিত করিতে পারেন না। তিনি সর্বদাই মূল সত্তাটি দেখিতে পান—তাই সেখানে আবরণ চলে না। তাঁহাকে কেহই ফাঁকি দিতে পারে না।'' আমি বলিলাম, আবরণ ও বিক্ষেপ এই দুইটি অজ্ঞানের ব্যাপার। আপনি যাহা বুঝাইলেন তাহাতে মনে হইতেছে যে, উভয় বস্তুই সমভাবে মিথ্যা বলিয়া একটিকে অন্যটির মতন দেখান সম্ভবপর হয়। গোলাপফুলকে জবাফুল করিয়া দেখান যায়—জবাফুল করিতেও পারা যায়, গোলাপ ও জবা উভয়ই ফাঁকি। গোলাপকে আবৃত করিয়া সেখানে বিক্ষেপ শক্তির প্রভাবে কারণ ও জবার প্রস্ফুরণ করা চলে। কিন্তু যিনি মহাসত্তাকে দেখিতে পান, যিনি গোলাপ ও জবা উভয়ই প্রতিভাসিক বলিয়া 'জানেন, তাহাকে ভুলান যায় না। প্রাতিভাসিক। প্রতিভাস স্বভাবের অধীন—কাহারও ইচ্ছা সেখানে কার্য্যকরী হয় না। তাই এ অবস্থাতে স্বাধীনতার আভাস কিছু কিছু পাওয়া যায়। এখানকার নিয়ামক একমাত্র স্বভাব—এমন কি, স্বেচ্ছাও নিয়ামক নহে। আমার ত এইরূপই মনে হয়।'' বাবা বলিলেন, 'হাঁ, কতকটা ঐরূপই বটে।''

একদিন মন্ত্রতত্ত্বের আলোচনা হইতেছিল। প্রসঙ্গতঃ গায়ত্রীর বিষয়ে কথা উঠিল। বাবা বলিলেন, 'গায়ত্রী উপাসনা ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্যরক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক! আজ-কাল ব্রাহ্মণের ছেলে সন্ধ্যা-গায়ত্রী ছাড়িয়া দিতেছে, ইহা শুভ লক্ষণ নহে। ব্রাহ্মণ যদি প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার অভাব কি? সমগ্র জগৎ ব্রাহ্মণের অধীন।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'গায়ত্রী মন্ত্র বৈদিক মন্ত্রবিশেষ। মন্ত্রমাত্রই শব্দসমষ্টি বলিয়া লৌকিক বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়। এখন জিজ্ঞাস্য এই—গায়ত্রী মন্ত্রে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে কি?' বাবা উত্তরে বলিলেন, ''সকল মন্ত্রেই বৈশিষ্ট্য আছে, তবে গায়ত্রী বৈশিষ্ট্য কিছু বেশী।'' তিনি আর বলিলেন, ''আমি গায়ত্রীর তেজঃ ঘনীভূত করিয়া আবরণের দ্বারা পুটিত করিয়া শিশিতে রাখিয়াছি। তুমি তাহার কিঞ্চিৎ অংশ গ্রহণ করিয়া একটি তাম্র পাত্রে স্থাপনপূর্বক তাহার উপর গায়ত্রী মন্ত্র মনে মনে জপ করিয়া দেখ বুঝিতে পারিবে, গায়ত্রী-মন্ত্রগত শব্দের কি প্রভাব। তাম্রপাত্রটি গঙ্গাজল দ্বারা ধৌত করিয়া লইও এবং ঐ পদার্থের চারিদিকে তুলার দ্বারা বেষ্টন করিয়া দিও।'' এই বলিয়া তিনি আমাকে একটি শিশি হইতে কৃষ্ণাভ একটি বস্তু দিলেন—আমি উহা লইয়া তাঁহার আদেশানুযায়ী একটি তাম্রকুণ্ড ধুইয়া উহার পৃষ্ঠদেশে স্থাপন করিলাম ও চারিদিকে তুলা দিয়া ঘেরিয়া গায়ত্রী মন্ত্র উহার উপর মনে মনে জপ

করিলাম। হস্ত দ্বারা বস্তুটিকে স্পর্শ করি নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, জপ সমাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বস্তুটিতে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল! প্রদীপ্ত অগ্নি তুলারাশিকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল।

একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম, বাবা, ভক্তির পরে ও কি কোন অবস্থা আছে?

বি—আছে। তাহাই প্রেম। ভক্তির গাঢ় অবস্থাকে প্রেম বলে। ইহা পরমানন্দস্বরূপ। অনেকে ইহাকেই অদ্বৈতসিদ্ধি বলিয়া বুঝাইয়া থাকেন। এই অবস্থা পূর্ণত্বের দ্বারদেশ—মহাশক্তি বা অসীম-তত্ত্বে প্রবেশের মুখ। ইহার পরেই অকূল পাথার—সেখানে বাক্য ও মনের গতি নাই। অসীম বা অনন্ত সত্তা তত্ত্বাতীত হইলেও তত্ত্বরূপে বর্ণিত হয়। সেখানে দ্বৈতাদ্বৈত কিছুই নাই। উহা এক হিসাবে ঈশ্বরত্বেরও অতীত অবস্থা—পূর্ণতমা মহাশক্তির স্বরূপ বা স্বভাব। "বিনা প্রেমসে ন মিলে নন্দলালা"—বিনা প্রেমে এই পূর্ণত্বে প্রবেশ হয় না।

জি—যোগ ভিন্ন প্রকৃত উন্নতি লাভ করিতে পারা যায় না কেন, তাহা আরও ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। অন্য কোন প্রকার কর্ম্ম দ্বারা যোগলভ্য ফল প্রাপ্ত হইতে পারা যায় কি না, জানিতে ইচ্ছা হইতেছে।

ব—বৎস, যোগের স্থান অন্য কোন প্রকার কর্ম্ম পূরণ করিতে পারে না। একমাত্র যোগ ভিন্ন অন্য কোন উপায়েই চিত্ত ও দেহের স্থায়ী বিশুদ্ধি সম্পন্ন হয় না। দেখ, প্রকৃতি হইতে যে কার্য্যের অভিব্যক্তি হয়, তাহা নির্ম্মাণ ও ক্রিয়াভেদে দুই প্রকার। নির্ম্মাণটি উপাদান ও ক্রিয়া নিমিত্ত। নির্ম্মাণের ধর্ম্মই আপেক্ষিক স্বধর্ম্ম, ক্রিয়া দ্বারা তাহার অভিব্যক্তি হয়—ইহাকেই উৎপত্তি বলে। একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা বিষয়টি বুঝাইয়া দিতেছি। মনে কর, রাম ও শ্যাম দুইটি বালক রৌদ্রে বেড়াইয়া ফিরিল।

রৌদ্র লাগিবার দরুণ রাম জ্বরে আক্রান্ত হইল, কিন্তু শ্যামের কোন রোগ হইল না। সূর্য্যের তাপ দুই জনের উপরেই সমভাবে লাগা সত্ত্বেও এক জনের জ্বর হইল কিন্তু অপর ব্যক্তির কিছুই হইল না—ইহার কারণ কি? কারণের বিভিন্নতা না থাকিলে কার্য্যে ভেদ হইতে পারে না, সুতরাং সূর্য্যের তাপ ব্যতীতও অন্য কিছু কারণ আছে—তাহাই জ্বরের অসাধারণ কারণ! রৌদ্রে সাধারণ উদ্দীপক মাত্র। সেই অসাধারণ কারণ আর কিছু নহে—উহা শুধু রামের দৈহিক বৈশিষ্ট্য বা সংস্কার-বিশেষের সমষ্টি। হয়ত তাহার পিত্ত দুর্ব্বল বলিয়া সূর্য্যের তাপে তাহার দুর্ব্বল পিত্ত-যন্ত্র আক্রান্ত হইল ও জ্বরের আবির্ভাব হইল। রৌদ্র না লাগিলে তাহা তখন অবশ্য হইত না। কিন্তু চাপা থাকিত মাত্র। অন্য কোন উত্তেজক কারণ উপস্থিত হইলেই ঐ সংস্কার জাগিয়া উঠিত। এই উপাদানগত বৈচিত্র্যই নির্মাণ-বিকার—রৌদ্রলাগানুরূপ

ক্রিয়া নিমিত্ত মাত্র। সুতরাং বুঝিতে হইবে, জ্বরের মূলান্বেষণ কালে শুধু নিমিত্ত আবিষ্কারই যথেষ্ট নহে। নিমিত্ত গৌণ কারণ, উপাদান-বৈশিষ্ট্যই কার্য্যের মুখ্য কারণ। জীব এখন স্থূলভাবাপন্ন—ইহা তাহার প্রাকৃতিক অবস্থা নহে, বিকারাবস্থা। এই বিকারকে দূর করাই জীবের স্বাস্থ্য-সম্পাদন। ধাতুর সাম্যভাবই প্রকৃতি বা স্বাস্থ্য বৈষম্যই ব্যাধি। এখন প্রশ্ন এই—বিকৃত জীবকে প্রকৃতিস্থ করা কি প্রকারে হইতে পারে? এই ক্ষেত্রে নির্মাণগত পরিবর্ত্তন আবশ্যক, শুধু ক্রিয়াগত বা নৈমিত্তিক পরিবর্ত্তনে স্থায়ী ফল হইবে না। নির্মাণে যাহা নাই ক্রিয়াতে তাহার বিকাশ হয় না। কামের উপকরণ সম্মুখে থাকিলে আমার কাম জাগিয়া উঠে, ক্রোধের নিমিত্ত উপস্থিত হইলেই ক্রোধ জাগিয়া উঠে—উহার কারণ কি? ইহার একমাত্র কারণ এই যে, আমার নির্মাণে অথবা উপাদানে কাম-ক্রোধের বীজ নিহিত রহিয়াছে। উপযুক্ত অবসর পাইলেই তাহার স্ফূরণ হয়। কামাদির নিমিত্ত না থাকিলে যদি আমাতে কামাদি না জাগে তাহা আমার নিষ্কামত্ব প্রভৃতির নিদর্শন নহে। যখন প্রবল উত্তেজক কারণ সত্ত্বেও কামাদির আবির্ভাব না হইবে, তখনই বুঝিতে হইবে যে, আমাতে কামাদি নিষ্ক্রিয় হইয়া গিয়াছে। 'বিকার-হেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি'স এব ধীরাঃ'—একথা ধ্রুব সত্য। অতএব যদি আমাকে আত্মশোধন করিতে হয়, তবে আমাকে নির্মাণ বা উপাদানের শুদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তাহা না করিয়া যদি আমি কেবল-মাত্র চলা-ফেরা ও ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য রাখি,—তাহাও আবশ্যক—তাহা হইলে লোকদৃষ্টিতে সংযমলাভ হইলেও মূল শুদ্ধি হইবে না কখনও না কখনও আকস্মিক বন্যার তীব্র বেগে সংযমের কৃত্রিম বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইবে। এই উপাদানশুদ্ধির উপায় একমাত্র যোগ। যাহাকে স্থূল দেহ বল, তাহা বাসনার সমষ্টিমাত্র। সুতরাং যে প্রণালীতে স্থূলভাব কাটিয়া যায়, তাহাতেই বাসনারও নিবৃত্তি হইয়া থাকে। বাসনা ত্যাগের আর কোন নতুন প্রণালী নাই। স্থূলের সহিত স্থূলের তীব্র সংঘর্ষ না হইলে উহার অন্তর্নিহিত চৈতন্যরূপ অগ্নি প্রজ্বলিত হয় না, আর তাহা প্রজ্বলিত না হইলে স্থূলের নিবৃত্তিও হয় না। এই সংঘর্ষই যোগাত্মক কর্ম্ম। স্থূলের দাহ এবং বাসনা-ক্ষয় অভিন্ন ব্যাপার ইহা জ্ঞানোদয় বা আত্মসাক্ষাৎকারের সমকালীন।

জি—মহাপুরুষ কাহাকে বলে? মহাপুরুষকে আশ্রয় করিতে হইবে, কিন্তু কি উপায়ে তাঁহাকে চিনিতে পারিব? এমন কোন লক্ষণ বা নিদর্শন কি নাই—যাহার দ্বারা মহাপুরুষের পরিচয় অভ্রান্তভাবে উপলব্ধ হইতে পারে? আজকাল বাহ্যাড়ম্বরের প্রবলতা এত অধিক যে, সাধারণ লোকের পক্ষে প্রতারিত হইবার আশঙ্কা পদে পদে রহিয়াছে। বাবা, অনুগ্রহপূর্ব্বক এই সম্বন্ধে আপনার মত কি তাহা বলুন।

ব—বৎস, ফুল ফুটিলে মধুলিপ্সু, ভ্রমরকে কে দেখাইয়া বা চিনাইয়া দেয়? যে

স্বভাবে থাকিতে চেষ্টা করে—স্বভাবই তাহাকে শিক্ষা দেন। আমরা স্বভাবকে ভুলিয়া কৃত্রিমতার মোহে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি—সেইজন্য যাহা নিতান্তই সহজ, তাহাও কঠিন বলিয়া মনে হয়। যতক্ষণ কৃত্রিমতা আছে, ততক্ষণ লক্ষণের আবশ্যকতা—নতুবা কোন নিদর্শন দেখিবার আবশ্যকতাই হয় না। শিশু নিজের মাকে চিনিতে পারে—যাহার হৃদয়ে ভালবাসা আছে সে স্বতঃই বুঝিতে পারে, কে তাহাকে ভালবাসে, সেজন্য বিচার-বিতর্কের আবশ্যকতা হয় না। যে পুষ্প যে ঋতুতে ফুটে, তাহা আপনিই তখন ফুটে, যে পাখী যে কালে গান করে, সে আপনিই তখন গায়—কাহারও উপদেশের আবশ্যকতা হয় না। স্বভাবই সেস্থলে পরিচালক। যে যে জিনিষের জন্য তীব্রভাবে ব্যাকুল হয়, যাহাকে না পাইলে তাহার সোয়াস্তি নাই, শয়নে, স্বপনে, জাগরণে যাহার জন্য সে আনমনা হইয়া তাহারই প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে—ঠিক যখন যে বস্তুটি উপস্থিত হয়, তখন তাহাকে চিনাইয়া দিতে হয় না। সে নিজেই বুঝিতে পারে, তাহার কাম্য বস্তু আসিয়াছে। ঠিক সেই প্রকার যখন জীবের নিরাশ্রয় ভাব উদিত হয়, যখন সে সত্য সত্যই মহাপুরুষের আশ্রয় লাভের জন্য অধীর হইয়া উঠে, তখন তো মহাপুরুষের দর্শন পায় ও মহাপুরুষকে দেখিবামাত্রই তাঁহাকে আশ্রয়দাতারূপে অস্ফুটভাবে চিনিতে পারে। তাহাকে লক্ষণ মিলাইয়া চিনিতে হয় না। খাঁটি জিনিষ স্বভাবসিদ্ধ। খাঁটি পরিচয়ও স্বাভাবিক। বাহ্য লক্ষণ মিলাইয়া চিনিবার চেষ্টা ধৃষ্টতা মাত্র।

ব—তপস্যা করিলে দেহের আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া যায়—এমন কি পরমাণু পর্য্যন্ত বদলাইয়া যায়। যাঁহার ভূতশুদ্ধি হইয়াছে, তাঁহার স্থূলদেহ স্থূল হইলেও অন্যান্য লোকের দেহের ন্যায় নহে। বার বার সঙ্গ করিতে হয়—দীর্ঘকাল সঙ্গে থাকিলে বহু অলৌকিক লক্ষণ ঐ দেহে দৃষ্টিগোচর হয়। দেখ যাঁহার কুণ্ডলিনী চৈতন্য হইয়াছে, যিনি সিদ্ধি এবং যোগলাভ করিয়াছেন, তাঁহার দৃষ্টিতে একটু বৈশিষ্ট্য থাকে। এইজন্য ঐ বৈশিষ্ট্য দ্বারা একখানা ফোটোগ্রাফ হইতেও কাহারও যোগসিদ্ধি হইয়াছে কি না তাহা জানিতে পারা যায়। যোগী, রোগী ও ভোগী—শুধু চক্ষুর চাহনি হইতেই ধরা পড়ে। যোগীদের ললাটেরও পরিবর্ত্তন হয়। তা-ছাড়া, যাঁহার কুণ্ডলিনী জাগিয়াছে ও সুষুম্না-পথ সর্ব্বদা ক্রিয়াশীল থাকে, তাঁহার দেহে সর্ব্বদা পদ্ম-গন্ধ খেলে, তাঁহার নিঃশ্বাসে পদ্ম-গন্ধ বহিতে থাকে, তাঁহার নাভির নিকটে কোন পাত্র রাখিয়া উপর হইতে জল ঢালিলে ঐ জল নাভিস্পর্শে পদ্মের সুগন্ধি আতরের ন্যায় হইয়া পাত্রে সঞ্চিত হয়। যোগিদিগের ব্যবহারকালেও নাসিকাতে শ্বাস-প্রশ্বাস চলে না—নাভি-পথে ও লোমকূপের পথে চলে। শুধু তাহাই নহে—তাঁহারা তোমাদের ন্যায় পুনঃ

পুনঃ বায়ু গ্রহণ করেন না। বাহ্য বায়ু যখন তাঁহারা গ্রহণ করেন, তখন উহা নাভিপদ্মে নির্ম্মলভাবেই গৃহীত হয়—মলাংশ বাহিরে পড়িয়া থাকে। ঐ বায়ু দীর্ঘকাল শরীরের ভিতরে ধরা থাকে—ভিতরে ভিতরেই উহা সঞ্চরণ করিতে থাকে। এই জন্যই যোগিগণ বাহ্যভাবে অভিভূত হয় না। চিত্তে বিভিন্ন প্রকার বৃত্তির উদয়, কাম-ক্রোধাদি ভাবের সঞ্চার—সবই বাহ্য বায়ুর সহিত সংঘর্ষের ফল। যিনি বাহ্য-বায়ুর সহিত সম্বন্ধ আয়ত্ত করিয়া লইয়াছেন, তাঁহার নির্ব্বিকার ভাব ও একাগ্রতা কিছুতেই নষ্ট হয় না—বহির্জগতের সঙ্গে ব্যবহার করিয়াও তিনি বিষয়ে লিপ্ত হন না। বহিঃস্রোত তাঁহার অন্তরে প্রবেশ-পথ পায় না। যিনি যোগী, তাঁহার দেহ সিদ্ধদেহ। তিনি ইচ্ছামাত্রই নিজের দেহকে সঙ্কুচিত করিতে পারেন, এমন কি পরমাণুর ন্যায় ক্ষুদ্র করিয়া অদৃশ্য হইতে পারেন, আবার প্রসারণ করিয়া বিরাট আকারে পরিণত করিতে পারেন। ইহাকেই তোমরা অনিমা ও মহিমা বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাক। শুধু দেহ কেন, দেহের যে কোন অবয়বকে কিংবা বাহ্য বস্তুকেও তিনি ঐ প্রকার ক্ষুদ্র ও বৃহৎ করিতে পারেন। দেহকে ইচ্ছানুরূপ হাল্কা ও ভারী করাও তাঁহার আয়ত্ত। তিনি দেহকে কর্দ্দমপিণ্ডের ন্যায় পিণ্ডীভূত করিতে পারেন অথবা সন্ধি সকলকে শিথিল করিয়া প্রত্যেকটি অংশকে পৃথক্ করিয়া ফেলিতে পারেন। নাভিরন্ধ্র অথবা লোমকূপ দ্বারা বাহিরের যে কোন পদার্থ আকর্ষণ করিয়া ভিতরে ঢুকাইতে পারেন। সে পদার্থ যত বড় বা যে পরিমাণ হউক, তাহাতে কোন বাধা নাই। তিনি এক দেহকে বহু প্রকারের বা একই প্রকারের বহু দেহে বিভক্ত করিয়া এক বা বহু স্থানে যুগপৎ প্রকাশিত হইতে পারেন। প্রাচীন বা অন্য কোন কঠিন আবরণের ভিতর দিয়া যাইতে ইচ্ছা করিলে যোগী দেহ প্রতিহত হয় না। তাঁহার দেহে এত অধিক পরিমাণে তাড়িত-শক্তি সঞ্চিত থাকে হিংস্র ভাব-লইয়া যে-কোন জীব তাহা স্পর্শ করিতে যাইবে, মুহূর্ত্তকাল মধ্যে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। ইহা যে তাঁহার ইচ্ছাতে হয়, তাহা নহে—স্বভাবতঃই হইয়া থাকে। বিষধর সর্পের উগ্র বিষও যোগিদেহে বিষক্রিয়া করিতে পারে না—দৈহিক তেজের সংঘর্ষে উহা ভস্ম হইয়া যায় ও দংশনকারী সর্পাদি মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। উচ্চ স্থান হইতে হঠাৎ পড়িয়া গেলে যোগিদেহ ভূমিস্পর্শ করে না—কারণ দেহে উর্দ্ধগতিশীল নির্ম্মল বায়ু সঞ্চিত থাকে বলিয়া পড়িবার সময়ে উহা বিক্ষুব্ধ হইবামাত্র দেহ আপনিই শূন্যপথে উপর দিকে উঠিতে থাকে। যোগীর নেত্রে এত তেজঃসঞ্চয় হয় যে, তিনি তীব্রভাবে কোন বস্তুর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে তাহা তৎক্ষণাৎ দগ্ধ হইয়া যায়—এমন কি, অতি কঠিন প্রস্তর বা লৌহ পর্যন্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। ছোট ছোট বালক-বালিকা—যাহারা অক্ষুণ্ণ-ব্রহ্মচর্য-যোগীর নয়নে তাকাইলে নানা প্রকার দেব-

দেবীর মূর্ত্তি দেখিতে পায়। একটু গভীরভাবে নিবিষ্ট হইয়া ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইলে যোগীর দেহ হইতে জ্যোতির ছটা চারিদিকে বিকীর্ণ হইতে থাকে—দেহ-প্রভায় অন্ধকার ঘরও আলোকিত হইয়া পড়ে। এইরূপ কত যে লক্ষণ আছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যোগী নির্ভীক, জিতেন্দ্রিয়, সত্যপরায়ণ ও মধুর-প্রকৃতি হইয়া থাকেন। যাহা হউক, এ সকল লক্ষণ দ্বারা সাধারণ লোকের পক্ষে মহাপুরুষ চিনিবার সহায়তা হয় বটে। কিন্তু মনে করিও না ইহা দ্বারাই সকল অবস্থাতে সত্য পরিচয় পাইবে। আর এ সকল লক্ষণ বাহ্যতঃ তুমি দেখিতে না পাইলেও যে মহাপুরুষত্বের অভাব কল্পনা করিবে, তাহা যেন না হয়।

জি—বাবা, প্রণবের অধিকার কি সকলেরই আছে?

বি—না। স্ত্রীদেহ ও শূদ্রাদিদেহ সাক্ষাদ্ভাবে প্রণবসাধনার যোগ্য নহে। কেন যোগ্য নহে, তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দেওয়া যায়। দীর্ঘকালের সংঘর্ষের ফলে ব্রাহ্মণাদির দেহ প্রণবের তেজে স্বভাতঃই তেজোময় তাই প্রণব গ্রহণের অধিকারী। যে অবস্থালাভ শূদ্রাদির পক্ষে প্রণবে অধিকার না থাকিবার দরুণ বহুকালের প্রযত্নসাধ্য, তাহা প্রণবের সাহায্যে ব্রাহ্মণাদি শীঘ্রই লাভ করিতে পারেন। শূদ্র প্রণবাদি মন্ত্রের ধারণা করিতে পারে না—যিনি শূদ্রকে প্রণব দিতে প্রবৃত্ত হন, তিনি বস্তুতঃ তাহার অপকারই করিয়া থাকেন। স্ত্রীজাতি সম্বন্ধেও তাহাই। স্ত্রীদেহের এমন বৈশিষ্ট্য আছে যে, অতি উচ্চ ব্রাহ্মণ কূল-সম্ভূত হইলেও উহা প্রণব-গ্রহণের যোগ্য নহে। স্ত্রীদেহে গর্ভধারণ হওয়ার জন্য কুণ্ডলিনীশক্তির অবস্থিতি একটু স্বতন্ত্রভাবাপন্ন। তবে মনে রাখিও যে, পূর্ব্ব-জন্মার্জিত সাধন সংস্কার বর্ত্তমান থাকিলে যথাসময়ে ভিতর হইতেই প্রণব জাগিয়া উঠে—বীজমন্ত্র আপনা আপনিই প্রণবের দ্বারা পুটিত হইয়া যায়। অবশ্য ইহা অতি বিরলাবস্থা—কিন্তু অসম্ভব নহে। মতঙ্গ প্রভৃতি ঋষি এবং মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি ব্রহ্মবাদিনী রমণীর দৃষ্টান্ত স্মরণ করিতে পার। বীজ হইতে প্রণবের আবির্ভাব হইতে পারে। সুতরাং প্রণব না দিয়া ক্ষেত্রবিশেষে কেবল বীজ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সাধারণাবস্থায় কেবল প্রণবের দ্বারা বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায় না। উহা হইতে পূর্ব্ব-বর্ণিত নির্ব্বাণ বা সত্তাবোধের লোপ হইবার সম্ভাবনা।

জি—প্রণব বা অন্যান্য মন্ত্র কি প্রত্যক্ষ করা যায়?

ব—যায় বই কি? নাভি হইতে প্রণব প্রভৃতি সকল উদিত হয়—মূলধার হইতেও বলিতে পার। কুণ্ডলিনী কিঞ্চিৎ পরিমাণে উদ্বুদ্ধ হইলেই একটি নাদময়ী শক্তির ধারা সুষুম্না-পথে ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হইতে থাকে। তখন সহস্রার হইতে অপর একটি ধারা

প্রবাহিত হইয়া অধোমার্গে আসিতে থাকে। আজ্ঞাচক্রে বিন্দুস্থানে ঐ দুইটি বিরুদ্ধ প্রবাহ সম্মিলিত হইয়া একটি সুস্নিগ্ধ, উজ্জ্বল ও কমনীয় জ্যোতির আকারে প্রকাশিত হয়। উহা বহিরাকাশে প্রতিফলিত হইলেই নেত্রের সম্মুখে বাহ্যভাবে প্রত্যক্ষ হয়। যে যোগী নাভি-ধৌতি ও কিরাত-ধৌতিতে অভ্যস্ত, তাঁহার নাভিকুণ্ড হইতে ধৌতকালে একটি জ্যোতিঃ-প্রবাহ স্তম্ভাকারে বহির্গত হইয়া বক্রভাবে স্বতঃই শিরোদেশে গমন করে ও দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। বাহির হইতে একটি অত্যুজ্জ্বল বৈদ্যুতিক ধনুর আকার দেখিতে পাওয়া যায়। মন্ত্রশক্তি তীব্রভাবে বাহ্যাকাশে প্রকাশিত হইলে সমীপস্থ দুর্ব্বল দর্শকের পক্ষে উহাতে জ্ঞান হারাইবার সম্ভাবনা। বৎস, যাহা কিছু অন্তরাকাশে অথবা দহর-কমলে প্রকাশিত হয়, তাহাকে বাহিরে আনিয়া ইন্দ্রিয়গোচরভাবে নিজে দর্শন অথবা অপরকে প্রদর্শন করা যাইতে পারে। তবে এ সকল অতি গুহ্য তত্ত্ব অনধিকারীকে দেখান উচিত নহে।

জি—ঐ যে জ্যোতির কথা বলিলেন, উহা কি মন্ত্রেরই প্রকাশ?

ব—নিশ্চয়ই। মন্ত্রই ক্রিয়া-কৌশলে জ্যোতিরূপে ফুটিয়া উঠে—ইহা দিব্য জ্যোতিঃ। দীর্ঘ সময় অভ্যাস করিলে জ্যোতির মধ্যে রূপ অথবা মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়—বস্তুতঃ যাহা জ্যোতিঃ বলিয়া মনে হয়, তাহা ঐ রূপেরই অঙ্গপ্রভা মাত্র, অথবা জ্যোতিই ঘনীভূত হইয়া মূর্ত্তিরূপে প্রকটিত হয়। বাষ্প ও বরফে যেমন ভেদ নাই, জ্যোতিঃ ও রূপেই তেমনই ভেদ নাই—দুই-ই এক বস্তু। ব্যবধানকালে যাহা জ্যোতিঃ, ব্যবধানান্তে নৈকট্য হইলে তাহাই মূর্ত্তি—এক চৈতন্যময়ী সত্তাই উভয়ভাবে প্রকাশিত হয়। জ্যোতিকে নিরাকার তত্ত্ব মনে করিতে পার এবং মূর্ত্তিকে সাকার বলিয়া ধরিয়া লইতে পার—কিন্তু মনে রাখিও, সাকার ও নিরাকার পৃথক বস্তু নহে। যেখানে আকার আছে, সেখানেই নিরাকারও আছে—সেই জন্যই ত আকার অবলম্বন করিয়াও নিরাকারের উপলব্ধি হইতে পারে, আকারের মধ্যে আবদ্ধ হইবার আশঙ্কা নাই। আর যাহাকে নিরাকার বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়, তাহাতেও অনন্ত প্রকারের আকার বর্ত্তমান রহিয়াছে। সকল আকার সমসূত্রে অবস্থান করিলে কোন আকারেরই অভিব্যক্তি হয় না—সেই সাম্যাবস্থাকেই নিরাকার বলে। তাহা অনন্ত আকারের সমন্বয় ভিন্ন অপর কিছু নহে। যাঁহার আকারের নির্ণয় নাই, ইয়ত্তা নাই, পরিচ্ছন্নতা নাই, তিনিই নিরাকার। সুতরাং দেবতাকে নিরাকার জ্যোতিঃ বা চৈতন্যস্বরূপ বলিলেও কোন দোষ নাই অথবা জ্যোতির্ম্ময় আকার বিশিষ্ট বলিলেও কোন দোষ নাই। সাধক বা ভক্তের ইচ্ছানুসারে আকারের স্ফুরণ হয়। নিরাকার যখন অনন্ত আকারের সাম্যাবস্থা, কোন নির্দিষ্ট আকারে যখন তাহা সীমাবদ্ধ নহে, তখন উপাসকের আকাঙ্ক্ষানুসারে উহা হইতে যে কোন আকারের অভিব্যক্তি না হইবে

কেন? মন্ত্র হইতেই জ্যোতিঃ ও রূপের বিকাশ হয়, মন্ত্রই দেবতার স্বরূপ—বাচ্য ও বাচকে বাস্তবিক পার্থক্য কিছুই নাই।

জি—সত্যই কি দেবমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে? অনেকে দেব দর্শনের কথা বলেন বটে, কিন্তু তাহা যে উপাসকের কল্পনা-প্রসূত নহে, তাহার প্রমাণ কি? স্বপ্নাবস্থায় কত রূপ প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু তাহা যে অলীক, তাহা ত সকলেরই জানে। তদ্রূপ, ধ্যানাবস্থায় যে দর্শন হয় তাহাও ত মিথ্যা হইতে পারে? তীব্রভাবে চিন্তা করিলে চিন্তার অনুরূপ মূর্ত্তি দর্শন হইতে পারে, কিন্তু তাহার সত্যতা কোথায়?

ব—এইজন্যই বীজ-মন্ত্রের আবশ্যকতা। বীজগর্ভে যদি শক্তি তাকে, তবে তাহা ক্ষেত্রে পতিত হইলে যথাকালে অঙ্কুরাদিক্রমে বৃক্ষে পরিণত হয়। বৃক্ষের চিন্তা না করিলেও বৃক্ষের বীজ ভূমিতে পতিত হইলেই বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে—যদি প্রতিবন্ধক না থাকে। ঠিক সেই প্রকার বীজকে চেতন করিয়া, অর্থাৎ শক্তিসংযুক্ত করিয়া, তাহার সাধনা করিলে বীজ-মন্ত্র হইতে দেবতার আবির্ভাব হইবেই। দেবতার অবয়ব, বর্ণ প্রভৃতি ধ্যান করিয়া ফুটাইবার প্রয়োজন হয় না। ইহা ব্যবহারক্ষম সত্য পদার্থ। শুধু ছবি ধ্যান করিয়া ঐরূপ সত্য বস্তুর আবির্ভাব সহজে হয় না। যে দৃষ্টিতে তুমি আমি ও জগৎ সত্য পদার্থ বলিয়া বুঝিতে পারি, সেই দৃষ্টিতে দেবতারও সত্তা আছে।

জি—দেবতার সঙ্গে কি সাধক সাধারণভাবে কথাবার্ত্তা বলিতে পারেন—দেবতা কি সাধকের কোন লৌকিক বা অলৌকিক কার্য সম্পাদন করিতে সমর্থ? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে দেবতাকে কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

ব—বৎস, সমগ্র জগৎটি ত মায়ার বিজৃম্ভণ মাত্র। যাহা এখন দেখিতেছ, বা ভাবিতেছ, বা বলিতেছ, সর্বই মিথ্যার উপরে প্রতিষ্ঠিত। অথচ সর্বই সত্য স্বরূপ। যে-ভাবে এই জগতের যাবতীয় পদার্থ সত্য, ঠিক সেই ভাবেই দেবতাও সত্য। দেবতা আবির্ভূত হইয়া কথা বলেন বই কি? ভক্ত যাহা জিজ্ঞাসা করেন, তাহার উত্তর দেন; ভক্তকে সর্ব্বদা সৎপথে চালিত করেন, ভক্তের মনোরঞ্জন করেন; ভক্তের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে কার্য্য সম্পাদন করেন, সবই করিয়া থাকেন। যে-ভাবে তুমি-আমি কথা বলি বা বাদ-প্রতিবাদ করি, ঠিক সেইভাবেই তাঁহার সঙ্গেও বাদ-প্রতিবাদ হয়, হাস্য-পরিহাস হয়। অবিশ্বাসের কোনও কারণ নাই। ভক্ত তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারেন, কোলে লইয়া প্রেমের সহিত চুম্বন করিতে পারেন, মাতৃভাবে আসিলে তাঁহার কোলে মাথা রাখিয়া সত্যই শয়ন করিতে পারেন। ভক্ত যেমন ভাবে তাঁহাকে সাজাইতে চান, তিনি তেমনই সাজিয়া থাকেন। তিনি সর্ব্বতোভাবেই ভক্তের অধীন।

জি—বাবা, তাঁহার দর্শন হইলে কি জীবের আর কিছু প্রার্থনীয় থাকে না?

ব—যাহা যাহার ইষ্ট, তাহা যদি সে সত্যই প্রাপ্ত হয়, তবে আর তাহার কি প্রার্থনীয় থাকিতে পারে? কিন্তু ইষ্ট-প্রাপ্তির একটা ক্রম আছে। যতদিন প্রাপ্তির পূর্ণতা না হয়, ততদিন অবশ্য প্রার্থনা থাকেই, কিন্তু চরমাবস্থাতে সকল প্রার্থনাই নিবৃত্ত হইয়া যায়। মন্ত্রাত্মক ব্রহ্মতেজঃই দেবতা—সাধককে আরাধনা করিবার সময় স্বয়ং দেবতা হইতে হয়। নিজে তেজোময় হইয়া সেই তেজঃকে বাহিরে আনয়ন পূর্ব্বক অর্থাৎ নিজেকে নিজের সত্তা হইতে বিবিক্ত করিয়া পৃথগ্‌ভাবে দর্শন করিতে হয়। যদি ন্যাস প্রভৃতি যথাবিধি সম্পন্ন হয়, তবে সাধকের দেহ ও চিত্ত উভয়ই মন্ত্রময় হইয়া যায়। কিন্তু যোগাভ্যাস ভিন্ন তাহা হওয়ার উপায় নাই। সুচিরকাল সাধুমার্গে অবস্থান করিয়া যোগাভ্যাস করিলে নিজের সত্তা দেবতাময় হইয়া পড়ে—দেবতার জ্যোতিঃ রূপ, শক্তি ও সত্তা, সবই নিজের সঙ্গে মিশিয়া একাকার হইয়া যায়। মন্ত্রশক্তির মাহাত্ম্য ও ক্রিয়ার প্রভাববশতঃ সাধক তখন স্বয়ংই সাধ্যরূপে প্রকাশিত হন, কিন্তু তথাপি উভয়ে কিঞ্চিৎ ভেদ থাকে। ভক্ত সে ভেদটুকু যত্নপূর্ব্বক পোষণ করেন। তাহা না থাকিলে বোধহীন সুষুপ্তিবৎ ঘোর মোহে আচ্ছন্ন হইবার ভয় থাকে। "দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ"—একথা খুবই সত্য। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সত্য যে, দেবতা হইয়াও যখন দেবতার ভজন হইতে পারে, তখন উপাস্য ও উপাসকে একটা ভেদ যে থাকে, তাহা নিঃসন্দেহ। যতক্ষণ বোধ আছে, ততক্ষণ একেবারে তিরোহিত হয় না। এইজন্য ভক্তের ভজন কখনই শেষ হয় না। কর্ম্ম সমাপ্ত হইয়া জ্ঞানে পর্য্যবসিত হয় বটে, কিন্তু জ্ঞানের প্রভাবে পরা ভক্তির নিবৃত্তি হয় না। বস্তুতঃ, জ্ঞানোত্তরই ঐ প্রকার ভক্তির উন্মেষ ও বিকাশ সম্ভবপর।

জি—বাবা, মন্ত্র ব্যতিরেকে যোগলাভ হইতে পারে না? লয়-যোগ, হঠ-যোগ, রাজ-যোগ প্রভৃতির ন্যায় মন্ত্র-যোগও যোগের প্রকারভেদ মাত্র। মন্ত্রের এত মহিমা কিসের জন্য?

ব—না গো, না—তা পারে না। মনকে ত্রাণ করিবার কৌশলকেই মন্ত্র বলে। মনের জড়তা নাশ করিয়া চৈতন্য সম্পাদন করাই মন্ত্রের কার্য্য। যে কোন উপায়েই মনকে চেতন করিতে চেষ্টা কর, মন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিতেই হইবে। কারণ, ব্রহ্মপথ বা সুষুম্নামার্গ না খুলিতে পারিলে কোন উপায়ই ফল দান করে না।

জি—আপনি বলিতেছেন—শ্বাস বিগত হইলেই বিশ্বাস জন্মে—তৎপূর্ব্বে নহে। তবে কি যাঁহারা বিশ্বাসবান্ জ্ঞানী ও ভক্ত তাঁহাদের শ্বাস নাই?

ব—তাতে আর সন্দেহ কি? শ্বাস হইতেই সংশয়ের উদয় হয়, বিকল্প আবির্ভূত হয়, জগদ্রূপ ইন্দ্রজাল রচিত হয়—কিন্তু যখন শ্বাস-প্রশ্বাস থাকে না, বায়ু যখন

সুষুম্নামধ্যে সঞ্চরণশীল হয়, তখন কর্ত্তৃত্বাভিমান বা অহঙ্কার থাকে না, সংশয়ভঞ্জন হয়, জ্ঞান ও ভক্তির উন্মেষ হয়। ইহাই বিশ্বশক্তির হস্তে যন্ত্রবৎ হইয়া যাওয়া, স্বভাবের দ্বারা চালিত হওয়া, গুরুশক্তির অধীন হওয়া—ইহাই নির্ভর, শরণাপত্তি ও আত্মনিবেদন। তখন বায়ু সুষুম্নার মধ্যে সঞ্চরণ করে রেচক ও পূরক, অর্থাৎ বাহ্য বায়ুর আদান-প্রদান নিবৃত্তি হইয়া যায়। *অজপা-রহস্যের আলোচনাকালে ভবিষ্যতে এ-সম্বন্ধে অন্যান্য কথা বলিব।

বাহিরের সঙ্গে সম্বন্ধ হইতেই বিকল্প ও সংশয়ের উদয় হয়। এই সম্বন্ধ বায়ু ঘটিত। সুতরাং বাহ্য বা স্থূল বায়ুর আকর্ষণ বন্ধ হইয়া গেলেই সংশয় কাটিয়া যায়। সূক্ষ্ম বায়ুর ক্রিয়া সুষুম্না মধ্যে তখনও হইতে থাকে বটে—কিন্তু ঐ ক্রিয়া স্বভাবতঃই সরল পথে হয় বলিয়া উহা জ্ঞানের প্রকাশক হয়, আবরক হয় না। বিশ্বাসের গাঢ়তম অবস্থায় আন্তঃশ্বাসও থাকে না—সেটা প্রাপ্তির অবস্থা। তখন সঙ্কল্পও থাকে না। বিশ্বাস ও নির্ব্বিকল্প দশা প্রায় সমান। ইহা অতি উচ্চ অবস্থা।

জি—আপনার মুখে অনেকবার শুনিয়াছি 'সহসা কাহাকেও বিশ্বাস করিও না, করিলেই ঠকিতে হইবে।' ইহাও কি যথার্থ মত?

ব—ইহাও অবশ্যই সত্য। যাহার জ্ঞানোদয় হয় নাই, যাহার বিশ্বাস অন্ধ, সে ত মায়িক ব্যাপারে মোহিত হইবেই। সে ত প্রতি মুহূর্তেই প্রতারিত হইতেছে। সে ত নিজেই নিজেকে প্রতারিত করিতেছে—অন্যে যে করিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? তাহার পক্ষে বিচার আবশ্যক। আসল কথা এই—জ্ঞানলাভ না হইলে চিত্ত মলিন থাকে, চিত্তে প্রতারণা বীজ নিহিত থাকে, তাই জগতের সর্ব্বত্রই সে প্রতারিত হয়। অজ্ঞানীকে সকলেই বঞ্চনা করে—তাহার নিজের মনঃ, নিজের ইন্দ্রিয়, কেহই তাহাকে সত্যের সন্ধান দেয় না। সকলেই তাহার সঙ্গে রিপুবৎ ব্যবহার করে। কিন্তু এই মনঃ ও ইন্দ্রিয় জ্ঞানীকে বঞ্চনা করিতে পারে না, করে না—অর্থাৎ যে জ্ঞানী সে ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা কিছু অনুভব করে তাহা ব্রহ্মময়, মনঃ দ্বারা যাহা বোধে আনে তাহাও ব্রহ্মাত্মক। সুতরাং ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা তাহার ব্রহ্মসত্তারই অনুভব হইয়া থাকে। তাহার কাছে মিথ্যার আবির্ভাব হয় না। ইন্দ্রিয়াদির প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি—কোন অবস্থাতেই তাহার ব্রহ্মদর্শন খণ্ডিত হয় না।

অতএব, সাধারণ লোকের পক্ষে অবিচারিতভাবে কিছু গ্রহণ করা সঙ্গত নহে! বিচারে ভ্রান্তি আসিবার সম্ভাবনা থাকিলেও বিচার অপরিহার্য্য। অবশ্য সদ্বিচার করিবে কুতর্ক করিবে না। কুতর্ককে বিচার বলে না।

* সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ (৩য় খন্ড) দ্রষ্টব্য।

আজকাল অন্ধবিশ্বাসের প্রবলতা বড় বেশী দেখিতে পাই। অন্ধবিশ্বাসও কুতর্কের ন্যায় সর্ব্বদা পরিহার্য্য। অন্ধবিশ্বাস করিয়া কত লোকের যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। যা-তা বিশ্বাস করিবে কেন? পরীক্ষা না করিয়া বিশ্বাস করিও না। তোমার নিকট সত্য নির্ণয়ের যে সকল পরীক্ষাসাধন আছে, সর্ব্বপ্রয়োগ করিয়া দেখ—তবে মানিতে প্রবৃত্ত হও। চিলে কান লইয়া গিয়াছে, শুনিয়া চিলের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া কোন ফল নাই। আগে হাত লাগাইয়া স্পর্শ দ্বারা জান, তোমার কান আছে, কি গিয়াছে—যদি না থাকে, তখন বিচার কর, ঐ স্থানে ও ঐ সময়ে চিল আসিবার সম্ভাবনা আছে কি না। যদি থাকে, তবে সন্ধান লও, সত্যই চিলকে আসিতে কেহ দেখিয়াছে কি না। যদি দেখিয়া থাকে, তখন সন্ধান লও তোমার কান চিলে লওয়া কাহারও প্রত্যক্ষ হইয়াছে কিনা। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে শুধু শোনা কথার বিশেষ মূল্য নাই। যদি কেহ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে, তবে সে লোকটি আপ্ত কিনা—অন্ততঃ তাহার বিরুদ্ধে কিছু ভাবিবার আছে কি-না, তাহা নিরূপণ কর। এতটা বিচার করিলে তবে বিশ্বাস করিতে পার। কিন্তু এত করিয়াও তোমার প্রকৃত বিশ্বাস হইবে না, সম্ভাবনা-বুদ্ধির উপরে তুমি উঠিতে পারিবে না। ব্যবহার-জগতে এই পর্য্যন্তই সম্ভবপর ও আবশ্যক। এতটার পরে এই যে বিশ্বাস, ইহাও কিন্তু মিথ্যা হইতে পারে। কিন্তু হইলেও লৌকিক দৃষ্টিতে তোমার খেদ করিবার হেতু নাই। কারণ, যতটা পরীক্ষা করিতে পারা যায়, ততটা করিয়া তবে তুমি আস্থা স্থাপন করিয়াছিলে। এই প্রকার বিশ্বাস না করিলে ব্যবহার কঠিন হইয়া পড়ে। এই বিশ্বাস যদিও প্রকৃত বিশ্বাস নহে,—কারণ ইহা জ্ঞানোদয়ের পূর্বে সঞ্জাত, তথাপি ইহা অন্ধবিশ্বাস নহে। কারণ, ইহার পূর্বে বিচার রহিয়াছে। মূলতঃ ইহাও প্রত্যক্ষের উপরে স্থাপিত। অন্ধবিশ্বাসে মন নিস্তেজ হইয়া যায়। যুক্তি ও বিচার হইতে পরাঙ্মুখ হওয়া কাপুরুষতার লক্ষণ। প্রকৃত বিশ্বাস আসিলে যুক্তি নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে—তাহার আবশ্যকতা থাকে না। কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাসের পূর্ব্বে, জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে, সদ্বিচার ও সদ্‌যুক্তির আবশ্যকতা আছেই।

জি—যাহা অসম্ভব, তাহা বিশ্বাস করা কি অন্ধবিশ্বাস নহে? অনেকে বিনা দ্বিধাতে অনেক অসম্ভব বিষয়ও মানিয়া থাকেন। ইহা কি অন্ধবিশ্বাসের নিদর্শন নহে?

ব—কোন্‌টা সম্ভব, আর কোন্‌টা অসম্ভব—তাহার কোন মানদণ্ড আছে কি? সর্ব্বং সর্ব্বাত্মকম্—সব জিনিষেই সব জিনিষ আছে, সবই সর্ব্বময়। শুধু তাহাই নয়—আত্মাতে বিশ্ব আছে, বিশ্বে আত্মা আছেন—যে দেখিতে জানে, সে দেখিতে পারে। যে শক্তিশালী ও তত্ত্বজ্ঞ, সে জানে কিছুই অসম্ভব নহে। জ্ঞানের আবরণ খসিয়া গেলে অচিন্ত্য শক্তির মহিমা উপলব্ধি করিতে পারিবে—দেখিবে, তুমি এখন যাহা

চিন্তা পর্য্যন্ত করিতে পারিতেছ না, তাহাও সম্ভবপর ঐ অঘটন-ঘটনা পটীয়সী শক্তির প্রভাবে তাহাও সংঘটিত হইতে পারে—অনেক স্থলে হইয়াও থাকে। এইজন্য "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ", অচিন্ত্য ভাব সম্বন্ধে বৃথা তর্ক করিবে না। যিনি ক্ষমতাশালী, যিনি ব্রহ্মবিৎ যোগী, যিনি প্রকৃতির রহস্যজ্ঞ, যিনি মায়াধীশের অনুগ্রহে মায়াকে অতিক্রম করিয়াছেন ও মায়াকে চালনা করিতে সামর্থ্য লাভ করিয়াছেন, তিনি কি না পারেন? ঈশ্বরসাম্য লাভ করিয়া যে যোগী যোগৈশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছেন, তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারেন। অর্থাৎ তিনি প্রত্যক্ষ দেখাইতে পারেন যে, বাস্তবিক পক্ষে অসম্ভব কিছুই নাই। যাহার যতটুকু ক্রিয়াশক্তি, সে ততটুকুই সম্পাদন করিতে পারে, যাহার জ্ঞানশক্তি যতটা বিকশিত, সে ততটাই ধারণা করিতে পারে—তাহার বেশী পারে না। এক জনে যাহা পারে না, আর একজনে শক্তির আধিক্য-বশতঃ তাহা পারে, অন্য একজনে তদপেক্ষা অধিক পারে। শক্তির আবরণ যতই অপগত হইতে থাকে, ততই সম্ভাবনার রাজ্যের প্রসার বাড়িয়া যায়। যখন শক্তি অনাবৃত ও মুক্তাবস্থা লাভ করে, তখন সবই সম্ভবপর হইয়া থাকে। বিজ্ঞানবিৎ যোগী মহাশক্তির কৃপায় কিছুই অসম্ভব দেখেনা।

বস্তুতঃ এ জগতে কিছুই আশ্চর্য্য নাই—অথচ সবই আশ্চর্য্য। যিনি প্রকৃত যোগী, তিনি কিছুতেই আশ্চর্য্য হন না, কারণ তিনি এমন বস্তুর উপলব্ধি করিয়াছেন, যেখানে যাবতীয় বিরুদ্ধ ধর্ম্মের একত্র সমন্বয় হইয়াছে, যেখান হইতে সর্ব্বভাবের সম্ভব হইতেছে তিনি দেখেন, সবই হইতে পারে। সর্ব্বত্র যখন সর্ব্ববিধ সত্তা অনুস্যূত রহিয়াছে এবং পরম সত্তা যখন অখণ্ডভাবে বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছে, তখন না হইতে পারে এমন কি আছে? দেশ, কাল ও নিমিত্ত তাঁহার দৃষ্টিকে আবদ্ধ করিতে পারে না। যে-স্থানে যে-ভাবের অভিব্যঞ্জক সামগ্রী আছে, সেখানে সেই ভাবই প্রকটিত হয়—বাকী সব অব্যক্ত থাকে। কিন্তু অব্যক্ত থাকিলেই সব ভাবেরই সত্তা আছে—প্রতিবন্ধকতাবশতঃ শুধু তাহাদের অভিব্যক্তি হইতেছে না। প্রবল ইচ্ছাশক্তি দ্বারা অথবা বিজ্ঞান-কৌশলে প্রতিবন্ধক দূর করিতে পারিলে যে-কোন স্থানে যে-কোন ভাবের প্রকাশ করা যাইতে পারে। এ বিষয়ে লক্ষ লক্ষ বার ত আমি সহস্র সহস্র প্রকারে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিয়াছি। যে-ভাব প্রবল হয়, তাহাই অন্যান্য ভাবকে অভিভূত করিয়া ফুটিয়া উঠে—জগতের লোকে সেই অভিব্যক্ত ভাবটিকেই একটি বিশিষ্ট বস্তুরূপে দেখিতে পায়। কিন্তু যে জ্ঞানী, তাঁহার জ্ঞান-নেত্রে অব্যক্ত ভাবও গোচর হইয়া থাকে। ইচ্ছা করিলেই যে-কোন অব্যক্ত ভাবকে তিনি ফুটাইয়া তুলিতে পারেন। এই যে অব্যক্ত ভাবের কথা বলিলাম—ইহাই বীজ। তাই জ্ঞানী কিছুতেই

আশ্চর্য্য হন না তাঁহার নিকট প্রকৃতির সব চালাকী ধরা পড়িয়া যায়, ফাঁকি চলে না। জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার যে কৌশলের উপরে চলিতেছে, তাহা তিনি জানেন। তাই তিনি কিছুতেই মোহিত হন না সর্ব্বদাই স্বরূপস্থ থাকেন। ইন্দ্রজালে মোহিত হওয়া বা আত্মস্বরূপকে দেখিতে না পাওয়াই আত্মবিস্মৃতির প্রধান নিদর্শন। জ্ঞানী বা যোগী তাই উদাসীন, সমদৃষ্টি, নির্লেপ ও নিরঞ্জন। এই গেল এক পক্ষের কথা।

পক্ষান্তরে যিনি জ্ঞানী বা যোগী, তিনি দেখেন, এ জগতের সবই আশ্চর্য। একটি ধূলিকণার মধ্যে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সত্তা তিনি দেখিতে পান। এই যে পরিচিত জগৎ, যাহা অত্যন্ত পরিচিত বলিয়াই আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে না, তাহা জ্ঞানীর দৃষ্টিতে অপূর্ব্ব। তিনি সর্ব্বত্র সেই মহাশক্তির খেলাই দেখিতে পান, দেখিয়া বিস্মিত হন। সেই পরম মহানের মহত্ত্ব তিনি ক্ষুদ্রতম পরমাণুর মধ্যেও প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেন—একবিন্দু বীর্য্য হইতে এই সুন্দর অপূর্ব্ব চমৎকারশালী দেহ উদ্ভূত হয়, একটি বীজ হইতে বৃহৎ বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, এক স্ফূলিঙ্গ অগ্নি হইতে বিশাল দাবানলের সৃষ্টি হয়। একটি ক্ষুদ্র ফলে বা পুষ্পে যে সৃষ্টিকৌশল লক্ষিত হয়, সূক্ষ্মদর্শী ও ধীরপ্রকৃতি তাহা দেখিয়া স্তম্ভিত হন। এই জগতের অতি ক্ষুদ্র ঘটনা হইতে মহাপ্রলয়ের সূচনা হয়, একটি মাত্র ক্ষণের দৃষ্টিপাত হইতে চির-জীবনের সত্য স্থাপিত হয়—আশ্চর্য্য কোন্‌টি নয়? যাহাকে ঘোর বিপদ মনে করিতেছ, দেখিবে, তাহাতেও পরম মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে। জ্ঞান-নেত্রে যাহা দেখিবে, যাহা কিছু ভাবিবে সর্ব্বত্রই অদ্ভুত দেখিবে। কোথাও বিস্ময়ের অন্ত পাইবে না। অচিন্ত্য মহাশক্তির লীলাদর্শন করিয়া ধন্য হইবে। কৃত-কৃত্য হইবে, হৃদয়ে পরম ভাবের উদয় হইবে। জ্ঞানী ভিন্ন কাহারও পক্ষে বিশ্বরূপ দর্শন, বিশ্বনাট্যের অভিনয় দর্শন, সম্ভবপর নহে।

অতএব আশ্চর্য্য হইবার বিষয় কোথাও না থাকিলেও সর্ব্ববস্তুই পরমাশ্চর্য্যময়। যাহা অতি কঠিন, তাহাই অতি সরল ও সহজ; যাহা দূরে, তাহাই অতি সমীপস্থ একেবারে নিজের অঙ্কগত ইহার চেয়ে আশ্চর্য্য কি আছে? একটি ক্ষণের মধ্যে বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে সমগ্র অতীত ও অনাগত কাল বিদ্যমান রহিয়াছে, বিন্দুর মধ্যে সিন্ধু খেলা করিতেছে। যাহা ছোট, তাহাও বড় দেখায়, যাহা বড়, তাহাও ছোট দেখায়—সেজন্য এরূপ হইয়া থাকে, তাহার ভিতরে প্রবেশ করিলে জানা যায় যে, কিছুই অসম্ভব নাই, জানা যায় যে, যাহা "অণোরণীয়ান্" তাহাই আবার "মহতো মহীয়ান্"—অথচ স্বরূপতঃ তাহা অণুও নহে, মহৎও নহে।

জিজ্ঞাসু—কর্ম্ম হইতে জ্ঞানের বিকাশ হয়, একথা আপনি পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন কিন্তু যাহাকে প্রচলিত ভাষায় ঐশ্বর্য্য বা যোগবিভূতি বলে, তাহাও কি কর্ম্ম হইতেই উৎপন্ন হয়? অনেকে বলেন, বিভূতি জ্ঞানের পরিপন্থী, সুতরাং উহা হেয়। জীবের

মুখ্য উদ্দেশ্য আত্মজ্ঞান এবং মুক্তি। বিভূতি প্রকাশিত হউক বা না-ই হউক, তাহাতে জ্ঞান বা মুক্তির বাধা জন্মাইতে পারে না।

বক্তা—বৎস, যাহাকে প্রকৃত প্রস্তাবে যোগ-বিভূতি বলে, তাহা যোগ-প্রতিষ্ঠা ব্যতিরেকে প্রকাশিত হয় না। লৌহ দহন-সামর্থ্য লাভ করিলে ঐ শক্তিকে তাহার বিভূতি বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। বিভূতি পরমাত্মার স্বাভাবিক শক্তি-স্বরূপ। যখন আবরণ কাটিবার সঙ্গে সঙ্গে জীব নিজের পরিচয় কিছু কিছু প্রাপ্ত হয় ও পরমাত্মার সঙ্গে যোগযুক্ত হয়, তখন হইতেই তাহার শক্তির বিকাশ হইতে আরম্ভ হয়। বিভূতি আগন্তুক ধর্ম্ম নহে, সুতরাং তাহার জন্য পৃথক প্রয়াস করিতে হইবে। ইহা আকাঙ্ক্ষা করিতে হয় না—চিত্তশুদ্ধি ও জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে ইহা আপনিই জাগে। রোগ কাটিয়া গেলে যেমন দেহে বল-সঞ্চার হয় এবং ঐ বল যেমন স্বাস্থ্যের লক্ষণ, সেই প্রকার অবিদ্যা কাটিয়া গেলে আত্মশক্তির স্ফূরণ হয় এবং ইহা অবিদ্যা-নিবৃত্তির লক্ষণ।

জি—পতঞ্জলি বলিয়াছেন যে, ব্যুত্থানাবস্থায় যাহা সিদ্ধি, নিরোধ অবস্থার পক্ষে তাহা অন্তরায় স্বরূপ। সিদ্ধি যদি আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে তাহাকে অন্তরায় বলা হইত না। পতঞ্জলি এবং তদনুযায়ী যোগিসম্প্রদায়ের মতে বিভূতি সকল নির্ম্মল আত্মজ্ঞান লাভের পূর্ব্বে উদিত হয়। উহারা জ্ঞান ও কৈবল্যের প্রতিবন্ধক।

ব—বৎস আত্মা যদি স্বভাবতঃ—সর্বশক্তিসম্পন্ন না হইতেন, তাহা হইলে তাহাতে শক্তির বিকাশ অন্তরায়-রূপে পরিগণিত হইতে পারিত। অগ্নির সঙ্গে দাহিকা শক্তির যে সম্বন্ধ, প্রদীপের সঙ্গে প্রভার যে সম্বন্ধ, আত্মার সহিত আত্মশক্তিরও সেই প্রকার সম্বন্ধ জানিবে। আত্মা সর্ব্বশক্তির আশ্রয় স্বরূপ—নিখিল শক্তির স্ফূরণ আত্মা হইতেই হইয়া থাকে, এবং উহাদের লয়-স্থানও আত্মাই। দেবলোক, গন্ধর্ব্বলোক, নরলোক এবং অন্যান্য যেকোন লোকে যে-কোন শক্তি দেখিতে পাও, সবই আত্মারই শক্তি, জানিও। আত্মার অনন্ত শক্তি আধার-ভেদে অভিমান ও প্রকাশের তারতম্যবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন শক্তিরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। শক্তির পরিচ্ছন্ন প্রকাশই জড়ত্বের নিদর্শন। জীবাত্মা যতদিন শক্তি-দরিদ্র থাকে, ততদিনই উহার বন্ধন ও জড়ত্বের আবেশ জাগরুক থাকে—অভিমানের সত্তাও ততদিন পর্য্যন্ত। কিন্তু যখন অভিমানরূপ গণ্ডী অতিক্রান্ত হয়, জড়ভাবের আচ্ছাদন অপগত হয়, তখন বিশুদ্ধ আত্মবোধের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার নিখিল শক্তি ক্রমশঃ অনাবৃতভাবে প্রকাশ পাইতে থাকে। এই জ্ঞানলাভ বা শক্তি-প্রকাশের তিনটি অবস্থা আছে। বুঝিবার সুবিধার জন্য

আমি তাহাকে সিদ্ধি, মহাসিদ্ধি ও অতিসিদ্ধি এই তিন প্রকার নামকরণ করিতে ইচ্ছা করি। সিদ্ধি অবস্থায় শক্তি দ্বৈতভাবে উপলব্ধ হয়—ইহা জ্ঞেয়, ভোগ্য বা দৃশ্যরূপে আত্মায় ফুটিয়া উঠে। আত্মার সহিত ইহার অভিন্নতা-সম্পাদন সাধনার পরিপাকে দ্বিতীয় অবস্থায় হইয়া থাকে। তখন অনন্ত শক্তির অন্তর্গত কোন শক্তিরই বাহ্য স্ফূর্ত্তি থাকে না, শক্তিপুঞ্জ তখন আত্মাকে অন্তর্লীনভাবে বিদ্যমান থাকে, আত্মা হইতে পৃথক বা দৃশ্যরূপে তাহাদের সত্তা থাকে না। তখন একমাত্র আত্মা আপনাতে আপনি পূর্ণভাবে বিরাজ করিতে থাকেন,—ইহাকেই আমি মহাসিদ্ধি বলি। তোমরা হয় ত ইহাকে কৈবল্য বা অদ্বৈত-স্থিতি বা অন্য কোন নামে অভিহিত করিবে। কিন্তু ইহার পরেও অবস্থা আছে। এই অদ্বৈত অবস্থা হইতে ইচ্ছানুসারে শক্তির বহিরুন্মেষ অথবা দ্বৈতের উদয় অতিসিদ্ধির লক্ষণ। একটি সাধারণ দৃষ্টান্তের দ্বারা আমি কথাটি পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতেছি। মনে কর, তোমার ভোগ্য অন্ন যখন তণ্ডুলাদিরূপের বর্ত্তমান ছিল, তখন উহার অপক্ক বা অসিদ্ধ অবস্থা। আগুন জ্বালাইয়া তাহার সাহায্যে জল প্রভৃতি উপকরণ অবলম্বন করিয়া ঐ তণ্ডুলকে পরিপক্ক করা হইল এবং উহা অন্নরূপে পরিণত হইল—ইহা সিদ্ধাবস্থার নিদর্শন। এই অবস্থায় ভোগ্য বস্তু ভোগ্যরূপে, অথচ ভোক্তা হইতে পৃথকভাবে, বর্ত্তমান থাকে। ইহার পর যখন তুমি ঐ অন্ন গ্রহণপূর্ব্বক আত্মসাৎ করিলে তখন অন্নের পৃথক সত্তা আর থাকিল না—উহা তোমাতে মিশিয়া তোমারই দেহের অঙ্গীভূত হইয়া গেল, দেহ হইতে অন্নের পৃথক অস্তিত্ব আর থাকিল না। মহাসিদ্ধির অবস্থা কতকটা এইরূপ। দীর্ঘকাল পরেও যদি তুমি আপন দেহ হইতে ঐ অন্ন—এমন কি, ঐ তণ্ডুল পর্য্যন্ত বাহির করিয়া দিতে পার, তবে উহাকে অতিসিদ্ধির উদাহরণরূপে মনে করিতে পার।

বৎস, ব্যুত্থান এবং নিরোধকে সমান করিয়া উভয়কে সমরূপে আয়ত্ত করিতে পারিলে অতিসিদ্ধি অবস্থার উদয় হয়। যোগী কোন অবস্থারই দাস নহেন। দ্বৈত অথবা অদ্বৈত কোন অবস্থাতেই তিনি বদ্ধ হন না—অথচ তিনি সর্ব্ব অবস্থারই দ্রষ্টা ও উপলব্ধি কর্ত্তা।

আমি যে-ভাবে সিদ্ধি, মহাসিদ্ধি এবং অতিসিদ্ধির লক্ষণ বর্ণনা করিলাম, তাহা হইতে বুঝিতে পারিবে যে, একটি অবস্থাই ক্রমশঃ পরিপক্ক হইতে হইতে চরমাবস্থা পর্য্যন্ত উপনীত হয়। কিন্তু যিনি সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন কিন্তু মহাসিদ্ধি লাভ করেন নাই, তিনি দ্বৈত অবস্থায় বর্ত্তমান। এ অবস্থায় উপাস্য বা উপাসকের ভেদ বর্ত্তমান থাকে। ইহাকে লৌকিক ও অসিদ্ধ সাধকের অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া ভ্রমে পতিত হইও না। যে অসিদ্ধ, তাহার সাধ্য অথবা উপাস্য বস্তুর বিকাশই হয় নাই। কিন্তু আমি

যে সিদ্ধ অবস্থার কথা বলিতেছি, তাহাতে উপাস্য অথবা ধ্যেয় বস্তু সিদ্ধ সাধকের দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়—সাধকের দৃষ্টিতে তখন কোনও আবরণ থাকে না। কিন্তু উপাস্য বস্তুর প্রকাশ হইলেও উপাসকের সহিত তাহা অভেদপ্রাপ্ত হয় না—তখন উপাস্য এবং উপাসকের ভেদ পরিস্ফুটরূপে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। সাধারণতঃ এই অবস্থাকেই ইষ্টদেবতার সাক্ষাৎকার বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণনা করা হইয়া থাকে। ইহার পরের অবস্থায় এই ভেদ আর থাকে না, তখন উপাস্য এবং উপাসক পরস্পর মিলিত হইয়া এক অভিন্ন সত্তায় পরিণত হয়। তখন যে স্বয়ংপ্রকাশ সত্তা বিরাজমান থাকেন, তাঁহাকে উপাস্য কিম্বা উপাসক কিছুই বলা চলে না। ইহাই মহাসিদ্ধির অবস্থা? কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, এই অদ্বৈত অবস্থাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট অবস্থা এবং ইহার পরে আর কোনও অবস্থা নাই। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। ইচ্ছার স্ফূরণমাত্র এই অবস্থা হইতে যদি পূর্ব্ববৎ ভেদাবস্থা জাগান যায় এবং ইচ্ছামাত্রই উহাকে যোগের অতিসিদ্ধ অবস্থা বলিয়া বুঝিতে হইবে। যিনি ব্যুত্থান এবং নিরোধ উভয়ের অতীত যিনি দ্বৈত এবং অদ্বৈত উভয়ের অতীত এবং যিনি সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় উভয় অবস্থার অতীত, তিনি সর্বাবস্থায় সর্বভাবে অসঙ্গস্বরূপেই বিদ্যমান থাকেন। নিজের এই অবস্থার উপলব্ধি করাই অতিসিদ্ধির লক্ষণ। অতিসিদ্ধ যোগী ক্রিয়াশীল হইয়াও নিষ্ক্রিয় এবং নিত্য নিষ্ক্রিয় হইয়াও সর্ব্বদা কর্ম্মপরায়ণ। কিছুতেই তাঁহার বন্ধন নাই। সুতরাং তাঁহাকে মুক্ত বলাও ভাষার অপপ্রয়োগ মাত্র। ঈশ্বরের সংকল্পে যখন সৃষ্টির উদয় হয়, তখন কি তুমি মনে কর, ঈশ্বর আবদ্ধ হইয়া পড়েন? তুমি কি মনে কর, ঈশ্বরের সত্তা হইতে যাহা প্রবাহক্রমে বহির্গত হয় তাহার দ্বারা ঈশ্বর সীমাবদ্ধ হয়? এরূপ মনে করিবার কোনও কারণ নাই। যখন তিনি কোনও শক্তির স্ফুরণ করেন, তখন উহা তাঁহা হইতে যেন কতকটা পৃথক্ ভাবেই প্রকাশমান হয়। কিন্তু বাস্তবিক পার্থক্য কখনই হয় না। তদ্রূপ আবার যখন উহাকে প্রত্যাকর্ষণ করিয়া আত্মস্বরূপে বিলীন করেন, তখন উহা তাঁহার সঙ্গে অভিন্নবৎ বর্ত্তমান থাকে। ভেদের সময় ভেদও যেমন অলীক, অভেদ অবস্থায় অভেদও তেমনি অলীক—অথচ দুই-ই সত্য।

এবার তোমার প্রশ্নের সমাধান বুঝিতে পারিবে। সিদ্ধি ততক্ষণ পর্য্যন্ত অন্তরায়রূপে পরিগণিত হইতে পারে যতক্ষণ পর্য্যন্ত দৃশ্যরূপে আত্মা হইতে পৃথকভাবে অবস্থিত থাকে। ভেদদৃষ্টি থাকিবার জন্য ঐ অবস্থায় আসক্তি কিম্বা প্রলোভন অথবা অহঙ্কার অত্যন্ত সূক্ষ্ম আকারে থাকিবার সম্ভাবনা। বস্তুতঃ দ্বৈতভাব থাকা পর্য্যন্ত অভয়-পদের প্রাপ্তি হইতেই পারে না। তুমি সিদ্ধিকে যে অন্তরায়রূপে গণনা করার কথা বলিয়াছ, তাহা এই অবস্থায় সম্পূর্ণ সত্য, কারণ ঐ সকল শক্তি

আত্মশক্তিরূপে প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত উহা অভেদজ্ঞান ও অমূলক উপশমপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক স্বরূপ। কিন্তু যখন ঐ সকল শক্তি আত্মজ্ঞানের মাহাত্ম্যে আত্মশক্তিরূপে পরিণত হইয়া যায়, উহাদের পৃথক্ অস্তিত্ববোধ আর থাকে না, উহাদিগকে আত্মারই স্বাভাবিক স্ফূরণ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, শুধু তাহাই নহে—যখন আত্ম-স্বরূপে উহারা সম্পূর্ণভাবে বিলীন হইয়া অদৃশ্য হইয়া যায় এবং তাহার পর মহাশক্তির কৃপায় পূর্ব্ববর্ণিত অতিশক্তির অবস্থায় উদয়ে আবার যখন যোগীর ইচ্ছানুসারে প্রকটিত হয়, তখন উহাদের অন্তরায়ত্ব থাকে না। বস্তুতঃ দ্বৈত এবং অদ্বৈত বিকল্প হইতে মুক্ত না হইতে পারিলে স্বাতন্ত্র্যরূপা নির্ব্বিকল্পসিদ্ধি আয়ত্ত হয় না।

জি—আপনি এই যে অতিসিদ্ধি নামক অবস্থার কথা বর্ণনা করিলেন, ইহাই কি সিদ্ধির পূর্ণরূপ? অথবা ইহার উপরেও শ্রেষ্ঠ অবস্থা আছে?

ব—বৎস, ইহা সিদ্ধির পূর্ণরূপ বটে, কিন্তু পূর্ণতর অথবা পূর্ণতম রূপ নহে। কারণ, এই অবস্থায় ইচ্ছাশক্তি বর্ত্তমান থাকে। ইচ্ছা থাকিলেই অভাব থাকিবেই কারণ, যেখানে অভাব নাই সেখানে ইচ্ছার উদয় হইতে পারে না। কিন্তু অভাব থাকিলেও এই অবস্থার অভাব প্রচলিত অভাবের ন্যায় নহে। তোমরা জগতে যে প্রকার অভাব দেখিতে পাও, তাহা হইতে এই অবস্থার অভাবের প্রভেদ এই যে, ইহা স্বভাবের সঙ্গে যোগকালে উদিত হয় বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে নিবৃত্ত হইয়া যায়। এই অভাব-নিবৃত্তিকেই শাস্ত্রে পরমানন্দের আস্বাদন বলিয়া বর্ণনা করা হয়। এই অভাব-বোধই বিরহ এবং উহার নিবৃত্তিই মিলন। স্বভাবের সম্বন্ধে এই মিলন ও বিরহ চক্রাবর্ত্তক্রমে নিত্যলীলারূপে বিরাজ করিতেছে। ইচ্ছার উদয় ভিন্ন আনন্দের আস্বাদন হইতেই পারে না। যে তৃষ্ণার্ত্ত নহে সে জলের আস্বাদন কি করিয়া বুঝিবে? শুধু জলে মাধুর্য্য থাকিলেই উহার অনুভব হয় না—উহার জন্য পিপাসা থাকা চাই। সেইরূপ, স্বভাবরূপ অমৃতভাণ্ডার বর্ত্তমান থাকিলেও যতক্ষণ আকাঙ্ক্ষা না জাগে এবং উহার সঙ্গে সংযোগ না হয়, ততক্ষণ অমৃতের আস্বাদন পাইবার কোনই উপায় নাই। আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে অমৃত-হ্রদে ডুবিয়া গেলেও তাহার আস্বাদন পাওয়া যাইতে পারে না। আমি অতিসিদ্ধি নামে যে অবস্থা সম্বন্ধে তোমাকে কয়েকটি কথা বলিয়াছি, তাহা মহাশক্তির চরণ স্পর্শজনিত পরমানন্দ উপলব্ধির অবস্থা মাত্র। ইচ্ছাশক্তি এইখান হইতেই বিকাশপ্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় যেমন অভাব জাগে, তেমনিই সঙ্গে সঙ্গেই তাহার নিবৃত্তি হয়। স্বভাবের সঙ্গে যোগের এমনিই মহিমা। তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার, অভাব যখন নিবৃত্তই হয়, তখন উহার জাগিবার প্রয়োজন কি? ইহার উত্তর তোমাকে পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। ইহার একমাত্র প্রয়োজন আনন্দের আস্বাদন। মা সন্তানকে এই কৌশলে নিজের অপার মাধুরী উপভোগ করাইয়া

থাকেন। ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ এইখানে করিবার প্রয়োজন নাই, উহা সময়ান্তরে হইতে পারিবে।

জি—আপনার কথা হইতে বুঝিতে পারিলাম, এই অতিসিদ্ধি অবস্থাই ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়াশীল অবস্থা। এই আনন্দময় অবস্থার পরের অবস্থা কিরূপ তাহা জানিতে ইচ্ছা হইতেছে।

ব—যখন আনন্দেরও স্ফূরণ হয় না, তখনকার অবস্থাকে ঠিক আনন্দময় বলিয়া নিরূপণ করা চলে না। উহা আনন্দ ও নিরানন্দ উভয়েরই অতীত। জগন্মাতার কোলে উঠিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া তাহার পর আনন্দও কাটিয়া গেলে এই দ্বন্দ্বাতীত ও মোহের অতীত অবস্থার স্থিতি হয়। তোমরা কি বলিবে জানি না—আমি কিন্তু ইহা বর্ণনার দ্বারা বুঝাইতে পারিব না। ইহার বর্ণনা সম্ভবপর নহে।

জি—বাবা, আপনি অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছেন। আমাকে নিম্ন-ভূমির অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। আপনি একটু নামিয়া আসিয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে উপদেশ দিন।

আচ্ছা, আপনি যে সিদ্ধির বর্ণনা করিলেন, ইহা কি এক, অথবা বহু। সিদ্ধির সংখ্যা কত। পৃথক পৃথক সিদ্ধি আয়ত্ত করিবার উপযোগী পৃথক পৃথক উপায় আছে কি?

ব—সিদ্ধি বাস্তবিক পক্ষে এক ও অখণ্ড, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বিভক্তবৎ হইয়া তাহা লোকের নিকট বিভিন্ন নামে পরিচিত হইয়া থাকে। আমি যাহাকে সিদ্ধি, মহাসিদ্ধি এবং অতিসিদ্ধি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, তাহাকে প্রকারান্তরে ক্রিয়াসিদ্ধি, জ্ঞানসিদ্ধি এবং ইচ্ছাসিদ্ধি বলিয়া মনে করিতে পার। তোমাদের পাতঞ্জল দর্শনের বিভূতিপাদে যে সকল খণ্ডসিদ্ধির উল্লেখ আছে, তাহার অনেকগুলি এই ক্রিয়াসিদ্ধিরই অন্তর্গত। কতকগুলিকে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধিও বলা যাইতে পারে। নিজের উপাদান বিশুদ্ধ করিয়া তাহাকে আয়ত্ত করিতে পারিলে তাহাকে নানাভাবে কার্য্য করাইতে পারা যায়। বলিতে কি, পাতঞ্জলে যে কয়টি সিদ্ধির উল্লেখ আছে তাহা অপেক্ষা সহস্র গুণে অধিক সিদ্ধি ইচ্ছামাত্রই প্রকাশ করা যাইতে পারে। যাহার উপাদান বিশুদ্ধ হইয়াছে, তাহার পক্ষে ইহাতে কিছুই বাহাদুরী নাই। যে ভাল করিয়া বর্ণপরিচয় শিক্ষা করিয়াছে এবং ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের পরস্পর সংযোগ ও বিয়োগের প্রক্রিয়া অবগত আছে, তাহাকে যেমন শব্দের বিন্যাস ও বিশ্লেষণ করিতে বেগ পাইতে হয় না, ঠিক সেই প্রকার যিনি শুদ্ধসত্ত্বরূপা শক্তির তত্ত্ব অবগত আছেন, তিনি এই স্থূলজগতে না করিতে পারেন এমন কোন কার্য্য নাই। ভূত-জয়, ইন্দ্রিয়-জয় এবং বিবিধ সংযম হইতে যে সকল সিদ্ধি আবির্ভূত হয়, শুদ্ধসত্ত্বে অধিষ্ঠিত যোগীর পক্ষে তাহা

অকিঞ্চিৎকর। অণিমা, মহিমা; লঘিমা, গরিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, প্রাপ্তি যত্রকামাবসায়িত্ব,—এই অষ্টসিদ্ধি ব্যতিরেকে আকাশগমন, পরকায়া-প্রবেশ, পরচিত্ত-জ্ঞান, দূরদৃষ্টি, দূরশ্রুতি এবং আরও বহুসিদ্ধির কথা যোগশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। পৃথক পৃথক সিদ্ধি পৃথক পৃথক উপায়ে আয়ত্ত করা যায় বটে, কিন্তু সত্ত্বসিদ্ধি হইলে পৃথকভাবে কোন সিদ্ধির জন্য করিতে হয় না। যোগী যোগমার্গে অগ্রসর হইলে অবস্থা-বিশেষে সিদ্ধি সকল আপনিই উদিত হয়,—যে লুব্ধচিত্তে সিদ্ধির প্রার্থনা করে, সে কখনই প্রকৃত যোগ-সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারে না।

জি—বাবা, বুদ্ধদেব, মুসা, খ্রীষ্ট, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি সিদ্ধ মহাত্মাগণ সকলেই শূন্যপথে সঞ্চরণ করিতে পারিতেন। কিন্তু এ খেচরী সিদ্ধির আবশ্যকতা কি? ইহা না হইলে কি যোগপথে উন্নতি করা যায় না?

ব—যোগমার্গে উন্নতি করিতে এ ক্ষমতার বিকাশ হইবেই। ইহা বায়ু ও ব্যোম-তত্ত্বের সিদ্ধি। যোগীকে একটি একটি করিয়া সকল তত্ত্বই আয়ত্ত করিতে হয়—তবে ত সেই নিরাবরণ চিদাকাশে অবস্থান ও সঞ্চরণ সম্ভবপর হয়। বৎস, কঠিন সাধনা ভিন্ন যোগী হওয়া যায় না।

জি—ষট্ চক্র ভেদ করিয়া সহস্রারে প্রবেশ পূর্ব্বক সহস্রদল কমলের কর্ণিকার মধ্যস্থিত সুধাবর্ষী চন্দ্রমার স্নিগ্ধ জ্যোতিঃতে আপ্লুত হইয়া চিদানন্দময় স্বরূপে রসধারা পান করাই, চক্রভেদপরায়ণ যোগীর লক্ষ্য। আকাশগমনাদি সিদ্ধি লাভ না করিলেও ইহা হইতে পারে?

ব—বৎস, নাভির সহিত সহস্রারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। নাভি-ক্রিয়াতে পরিপক্ক না হইলে সহস্রারের প্রবল তেজরাশির মধ্যে অভিভূত হইয়া পড়িবার আশঙ্কা থাকে। আকাশ-গমনের ক্ষমতা নাভিক্রিয়া-সিদ্ধির লক্ষণ। কুণ্ডলিনীকে চেতন করিতে হইলে নাভিচক্রে যে ব্রহ্মগ্রন্থি আছে, তাহার উন্মোচন করিতে হয়—পরে বিষ্ণুগ্রন্থিরও উন্মোচন আবশ্যক হইয়া পড়ে।

জি—ইচ্ছাশক্তি এবং অন্যান্য যোগৈশ্বর্য্য সম্বন্ধে একটি একটি করিয়া অনেক বিষয় জানিবার আছে। দেহতত্ত্ব, নাড়ীচক্রের স্বরূপ, সৃষ্টি-রহস্য, বিজ্ঞান-রহস্য—অনেক বিষয়ের আলোচনাই এখন বাকী রহিয়া গেল।

ব—যোগ এবং সূর্য্যবিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিজ্ঞানের আলোচনা করিবার ইহা অবকাশ নহে। ঐ সকল তত্ত্ব অত্যন্ত গুহ্য। তবে অবকাশ অনুসারে সময়ান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে সাধন-তত্ত্বের সমালোচনা-উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক-ভাবে যোগসম্বন্ধে অতি সামান্য দু-একটি কথা যাহা বলিয়াছি, আপাততঃ

তাহাই যথেষ্ট। জগদম্বার ইচ্ছা হইলে এই সকল বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা ভবিষ্যতে করিব। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শুধু শ্রবণ করিয়া এই সকল গুহ্য তত্ত্ব সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞানলাভ হয় না—অবিরাম পরিশ্রম করিয়া ইহা উপলব্ধি করিতে হয়। গ্রন্থাদিতে যোগ, জ্ঞান, কর্ম্ম কিম্বা বিজ্ঞান সম্বন্ধে যাহা কিছু লিপিবদ্ধ দেখিতে পাও, তাহা অত্যন্ত অল্প। তাহা হইতে বিশিষ্ট জ্ঞান উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই।

জিজ্ঞাসু—বাবা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও বিভূতি সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পরে শুনিব। আপাততঃ আমার দু একটি প্রশ্নের সমাধান হইলেই আজিকার জন্য বিশ্রাম করিব। শুনিতে পাই, ত্যাগ বা সন্ন্যাস ভিন্ন না কি মুক্তি হয় না। যদি আত্মজ্ঞানই মুক্তির কারণ হয়, তাহা হইলে সন্ন্যাসের আবশ্যকতা কি? কারণ, আত্মজ্ঞানই মুক্তির কারণ হয়, তাহা হইলে সন্ন্যাসের আবশ্যকতা কি? কারণ, আত্মজ্ঞান ত চিত্তশুদ্ধি ও গুরু-কৃপা হইলে যে কোন অবস্থাতেই হইতে পারে। তাহাতে একমাত্র সন্ন্যাসীর অধিকার হইতে পারে না।

বক্তা—বৎস, সন্ন্যাস কি? সম্যক্ প্রকার ত্যাগের নাম সন্ন্যাস। কি ত্যাগ করিবে? কেন ত্যাগ করিবে? ত্যাগের ফলাফল কিছু আছে কি? এ সব বিচার্য্য প্রশ্ন। দেখ, যাহা তোমার বস্তু নয়, তাহা তুমি ত্যাগ করিতে পার না—কিন্তু কি বস্তু তোমার আপনার, তাহা ভাবিয়া দেখ। যাহা তোমার নিজের হইবে, তাহার উপর তোমার স্বামিত্ব বা অধিকার থাকিবে। এ জগতের কোন বস্তুর উপর তোমার তেমন অধিকার নাই। এমন কি, এত যে ঘনিষ্ঠ দেহ,—যাহার সহিত তুমি জড়িত হইয়া আছ,—যাহাকে তুমি আপনার বলিয়া জান,—যাহাকে তুমি ভ্রান্তিবশতঃ নিজের স্বরূপ বলিয়াই মনে কর, তাহাও তোমার আপনার নহে। তোমার স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে তাহা চালিত হয় না। তাহা প্রাকৃতিক নিয়মে চালিত হয়—তোমার ইচ্ছা এখনও এত বিশুদ্ধ ও শক্তি-সম্পন্ন হয় নাই যে, তাহা প্রাকৃতিক নিয়মকে লঙ্ঘন করিয়া নিজের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারে। তোমার দেহও বস্তুতঃ তোমার আপন নহে। ইচ্ছা মাত্র দেহ গ্রহণ ও ত্যাগ করা তোমার আয়ত্ত নহে। ইচ্ছা করিলে তুমি দেহকে ছোট বড় হাল্কা বা অদৃশ্য করিতে পার না, তুমি মৃত্যুকে জয় করিতে পার নাই, দেহকে অধীন করিতে পার নাই—এ দেহ লইয়া স্বামিত্বের অহঙ্কার করা তোমার সাজে না। মন-সম্বন্ধেও সেই কথা। জগতের অন্যান্য সকল বস্তুই এই দেহ, মন ও ইন্দ্রিয় দ্বারা তোমার সহিত সম্বন্ধ। যদি তুমি দেহাদির স্বামীই না হইতে পারিলে, তবে জগতের কোন্ জিনিষটিকে তুমি আপন বলিতে পারিবে? আসল কথা, বস্তুতঃ তোমার নিজস্ব বলিতে সত্য সত্যই কিছুই নাই। তুমি আবার কি ত্যাগ করিবে?

জি—তাহা হইলে কি সব আপনার করিয়া লইতে হইবে? জগতের যাবতীয় বস্তু—দেহ, মনঃ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, সব জয় করিয়া আত্মসাৎ করিতে হইবে? তবে কি

সব জিনিষের উপর প্রভুত্ব লাভ করিতে হইবে? যদি তাহাই হয়, তবে আর ত্যাগ করিব কেন? আর পরিশেষে ত্যাগ করাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে অর্জ্জন করার প্রয়োজন কি? ইহা কি শুধু ব্যর্থ শ্রম নহে?

ব—না। ব্যর্থ শ্রম নহে। ত্যাগ ভিন্ন যথার্থ ভোগের অধিকার জন্মে না। আবার ভোগাধিকার না থাকিলে ত্যাগের অধিকার হয় না। যাহারা অমৃত-পিপাসু, তাহাদিগকে ত্যাগ করিতেই হইবে—"ত্যাগেনৈকেন দেবা অমৃতত্বমানশুঃ"। ত্যাগই অমরত্ব লাভের একমাত্র পথ। ত্যাগরূপ যজ্ঞ ভিন্ন অমৃত বা সুধার প্রাপ্তি দুর্ঘট। ত্যাগাত্মক সোপানে আরোহণ করিয়াই দিব্য ভূমিতে যাইতে হয়। ঐ দিব্যাবস্থায় ত্যাগ ও ভোগের সমন্বয় হইয়া যায়।

ত্যাগ করিবার জন্যই অর্জ্জন আবশ্যক। অর্জ্জন করিয়া সব আপন করিতে হইবে—বিশ্বজগৎ আত্মরূপে পরিণত হইবে। কিছুই পর থাকিবে না। দেখিবে,—প্রথমতঃ সবই তোমার স্বকীয় বিভূতি। এই জগতটি তোমারই আপন শক্তির বিকাশ—আত্মবিভূতি। দ্বিতীয়তঃ বুঝিবে সবই তুমিময়—তুমি সব সাজিয়া আছ। অর্জ্জনের চরমাবস্থায় সর্ব্বত্রই নিজেকেই দেখিতে পাওয়া যায়—সবই নিজের রূপ বলিয়া বোধে আসে। আপন রূপ ছাড়া দ্বিতীয় কিছু থাকে না।

এই অবস্থায় পৌছিলে নিজের মধ্যেই একটি অসীম অনন্ত বস্তুর আভাস জাগিয়া উঠে। ঐটিই তখন আপেক্ষিক দৃষ্টিতে দ্বিতীয় হইয়া দাঁড়ায়। ইহার পরে ঐ অসীম বস্তুতে সর্ব্বময় আমিকে বিসর্জন দিতে হয়। ইহাই আত্মনিবেদন বা ত্যাগ। ইহার ফলই পরমানন্দ লাভ বা অমৃতত্ব -প্রাপ্তি। যাহাকে দিব্য-ভাব বলে। ঐ অসীম বস্তুটি নিজের অন্তর্য্যামিরূপে অন্তরাত্মায় প্রকটিত হন। ঐ পরমানন্দের আস্বাদন বা অমৃত পান বস্তুতঃ মহাশক্তিময়ী জগদম্বার স্তন্যরস-পান বা পরম ঐশ্বর্য্যলাভ। মায়ের কোলে শিশু হইতে হইলে আত্মনিবেদনপূর্ব্বক সব বিসর্জ্জন দিতে হইবে। নিবেদন করিবার পূর্ব্বে নৈবেদ্যর সংগ্রহ। যাহার ঐশ্বর্য্য বা বিভূতির উদয়ই হয় নাই সে আবার কি ত্যাগ করিতে পারে? সে ত নিঃস্ব দীনহীন পথের ভিখারী—তাহার ত্যাগের অধিকার নাই। সকল জগৎকে আপন করিয়া লও—আপনাকে বিস্তার কর, আত্মশক্তির বিকাশ কর, সেই শক্তির দ্বারা অনাত্মভাবকে গ্রাস বা অভিভূত কর, সর্ব্বত্র আত্মভাবের প্রকাশ কর, পরে অসীম তত্ত্বাতীত অনন্ত-চৈতন্যময় সত্তা সাগরে ঐ আত্মভাবের নিরোধ কর, তবে ত অমর হইতে পারিবে। বাপু, শুধু বাব্‌লা পাতার রস খাইলে কি অমর হওয়া যায়?

জি—ঐ যে পরমানন্দের আস্বাদন, উহাকেই ত আপনি জীবের কাম্যধন বলিয়া পুরুষার্থরূপে বর্ণনা করিয়াছেন?

ব—তাহাতে আর সন্দেহ কি? উহাই ত মুক্তি। ত্রিতাপের জ্বালায় অধীর জীব দুঃখ হইতে দুঃখান্তরে ভ্রমণ করিতেছে, কিছুতেই তৃপ্তি পাইতেছে না,—সত্য বলিতে কি, শান্তি বা স্থিতি কোথাও হইতেছে না। ঐ অমৃত পান না করা পর্য্যন্ত তার তৃপ্তি নাই। ঐ পরমানন্দ-রস যখন সে পাইবে, তখন তাহার সকল ভ্রমণ সমাপ্ত হইবে, সব অন্বেষণ শেষ হইবে, চাঞ্চল্য নিবৃত্ত হইবে। মায়ের কোলের শিশু আবার মায়ের কোলে আরোহণ করিয়া মাতৃস্তন্যের রসাস্বাদন করিয়া বিভোর হইয়া যাইবে।

এই অমৃতপানই মায়ের প্রসাদ। ঠাকুরকে ভোগ দিয়া প্রসাদ লইতে হয়, যজ্ঞ করিয়া যজ্ঞাবশেষ অমৃত ভোজন করিতে হয়—ইহাই ঐ প্রসাদ বা অমৃত।

জি—সন্ন্যাস বা ত্যাগ ভিন্ন যে মুক্তি হয় না, তাহা ত ঠিকই মনে হইতেছে। জ্ঞান ভিন্নও মুক্তি হয় না, শুনিতে পাই। উভয় কথার তাৎপর্য্য কি?

ব—পূর্বে তোমাকে ত সবই বুঝাইয়া দিয়াছি। জ্ঞান ভিন্ন কি ত্যাগ হয়? বিদ্বৎ-সন্ন্যাসই প্রকৃত সন্ন্যাস। তবে যে বলা হয় সন্ন্যাস ভিন্ন জ্ঞান হয় না—সে শুধু বিবিদিষা-সন্ন্যাসকে লক্ষ্য করিয়া। তাহা প্রকৃত সন্ন্যাস নহে। বিবিদিষা-সন্ন্যাসে কর্ম্ম থাকে। ঐ কর্ম্মই জ্ঞানকে জাগাইয়া বিদ্বং-সন্ন্যাস, উৎপাদন করে।

জি—কর্ম্ম বা যোগই জ্ঞানোদয়ের হেতু। তারপর সন্ন্যাস। আচ্ছা, মনে করুন, জ্ঞানের উদয় হইল, অথচঐশ্বর্য্যের বা বিভূতির বিকাশ হইল না—তাহা হইলে কেমন হইবে? তখন কি ত্যাগ করা হইবে? এমন অবস্থাও ত আছে।

ব—বৎস, জ্ঞানের উদয় হইলে ঐশ্বর্য্যের উদয় না হইয়া পারে না। ঈশ্বর ভাবই ঐশ্বর্য্য—তাহা আত্মার স্বরূপ হইতে পৃথক জিনিষ নহে। জ্ঞানের উদয়ে যখন আত্মার আবরণ তিরোহিত হয়, তখন আত্মার স্বভাব আপনিই জাগিয়া উঠে। জ্ঞানের উদয় হইলে ঐশ্বর্য্য প্রকাশিত হইবেই—ফুল ফুটিলেই তাহাতে মকরন্দের বিকাশ হইবে। ইহাই অর্জ্জন। ইহার পর ঐশ্বর্য্যের বিসর্জ্জন বা নিবেদন—ইহাই ত্যাগ। ইহার ফল পরমাত্মভাবে প্রতিষ্ঠা। আত্মভাব না জাগাইলে পরমাত্মভাবে প্রবেশ লাভ হয় না। আত্মার স্বভাবকে জাগাইয়া, পরে উহাকে নিরুদ্ধ করিতে হয়। এই নিরোধের পূর্ণতা হইতে অমৃতত্ব লাভ ঘটে।

আত্মার স্বভাবকে জাগান আর কুণ্ডলিনীর জাগরণ সমান কথা। সুতরাং কুণ্ডলিনীকে জাগাইয়া পরে তাহাকে অনন্ত-মধ্যে বিসর্জ্জন দিতে হয়—পরমশিবের অঙ্গে বিলীন বা যুক্ত করিতে হয়—তাহাই জীবের অমৃতলাভের উপায়। পরমশিব ও মুক্তকুণ্ডলিনী বা পরাশক্তির মিলন হইতে নিত্য যে সুধাস্রাব হয় বা আনন্দ ক্ষরণ হয়, জীব—মুক্ত জীব, তাহাই পান করে, আস্বাদন করে। সংক্ষেপে বাবাজীর চরিত কথার উপসংহার করিলাম।

তাঁহার জীবন অতি-বিচিত্র, দেহ অদ্ভুত, সাধনাদি সকলেই আশ্চর্য্য। নির্ম্মল চরিত্র, কঠোর সংযম ও নিয়মানুবর্ত্তিতা অথচ অসাধারণ করুণা, স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা, তীক্ষ্ণ ধীশক্তি—এই সকল গুণ তাঁহার প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য। তিনি বলেন,—"সহসা কাহাকেও বিশ্বাস করিও না। বিশ্বাস করিলেই ঠকিতে হইবে। এই জগতের প্রত্যেকটি পরমাণু তোমার প্রতিকূল। তোমার মিত্র একমাত্র তুমি নিজেই—নিজেকে ভুলিয়া বাহ্য মিত্রের দিকে আকৃষ্ট হইও না। নিজেকে জগতে জড়াইয়া ফেলিয়াছ, এখন জগৎ হইতে নিজের বিক্ষিপ্ত উপাদান গুটাইয়া লও—লইবামাত্র এক স্থানে নিজের পূর্ণ আদর্শ ঘনীভূতভাবে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবে। তাহাই তোমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়বস্তু, তাহারই অন্বেষণে কত জন্ম কত ভাবে ঘুরিয়াছ, এবার তাহাকে পাইয়া শান্তি লাভ কর। বিশ্বাস বড় দুর্লভ জিনিষ। যেখানে সেখানে বিশ্বাস স্থাপন করিতে নাই। প্রতিপদে সত্যাসত্যে পরীক্ষা করিতে হইবে—তবে ত বিশ্বাস স্থির হইবে। অস্থানে বিশ্বাস করিয়া প্রতারিত হওয়ার অপেক্ষা প্রথমে সংশয় করিয়া পরে অটল বিশ্বাসে স্থিতিলাভ করাই শ্রেষ্ঠ।" তিনি বলেন, "তীব্র পুরুষকার দ্বারা প্রাক্তন কর্ম খণ্ডন করা যায়। পুরুষকারের মহত্ত্ব অসীম। যোগাভ্যাসই মুখ্য পুরুষকার। সদ্-গুরুপদিষ্ট পথে তাঁহারই প্রদত্ত শক্তিতে শক্তিশালী হইয়া নিরন্তর শ্রদ্ধা ও সংযমের সহিত যোগকর্মের অনুষ্ঠান করিলে চিত্তশুদ্ধি হয় ও জ্ঞানের উদয় হয়। জ্ঞানের পরে শুদ্ধ ভক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে। ভক্তি পরিপক্ক হইলেই প্রেমের উদ্ভব হয়। তখন হৃদয় গলিয়া যায়। জগদম্বাকে পাইতে হইলে এই প্রেমই একমাত্র সাধন।"

বাবাজী বলেন যে, যোগ অতি গুহ্য ব্যাপার। সাধারণতঃ লোকে যাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে তাহা বস্তুতঃ যোগ নহে। লোকালয়ে খুব অল্পসংখ্যক লোকেই যোগতত্ত্ব অবগত আছে। তিনি শাস্ত্র ও সদাচারের একান্ত পক্ষপাতী, লোকসংগ্রহের জন্য সামাজিক ব্যবস্থার অনুগামী, অথচ শুষ্ক আচারমাত্র তৃপ্ত থাকার বিরোধী। তিনি বলেন, কর্ম না করিয়া শুধু গ্রন্থাধ্যয়নে কোটি জন্মেও জ্ঞানের উদয় হইতে পারে না। শাস্ত্র শুধু পথনির্দেশক মাত্র—কর্মদ্বারাই পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

তাঁহার স্বভাব অভিমানহীন, সরল ও বালকোচিত। এত জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য ও সাধন-সম্পৎ সত্ত্বেও তাঁহাকে মুহূর্তের জন্য অবিনয়ের প্রশয় দিতে দেখি নাই। সাধারণতঃ দেখা যায়, পরিচয়ের গাঢ়তার সহিত ভক্তির হ্রাস হইয়া থাকে—কিন্তু তাঁহাকে যিনি যত ঘনিষ্ঠভাবে চিনিবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন, তিনি তত অধিক মুগ্ধ হইয়াছেন;—যেন অনন্ত বস্তু, দেখিয়া দেখিবার সাধ মিটে না,—প্রতিক্ষণেই নব-নব ভাবের উদয় হয়।

এই সব ব্যাপার নিরন্তর দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছি যে, প্রকৃত যোগী অলৌকিক শক্তির অধিকারী হন। প্রত্যেক মনুষ্যই চেষ্টা করিলে ও ঠিক পথে অগ্রসর হইলে জ্ঞান ঐশ্বর্য্যের প্রভাবে পরমানন্দ লাভ করিতে পারে, ইহাই তাঁহার উপদেশ। মানুষ যে কত মহৎ, কত বড়, তাহা আত্মবিস্মৃত হইয়া যে ভুলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু কিছুদিন সৎপথে চলিতে পারিলে আবার সব বুঝিতে পারিবে। তিনি এই জন্যই কিছু কিছু অলৌকিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ দেখাইয়া থাকেন। এই সব দেখিয়া যখন মনুষ্য বুঝিতে পারিবে যে, তাহার মধ্যে সর্বশক্তি নিহিত আছে, শুধু কর্ষণের অভাবে তাহার বিকাশ হইতেছে না তখন সে বহির্মুখতা ও বিষয়-লিপ্সা ত্যাগ করিয়া যথার্থ বৈরাগ্য ও বিবেককে সঙ্গে করিয়া অনাসক্ত কর্মিরূপে পরমানন্দময় শ্রীভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে পারিবে। যিনি সর্বজগতের ও যাবতীয় ভাবের মূল উৎস, তাঁহাকে লাভ করিলে জীবের আর কোন অভাবই বা থাকিতে পারে? দেবদেবীতে অবিশ্বাস, শাস্ত্রে অবিশ্বাস গুরু ও মহাজন বাক্যে অবিশ্বাস, ইহাই বর্তমান সমাজের অবনতির কারণ। কিন্তু ইহাও অহেতুক নহে। দীর্ঘকাল তপঃসাধন পূর্বক সত্যের উপলব্ধি এখন অনেকের ভাগ্যেই ঘটে না। তাই সত্যলাভের মহত্ত্ব প্রায় কেহই প্রত্যক্ষ দেখাইতে পারে না। বহির্ভাবপ্রবণ মানব কিছু লোকোত্তর শক্তির প্রভাব দেখিতে না পারিলে শুধু বাক্‌প্রপঞ্চে আস্থা স্থাপন করিতে পারে না।

কেহ কেহ করেন, বিভূতি দেখান উচিত নহে, তাহাতে সাধকের ক্ষতি হয়। কেহ মনে করেন, বিভূতি তুচ্ছ জিনিষ, তাহার প্রতি শ্রদ্ধা করিবার হেতু নাই। কেহ বলেন, বিভূতি অনিত্য ধর্ম, নিত্য বস্তুই সাধ্য—অনিত্য ধর্মের প্রতি চিত্তের আকর্ষণ উচিত নহে। অন্য কোন কোন লোকের ধারণা, জ্ঞানী বা যোগী মায়াতীত ও নিস্ত্রৈগুণ্য পদে আরূঢ় হইলে বিভূতি অতিক্রম করিয়া যান—তিনি বিভূতি দেখাইবেন কি প্রকারে? এই সকল শঙ্কার সমাধান-চেষ্টা এখানে নিষ্প্রয়োজন হইলেও সংক্ষেপে দুই একটি প্রাসঙ্গিক কথার আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি।

যোগবিভূতি সম্বন্ধে এই সকল ধারণাই অস্পষ্ট বলিয়া মনে হয় লোকাত্তর ব্যাপার মাত্রই বিভূতির নিদর্শন বটে, কিন্তু উহা যোগবিভূতি নহে। পরম পদার্থের সহিত সংযোগ হইলে জীবভাব অভিভূত হইয়া তাহাতে যে ঐশ্বর্য্য-ভাবের উদয় হয় তাহাই যোগ-বিভূতি। ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া শক্তিরূপে উহা ত্রিধা-বিভক্ত হইয়া জগতে আত্মপ্রকাশ করে। সমবাহু ত্রিকোণের তিন বিন্দুই উন্মেষপ্রাপ্ত শক্তিত্রয়ের প্রকটিত রূপ। বিভাগের পূর্বে ইচ্ছাদি শক্তিত্রয় মধ্যবিন্দুতে একাত্মভাবে পরাশক্তিরূপে বিলীন থাকে। এই মধ্যবিন্দুতে অবস্থিতিই যোগ—এখান হইতে যে স্ফূরণ হয়, তাহাই যোগবিভূতি। ইচ্ছা জ্ঞান ও ক্রিয়ারূপে এই স্ফূরণ প্রকাশিত হয় বলিয়া ইচ্ছাশক্তি,

জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিকে যোগবিভূতি বলা যাইতে পারে। ব্রহ্মবিদ্যায় বিদ্বান না হইলে স্থিতি হয় না, পরম সাম্য সংঘটিত হয় না, নিরঞ্জন সাক্ষিভাবের বিকাশ হয় না। যোগ হইতেই ব্রহ্মবিদ্যার উদয় হয়। সুতরাং যোগবিভূতি ব্রহ্মজ্ঞানেরই নিদর্শন। বস্তুতঃ চিন্ময়ী পরাশক্তির সহিত সম্বন্ধ হইলে যোগীর অসাধ্য কি থাকিতে পারে? তখন মহামায়ার কৃপায় অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া বশীভূত হয়—ইহাই ঐশ্বর্য্য। কারণ, মায়াকে অধীন করার নামই ঈশ্বরত্ব। ইহা অখণ্ডৈশ্বর্য্য যাবতীয় খণ্ডৈশ্বর্য্য ইহারই ভিন্ন ভিন্ন আংশিক বিকাশ মাত্র। যোগী এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে আর তাঁহার চ্যুত হইবার ভয় থাকে না। আত্মবিস্মৃত জীবকে আপন স্বভাবে ফিরাইয়া লইবার জন্য যোগিগণ অধিকার ও যোগ্যতা বিচার করিয়া কাহাকেও কিছু কিছু ঐশ্বর্য দেখাইয়া থাকেন—কিন্তু ইহাও তাঁহার পরমেশ্বরের আদেশানুসারেই করিয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহাদের ক্ষতি হইবার আশঙ্কা কি? প্রকৃত যোগীর আসক্তি ও অহঙ্কার থাকে না—তাঁহার যোগ কখনই খণ্ডিত হইবার নহে। পাতঞ্জলি দর্শনে মধুমতী অবস্থার কথা যে বর্ণিত হইয়াছে তাহা নিম্নভূমির কথা। সিদ্ধযোগী পরমেশ্বরের সহিত যোগযুক্ত—তিনি পাতঞ্জল সম্প্রদায়ের চতুর্থভূমিরও অনেক উর্দ্ধে অবস্থিত। উপাদান ও নিমিত্ত অভিন্ন না হওয়া পর্যন্ত, অদ্বৈত ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত, যোগিপদবাচ্য হওয়া যায় না। কুণ্ডলিনী শক্তির উদ্বোধন নিবদ্ধন প্রজ্ঞানেত্রের উন্মীলনের ক্রম-পরিণতিতে শিবত্বের বিকাশ পূর্ণতালাভ করিলে প্রকৃত যোগভাবের উপলব্ধি হয়। বিশুদ্ধ চৈতন্য নিত্য স্বপ্রকাশ হইলেও এই অবস্থাতেই আত্মপ্রকাশ করে। যোগী তখন শক্তিচক্রের নাভিতে অধিরূঢ় হইয়া অনন্ত শক্তি লইয়া খেলা করিতে পারেন, আবার নিজের খেলা নিজেই দেখিতেও পারেন। বস্তুতঃ মহাশক্তির সঙ্গে যোগযুক্ত বলিয়া তাঁহার পক্ষে খেলা করা ও খেলা দেখাতে কোন প্রভেদ নাই। যে অহঙ্কার বিমূঢ় সে গুণাত্মিকা প্রকৃতির খেলাকে নিজকৃত মনে করিয়া নিজে কর্তা সাজিয়া বসে, কিন্তু যিনি ব্রহ্মবিদ্যার প্রভাবে অহঙ্কারবিহীন ও গুণাতীত শুদ্ধ চিদ-বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত, তিনি নিষ্ক্রিয় দ্রষ্টা হইয়াও সব কার্য করেন এবং অখিল কার্য করিয়াও নির্লিপ্ত সাক্ষীই থাকেন। তিনি স্বভাবে আছেন বলিয়া তাঁহার পক্ষে খেলা করা ও খেলা দেখা একই ব্যাপার এ-পিঠ ও-পিঠ মাত্র।

হিমালয়ের যোগাশ্রমে যে প্রকার যোগ, বিজ্ঞান, রসায়ণ প্রভৃতি বিদ্যার আলোচনার ব্যবস্থা আছে, বাবাজী তাহারই অনুকরণে লোকালয়ে ক্ষুদ্র ভাবে উহা প্রবর্তিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। সেই জন্য কাশীধামের 'বিশুদ্ধানন্দ কানন' নামক আশ্রমে একটি 'শিক্ষামন্দির' ও একটি 'বিজ্ঞান-মন্দির' নির্মিত হইয়াছে। বিজ্ঞান-

মন্দিরের নির্মাণকার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছে বটে, কিন্তু মন্দিরের উর্দ্ধদেশে একটি নীলরক্তাদিবর্ণময় কাচের ক্ষুদ্র গৃহের আয়োজন এখনও চলিতেছে। এই কাচের গৃহ নির্মিত ও যথাবিধি সুসজ্জিত না হওয়া পর্যন্ত সূর্যবিজ্ঞান ও অন্যান্য বিজ্ঞানঘটিত প্রয়োগের ব্যবস্থা হইতে পারিবে না। বহুসংখ্যক এক-ইঞ্চি-গভীর, সুবৃহৎ, স্বচ্ছ ও রঞ্জিত কাচখণ্ড দ্বারা এই গৃহ নির্মাণ করিতে হইবে। পরে সুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্রাদি ধাতুময় স্থূল ও সূক্ষ্ম তারের দ্বারা সমগ্র মন্দিরটিকে ব্যাপ্ত করিতে হইবে। কাচ সংগ্রহের চেষ্টা চলিতেছে। আশা আছে, কাচ সংগৃহীত হইলেই অদূর ভবিষ্যতে মন্দিরের উদ্দিষ্ট কার্য আরব্ধ হইতে পারিবে।

যে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান-জগতের শিরোমণি, যাহা অধিকার করিতে পারিলে জীব যাবতীয় অভাব হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইয়া নিজের জন্মকালীন উপাদান অর্থাৎ ব্যক্তিগত প্রকৃতি, আমূল পরিবর্তনপূর্বক বিশুদ্ধ অবস্থা আয়ত্ত করিতে পারে, যাহা ভারতবর্ষের নিজস্ব হইলেও এখন দেশ হইতে লুপ্তপ্রায় হইতে চলিয়াছে, যাহা অতি দুষ্কর ক্লেশ স্বীকারপূর্বক দুর্গম পার্বত্য প্রদেশ হইতে প্রাপ্ত হইয়া সুদীর্ঘকালের সাধনাদ্বারা তিনি সিদ্ধ করিয়াছেন, তাহা তাঁহারই সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় লুপ্ত হইয়া যাইবে, ইহা তাঁহার ইচ্ছা নহে। তিনি ইহা যোগ্য পাত্রে ন্যস্ত করিয়া যাইতে ইচ্ছা করেন। এই বিদ্যার প্রভাবে জগতের কল্যাণ হউক, ইহাই তাঁহার আন্তরিক অভিলাষ। এই বিজ্ঞানের ক্ষমতা অসাধারণ, এমন কি, অপরিসীম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাবাজী বলেন যে, যোগশাস্ত্রে এমন কোন অলৌকিক সিদ্ধির বর্ণনা নাই, যাহা অপেক্ষাকৃত সুগম উপায়ে এই বিজ্ঞানের দ্বারা উপলব্ধি করা না যাইতে পারে। পাতঞ্জল দর্শনের বিভূতিপাদে, শিব-পুরাণাদি পৌরাণিক গ্রন্থে, তন্ত্র-শাস্ত্রে, বৌদ্ধ ও জৈনশাস্ত্রের যোগবিষয়ক গ্রন্থাদিতে, সুফী ও খ্রীষ্টীয় যোগিগণের গ্রন্থমালায়, এমন কোন ব্যাপার বর্ণিত হয় নাই, যাহা সূর্যবিজ্ঞানবিদের পক্ষে অলভ্য।

'বিজ্ঞান' বলিতে বাবাজী কি বুঝিয়া থাকেন তাহা তাঁহার নিম্নলিখিত কয়েকখানি পত্রের (গ্রন্থকারের নিকট লিখিত) উদ্ধৃত অংশ হইতে কতকটা বুঝিতে পারা যাইবে। তিনি লিখিয়াছেন—"বৎস, সমস্তই তাঁহার ইচ্ছা। উক্ত ইচ্ছাময়ীর কৃপা ব্যতীত কোন বিষয়েই কাহারও বুঝিবার শক্তি হয় না। মানুষ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে কেন? শুদ্ধ স্বভাবের ভাব ও গুণের বিষয় জানিতে চেষ্টা করে ও অনেক জানিয়াছে জানিয়া মায়া-জনিত দুষ্কর প্রলোভন হইতে নিস্তারের উপায় করিয়াছে ও করিতেছে বলিয়া। যাহাতে সম্পূর্ণ ত্রিতাপজনিত তাপ হইতে নিস্তার পায়, আর না হয়, এইরূপ চেষ্টাকেই সম্পাদ্যজ্ঞান বলে ইহাও দুইভাগে বিভক্ত—জ্ঞান ও বিজ্ঞান। যাঁর দ্বারা

সৃষ্টি ও লয় হয়, তিনি কে, কেন এরূপ করিতেছেন ইত্যাদি জানার নাম জ্ঞান। ইহার পরাবস্থা,—সৃষ্টি লয় যিনি করেন তাঁহাকে যিনি করেছেন * ঘোররূপিণী মহাশক্তি ব্যোমাতীত, তাঁর বিষয় জানার নাম বিজ্ঞান। জগৎ মিথ্যা, এই তিনিই সত্য।" (পুরীধাম হইতে ২১ বৈশাখ ১৩৩২-এ লিখি পত্র।) তাঁহার অন্য একখানা পত্রে আছে—"বৎস, যাহা দেখিতেছ, তাহা মহাশক্তির ব্যাপার। সচরাচর মানবের চিন্তাশক্তি জড়ের অন্ধশক্তিতে অন্ধীভূত হইয়া বিবিধভাবে ভ্রমণ করে, মহাশক্তি-বিজ্ঞান-তত্ত্ব ধরিতে সক্ষম হয় না। সর্বব্যাপিণী শক্তিতে স্থূলতা-বোধ যে ভুলের কথা ও তদ্দ্বারা যে মহাশক্তির জ্ঞান সম্ভবে না, এ বিষয়ে সহজেই জানা যায়। মহাশক্তি-জ্ঞান ও তাঁহার চিন্তা উভয়েই প্রবল যোগে স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক পদার্থ কর্তৃক চালিত নয়। উহাদের গতি মহাকাশভেদী একমাত্র মহাশক্তিতে। এই মহাবিজ্ঞান চিন্তার মধ্যবর্তী আর কেহ নাই। ইহা মহাশক্তির কৃপাতে ফুটিয়া উঠে। মানব-হৃদয়ে যদি সর্ষপ সদৃশ স্থানে পবিত্রতা থাকে তাহা হইলে অখণ্ড মহামায়াকে বিশুদ্ধভাবে চিন্তার যে জ্ঞান, উক্ত জ্ঞানের উজ্জ্বলতেজে সকল প্রকার পাপ তাপ, জ্বালা যন্ত্রণা, আসক্তির আবর্জনা প্রভৃতি ভস্মীভূত হইয়া যায়। তখন হৃদয়ে মহাশক্তির জগৎশক্তির জ্ঞানামৃত প্রকাশ হইয়া কলুষিত সন্তপ্ত চিত্ত মহা আবরণ হইতে পরিত্রাণ পায়ই পায়। বাহ্যিক ব্যাপার সমস্ত ভুলিয়া যায়। মহামায়ার কৃপা বিজ্ঞান-বলে মহাশক্তির মহাতত্ত্ব স্থূল জগতে আনিতে পারে। সীমাশূন্য মহাশক্তির মহাবিজ্ঞান আলোকে প্রাণে যে কি হয়—যার হইয়াছে সে-ই জানে। ভাষা নাই, ভাষা থাকিলে লিখিতাম। বেশ বুঝা যায়, যোগ ও বিজ্ঞান ব্যতীত এ বিষয়ে কিছুই জানা যায় না।" (৭ই ফাল্গুন, ১৩২৯, নং কুণ্ডুরোড, ভবানীপুর—কলিকাতা হইতে লিখিত।)

এই সকল পত্রাংশ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, জ্ঞান হইতে বিজ্ঞান শ্রেষ্ঠ—জ্ঞানের সারাংশই বিজ্ঞান। তত্ত্ববস্তুকে সামান্য ভাবে জানার নাম 'জ্ঞান', আর উহার অশেষ বিশেষ জানিয়া উহা সম্পূর্ণরূপে নিজের অধীন করার নাম 'বিজ্ঞান'। জ্ঞানের দ্বারা পরমাত্মার তুরীয় ভূমি পর্যন্ত উপলব্ধি করা যায়, কিন্তু তুর্য্যাতীত মহাশক্তির স্বরূপ বুঝিতে হইলে, যিনি সকল তত্ত্বের অতীত হইয়াও পরম তত্ত্ব, তাঁহাকে ধরিতে হইলে, বিজ্ঞান ভিন্ন গত্যন্তর নাই। জ্ঞানীর চিত্তও ভগবতী মহামায়ার মায়াচক্রে পতিত হইয়া মোহাবর্তে হাবুডুবু খাইতে পারে, এমন সম্ভাবনা আছে—কিন্তু জ্ঞান

* আর এক স্থলে বাবাজী লিখিয়াছিলেন — "যিনি সকলের মঙ্গলপ্রদ ও সকলের আধারে বর্তমান এবং জ্ঞান ও নির্বাণ মুক্তির মূল, তাঁহাকে যিনি প্রসব করিয়াছেন তিনি তোমাদের সকলের মঙ্গল করুন, এই আমার ইষ্ট" (গুমো হইতে ২০শে মাঘ, ১৩৩৩এ লিখিত পত্র)।

যখন বিজ্ঞানে পরিণত হয়, যখন এক পক্ষে শুদ্ধা ভক্তি ও অপর পক্ষে শুদ্ধা কৃপা উদিত হইয়া মহাশক্তির সুশীতল অঙ্কে ভক্তকে আকর্ষণ করিয়া লয়, তখন আর পতনের আশঙ্কা থাকে না। শিশু যখন জননীর হস্ত অবলম্বন করিয়া চলিতে থাকে, তখন তাহার পতনের সম্ভাবনা থাকে, কারণ দুর্বল শিশুর ক্লান্ত মুষ্টি স্খলিত হইতে কতক্ষণ লাগে? কিন্তু যখন জননী স্বয়ং শিশুকে করাবলম্বন দান করেন, নিজ হস্তে শিশুকে ধরিয়া চালাইতে থাকেন, তখন আর ভয়ের কোনও কারণ থাকে না। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের পরস্পর সম্বন্ধ কতকটা এই প্রকার বুঝিতে হইবে। বিজ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে জ্ঞান ও অজ্ঞান সমসূত্র হইয়া উভয়ই নিষ্প্রভতা প্রাপ্ত হয়। দ্বৈত ও অদ্বৈত, নিত্য ও অনিত্য, গতি ও স্থিতি সমভাবে দর্শন করিতে হইলে বিজ্ঞানই একমাত্র আশ্রয়। এই প্রসঙ্গে বাবাজীর আর একখানা পত্র হইতে কিঞ্চিৎ অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন,—'বৎস, সকল শক্তির মূল যে শক্তি তিনিই প্রথম ও শেষ, সকল বিষয়ে তাঁর প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নাই। তিনি শক্তি সঙ্কোচ করিলে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ এবং বিচিত্র জগৎ সকল দেব-দেবী,—যাহা কিছু আছে তাহাদের অস্তিত্ব থাকিবে না, আর দৃষ্ট হইবে না। একমাত্র পূর্ণ পরমানন্দময়ী ব্রহ্মময়ী দ্বৈতাদ্বৈত, নিত্য ও অনিত্য লীলায় সুখ-দুঃখ, হা-হুতাশ, পিতা-পুত্র, সেব্য-সেবক প্রভৃতি লইয়া মজার খেলা করিতেছেন। প্রয়োজন-অপ্রয়োজন নিজেই জানেন। জীবাত্মা, স্বরূপ আত্মা, পরমাত্মা, স্থূল-আত্মা ভুল-আত্মা প্রভৃতি যাহা আছে, সবই মহাশক্তি মায়ের ভাব। এ ভিন্ন আর কিছুই বুঝা যায় না। বাবা, অসার যুক্তি-তর্কে ত কিছু পাওয়া যায় না—প্রত্যক্ষ জিনিষের আবার যুক্তিতর্ক কি? জগৎ-প্রসবিনী প্রত্যক্ষ মা-যোগে ব্রহ্মাতীত-মা-মহাভাবতত্ত্বের সারমর্ম ক্রিয়ার দ্বারা হৃদয়ে সর্বদাই গ্রহণ কর, বাহ্যিক ভাবের ভিতরে টলিয়া না পড়িয়া সর্বদাই মাকে স্পর্শ করিতে সক্ষম হও, তাহা হইলেই সব হইবে।" (১৭ই চৈত্র, ১৩৩২, ২০নং রূপনারায়ণ নন্দন লেন, ভবানীপুর হইতে লিখিত)।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান উভয়ের সহিতই সবিতৃতত্ত্বের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। সূর্য্যে সংযম করিলে যে ভুবন-জ্ঞান হয়, যাবতীয় পদার্থের জ্ঞানলাভ হয়, তাহা যোগশাস্ত্রে আছে। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, সূর্য্যই সকল পদার্থে প্রসব কর্তা, মূল স্তম্ভ ও কেন্দ্র-স্বরূপ। সূর্য্যালোকেই পরিদৃশ্যমান জগতের যাবতীয় পদার্থ প্রকাশমান হয়। কি জাগ্রৎ, কি স্বপ্ন, সর্বদাই ও সর্বত্রই সৃষ্টির মধ্যে সূর্যই একমাত্র প্রকাশক। সূর্য হইতে যে তেজোধারা চারিদিকে বিক্ষিপ্ত, হইয়া ছড়াইয়া যাইতেছে, তাহাকে সংযত করিয়া একমুখে প্রবাহিত করিতে পারিলে সমগ্র জগৎ জ্ঞানহীন হইবে,—বাহ্যজ্ঞান,

ভেদজ্ঞান—সব লুপ্ত হইয়া যাইবে। সূর্য্য-রশ্মির বিক্ষেপ হইতে জাগতিক জ্ঞানের উদ্ভব। যখন রশ্মির সংঘাত প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন জীবেরও বিক্ষিপ্ত জ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া একাগ্রজ্ঞানের উদয় হইবে। তারপর সেই সংযত রশ্মি, সেই কেন্দ্রীভূত ঘনীভূত প্রভা-রাশি, যখন সূর্য্যমণ্ডল ত্যাগ করিয়া উর্দ্ধে উত্থিত হইতে থাকিবে' তখন প্রণবের আলোকে পরম-তত্ত্ব প্রকাশমান হইতে থাকিবে, প্রবুদ্ধা কুণ্ডলিনী শক্তি আহতা ফণিনীর ন্যায় ঘোর নাদ সহকারে ব্রহ্মপথ অবলম্বনপূর্বক মহাব্যোমরাজ্য ভেদ করিয়া ব্যোমাতীত মহাশক্তির দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে। ইহাই বিজ্ঞানের আত্মপ্রকাশ। যাহা বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে হয়, ক্ষুদ্র দেহরূপ পিণ্ডেও ঠিক তাহাই হইয়া থাকে।

সূর্যকে আশ্রয় করিয়াই জ্ঞান ও বিজ্ঞান উভয়ের বিকাশ। সূর্য্যালোকে দেহ-মধ্যস্থ ইড়ামার্গ-সঞ্চারী চন্দ্র প্রকাশিত হইয়া স্নিগ্ধ অমৃত-ধারায় সমস্ত দেহকে আপ্যায়িত করিয়া থাকে। পিঙ্গলাবর্তী সূর্য যখন ক্রিয়া-কৌশলে প্রবল তেজোময় রূপ ধারণ করে, তখন তাঁহারই সংস্পর্শে মধ্যশক্তি কিয়ৎ পরিমাণে উত্তেজিত হইয়া বাম পার্শ্বস্থ ইড়ামার্গে সঞ্চরণশীল চন্দ্রমাকে উগ্রভাবে পরিণত করে ক্রমশঃ দক্ষিণশক্তি, মধ্যশক্তি ও বামশক্তি—তিনটি শক্তিই সমভাবে উত্তেজিত হয় ত্রিকোণের তিনটি কোণই সমরূপে বিক্ষোভ প্রাপ্ত হয়, তখন ঐ তিন শক্তি সমষ্টিভূত হইয়া মধ্যস্থ ব্রহ্মবিন্দুকে আঘাত করিয়া জাগাইয়া দেয়—ইহাই কুণ্ডলিনীর জাগরণ অথবা মন্ত্র চৈতন্য-সম্পাদন। সুতরাং সূর্যের প্রবলতা দ্বারাই চন্দ্র-সূর্য্যের সাম্য স্থাপিত হয়, পরিশেষে সুষুম্নার সহিত অভেদ সম্পন্ন হয়। যখন এই তিনটি পৃথক স্রোতঃ এক খাতে পতিত হইয়া সামঞ্জস্য লাভ করে তখন স্বভাবতঃই অদ্বৈতমার্গ উন্মুখ হয় ও সেই মুক্ত আলোকে তত্ত্ববস্তুর দর্শন হয়। একাগ্র ভূমির অবসানে নিরোধ আয়ত্ত না হইলে, চিত্তবৃত্তির ঐকান্তিক নিবৃত্তি না হইলে, স্বয়ংপ্রকাশ বিজ্ঞানতত্ত্বের স্ফুরণ হওয়া সম্ভবপর নহে। মহাশক্তির রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে একাগ্রভূমির জ্ঞানকে নিরুদ্ধ করিয়া পরিপূর্ণ বিজ্ঞান শক্তির আশ্রয় গ্রহণ অত্যাবশ্যক।

তন্ত্রের মাতৃকাতত্ত্ব ও বর্ণতত্ত্ব গভীরভাবে আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায়, যে, উহাতে সূর্য-বিজ্ঞানেরই রহস্য নিহিত রহিয়াছে। জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার সর্ববিধ ব্যাপারেই মাতৃকা-মণ্ডলের ক্রিয়া তন্ত্রশাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। ষড়ধ্বার বিচার প্রসঙ্গে একদিকে পদ, মন্ত্র ও বর্ণ এবং অপরদিকে ভুবন, তত্ত্ব ও কলার পরস্পর সম্বন্ধ নিরূপণ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে বর্ণ ও কলা অচ্ছেদ্য সম্পর্কে বিজড়িত। শিব-শক্তির ন্যায় বাক্ ও অর্থ নিত্যসম্বন্ধ বস্তুতঃ অকারাদি বর্ণমালা শুদ্ধাবস্থায় বিক্ষুব্ধ সবিতৃবিন্দু হইতে নিঃসৃত নাদময় রশ্মিচক্র ভিন্ন অন্য কিছু নহে। শব্দ ব্রহ্ম-

রূপ হিরণগর্ভ বা সবিতা কেন্দ্রস্থলে, ব্যোমমধ্যে, এক ও অখণ্ড থাকিয়াও বাহ্যভাবে উনপঞ্চাশৎ বায়ুর কম্পনে উনপঞ্চাশৎ বর্ণ বা রশ্মিরূপে বহির্গত হইতেছেন। এই পঞ্চাশৎ বর্ণই ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে আকারাদি-ক্ষকারান্ত বর্ণমালা বা অক্ষমালারূপে মূলাধার হইতে আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত ছয়টি চক্রের মধ্যে পঞ্চাশৎ দলে প্রকাশমান হইতেছে। এই বর্ণ বা নাদের তত্ত্ব আয়ত্ত করিতে না পারিলে ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার জন্মে না, কারণ ''শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি।'' শব্দ হইতেই জগতের সৃষ্টি আবার শব্দেই লয়—এমন কি, সৃষ্টি ও লয়ের অতীত, সঙ্কোচ-প্রসারণের ঊর্দ্ধস্থিত, অচ্যুত ব্রহ্মবিন্দুতে যাইতে হইলেও মন্ত্ররূপী শব্দই কর্ণধার। দেবতাদির দেহও এই মন্ত্রময় জ্যোতিঃর দ্বারাই গঠিত। যন্ত্রাদির স্বরূপও তাহাই। শুদ্ধ বিদ্যার দ্বারা আত্মসংস্কার করিয়া এই বিদ্যাধামের অধিষ্ঠাতা হইতে পারিলে। অর্থাৎ মন্ত্রেশ্বর, মন্ত্রমহেশ্বরাদি পদ প্রাপ্ত হইলে, বর্ণমালার উপর অধিকার জন্মে;—তখন সকল মন্ত্র ও দেবতা কিঙ্করবৎ তাঁহার অধীন হইয়া যায়। তিনি গুরুপদ-বাচ্য সদাশিবাবস্থা লাভ করেন। প্রণব ও ব্যাহৃতির রহস্য যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন যে বেদেও এই বিন্দু ও নাদের সাধনাই দেশোচিত ও কালোচিত নানা আকারে অধিকারভেদে উপদিষ্ট হইয়াছে। খ্রীষ্টিয় মত, প্রাচীন মধ্যযুগের পাশ্চাত্য যোগ সিদ্ধান্ত, সুফী মত এবং অন্যান্য দেশের অন্তরঙ্গ সাধনপ্রণালী, অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে জানিতে পারা যায় যে, সর্বত্র এই একই বিজ্ঞান প্রচারিত হইয়াছে। অনধিকারী লোকে তাহা বুঝিতে না পারিয়া স্থূলভাবে গ্রহণ করিয়াছে মাত্র।

প্রকৃতির সকল ব্যাপারই রঙ্গের খেলা—যে নির্লিপ্ত দর্শক, সে তটস্থভাবে দেখিতে পায় যে, একটি সর্বব্যাপক শুভ্রসত্ত্বময় বর্ণের উপর নীলরক্তাদি অনন্ত প্রকার মিশ্র ও অমিশ্র বর্ণের ঘাত-প্রতিঘাত চলিতেছে। ফলতঃ জলবুদবুদের ন্যায় বিশ্বরূপ ইন্দ্রজাল রচিত হইতেছে, অজ্ঞানীর রঞ্জিত নেত্রে ঐ ইন্দ্রজাল বা মায়িক ব্যাপার সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। যতক্ষণ চক্ষুঃ হইতে বর্ণের আবেশ না কাটিবে, যতক্ষণ মোহ নিবৃত্তি না হইবে, ততক্ষণ মিথ্যাদর্শন কাটিবে না। যে শুভ্র ভিত্তির উপর এই অপরূপ মায়াচিত্র ক্রীড়া করিতেছে, তাহাকে যথার্থভাবে দেখিতে না পাইলে এই বিচিত্র জগদ্দর্শনে মোহিত হইতেই হইবে। বৈচিত্র্যের অন্তঃস্থিত সেই ব্যাপক ও অখণ্ড ঐকসূত্রটি আবিষ্কার করিতে হইলে, চিত্তের ও তৎসহকারী ইন্দ্রিয়গণের মার্জ্জনা আবশ্যক। যে সকল বাসনাত্মক চিত্র-বিচিত্র বর্ণরাশি অন্তর্দ্দর্পণকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদিগকে বিদূরিত করিয়া উহার স্বাভাবিক স্বচ্ছতাকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। চিত্ত স্বয়ং শুভ্র হইলে শুভ্রসত্ত্বময় জগদাধারকে সহজেই দেখিতে পায় তখন মায়াবীর মায়া ধরিতে বিলম্ব হয় না।

বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য এই বিরাট ইন্দ্রজালের মূলসূত্র আবিষ্কার করা। বর্ণমালার সংযোগ ও বিয়োগ হইতেই জগতের যাবতীর ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে। সৃষ্টি ও প্রলয় এই সংযোগ ও বিয়োগের অবশ্যম্ভাবী ফল। বিজ্ঞানবিৎ কার্য্যমাত্রের উপাদান ও নিমিত্তের স্বরূপ বিশিষ্টরূপে অবগত হইয়া বিধাতার কলা-কৌশল সাক্ষাদ্‌ভাবে ধরিতে পারেন। এমন কি কিয়ৎপরিমাণে বিধাতার ঐশ্বর্য্যও আয়ত্ত করিতে পারেন। শুধু তাহাই নহে। ইচ্ছা করিলে বিধাতাকেও অতিক্রম করিয়া সর্বমূলভূতা অনাদি মহাশক্তির শ্রীচরণপর্য্যন্ত উপস্থিত হইতে পারেন। বিশ্বামিত্রের জগদ্‌নির্মাণ, ভণ্ডাসুরের নবীন ও বৃহত্তর ব্রহ্মাণ্ড-রচনা, সাধন-রাজ্যের ইতিহাসে অপ্রসিদ্ধ ঘটনা নহে।

গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হইলে যেমন প্রথমে বর্ণপরিচয় আবশ্যক, তদন্তর বর্ণের সংযোজন প্রণালী শিখিতে পারা যায়, তদ্রূপ বিজ্ঞান শিক্ষারও প্রথম সোপান বিশুদ্ধ রশ্মির সহিত পরিচয় স্থাপন। সূর্য্যরশ্মি বিশ্লেষণপূর্বক প্রয়োজনানুসারে শুদ্ধবর্ণ চিনিয়া বাহির করিতে ও ধরিয়া রাখিতে পারিলে, ভিন্ন ভিন্ন রশ্মির পরস্পর মিলন-পদ্ধতি বুঝিতে পারা যায়। বেদান্ত শাস্ত্রে পঞ্চীকরণ ও উপনিষদাদিতে ত্রিবৃৎকরণ প্রণালীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কিন্তু বিজ্ঞানের ক্রিয়াকুশল মর্মজ্ঞ ভিন্ন অপর কেহ ইহা বুঝিতে পারেন না। ইহা যে রশ্মি-সংযোজনেরই একটি অবস্থা মাত্র, তাহা বলা বাহুল্য। যাহা হউক, এ বিষয়ে এখানে অধিক লেখা অনাবশ্যক।*

---

* 'সূর্য-বিজ্ঞান' সম্বন্ধে যথাশক্তি বিস্তারপূর্বক আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে। বহু লোকেই বাবাজীর কৃপায় সূর্যবিজ্ঞানের নানা প্রকার প্রয়োগ দেখিয়াছেন। ইংরাজী বাঙ্গালা প্রভৃতি বিভিন্ন পত্রিকায় পাশ্চাত্য ও দেশীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ ইহার আলোচনাও করিয়াছেন। কেহ কেহ বুঝিতেনা পারিয়া সূর্যবিজ্ঞানকে ইচ্ছাশক্তিরই অবস্থাভেদ বলিয়া বর্ণনা করেন। কিন্তু তাঁহারা বস্তুতঃ ইচ্ছাশক্তি কাহাকে বলে তাহা জানেন না। ইচ্ছাশক্তিতে উপাদানের অপেক্ষা করিতে হয় না। সত্যসংকল্প যোগীর ইচ্ছামাত্রই নিমেষের মধ্যে কার্য্য উৎপন্ন হয়,—বাহ্য উপাদানের আকর্ষণ আবশ্যক হয় না। ইহা অভিন্ন-নিমিত্তোপাদান-বাদী বৈদান্তিকের সিদ্ধ বা অদ্বৈত ভূমির বর্হির্মুখ অবস্থা। উৎপলদেব বলিয়াছেন—"চিদাত্মা হি দেবোহন্তঃ-স্থিতমিচ্ছাবশাদ বহিঃ। যোগীঃ নিরুপাদানমর্থজাতং প্রকাশয়েৎ।" অভিনবগুপ্তপাদাচার্য্য তাহার 'ঈশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞা-বিমর্শিনী'তে স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে ঈশ্বরসৃষ্টি ও যোগিসৃষ্টি উভয়ই নিরুপাদান। আত্মা চৈতন্যস্বরূপ—তাহাতেই বিশ্বপ্রপঞ্চ অভিন্ন ভাবে নিহিত রহিয়াছে। ইচ্ছানিবন্ধন সেই অন্তঃস্থিত পদার্থ বাহিরে প্রকটিত হয় মাত্র। প্রচলিত ভাষায় ইহাকেই 'সৃষ্টি' বলে। সুতরাং সৃষ্টির জন্য আত্মা ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তুর প্রয়োজন নাই। বেদান্ত সিদ্ধান্তও কিয়দংশে এই প্রকার। শুধু মায়ার স্থাননির্দেশে উভয়ে ভেদ লক্ষিত হয়। কিন্তু দ্বৈতবাদী নৈয়ায়িকাদি আচার্যগণ উপাদানের পার্থক্য স্বীকার করেন। তাঁহাদের

সূর্য-বিজ্ঞানের বহু ব্যাপার আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। এখানে সে সমুদায় বিস্তারপূর্বক বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহার সিদ্ধি সংখ্যা অগণ্য।

কিন্তু এ-সব সিদ্ধি তাঁহার নিকট একেবারে তুচ্ছ ও নগণ্য। মহাধনে ধনী হইয়া আজ তিনি অতুল যোগৈশ্বর্যকেও তৃণবৎ উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছেন, সেই ভগবৎ-প্রেমরূপ অমূল্য চিন্তামণি আজ যেন আমার তাঁহার নিকট হইতে চাহিয়া লইতে ভুলিয়া না যাই। তাঁহার আশীর্বাদে ও তাঁহার সঞ্চারিত বলে বলীয়ান্ হইয়া আজ যেন আমরা তাঁহার অনুগমণ করিতে সমর্থ হই। তিনি আমাদিগকে অসত্য হইতে সত্যে, অজ্ঞান হইতে জ্ঞানালোকে ও মৃত্যুরাজ্য হইতে অমরধামে লইয়া যাউন, ইহাই তাঁহার শ্রীচরণে বিনীত ও ভক্তিপূর্ণ প্রার্থনা।

মতে সত্যসংকল্প যোগীর সংকল্পমাত্রেই সর্বগত পরমাণুমন্ডল হইতে অভীষ্ট পরমাণু সকল পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া দ্ব্যণুকাদি ক্রমে ঝটিতি সম্মিলিত হয় ও ইচ্ছানুরূপ কার্য্যের রচনা করে। বলা বাহুল্য, উভয় মতেই ইচ্ছাই সৃষ্টির মূল—তজ্জন্য জ্ঞানতঃ উপাদানের অপেক্ষা করিতে হয় না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতে উপাদানকে প্রত্যক্ষ ভাবে চিনিয়া লইতে হয় ও তাহার সংযোগ-বিয়োগ প্রণালী যথাবিধি আয়ত্ত করিতে হয়। তদনন্তর যথাপ্রয়োজন কার্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি জ্ঞানপূর্বক, যোগিসৃষ্টি ইচ্ছাপূর্বক। উভয় প্রণালীতে পার্থক্য এই—প্রথম প্রণালীতে জ্ঞান ও ইচ্ছা তার অঙ্গস্বরূপ, দ্বিতীয়ে ইচ্ছাই অঙ্গী ও জ্ঞান অব্যক্ত ভাবে তাহার অঙ্গরূপে বর্তমান যাঁহারা বিজ্ঞানবিৎ নহেন, অথচ যোগীও নহেন তাঁহারা উভয় প্রণালীর সূক্ষ্ম ভেদ গ্রহণ করিতে পারিবেন না। উভয় সৃষ্টিই ব্যবহারিক, প্রাতিভাসিক মাত্র নহে। সুতরাং এই অংশে উভয় কোন পার্থক্য নাই। Hallucination, Hypnotic Illusion প্রভৃতি স্বপ্নদৃশ্যবৎ প্রাতিভাসিক সৃষ্টির নিদর্শন। স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ যেরূপ স্বপ্নান্তে বিলীন হইয়া যায় Hallucination প্রভৃতিও তদ্রূপ। ইন্দ্রিয়াদির বিকার প্রশান্ত হইলে তাহারা আপনিই মিলাইয়া যায়। যতক্ষণ প্রতীতি থাকে, ততক্ষণই তাহাদের সত্তা। তাহারা ব্যবহারিক জগতের কার্য্যসাধনক্ষম হয় না। তাহাদিগকে 'দৃষ্টি-সৃষ্টি' বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। কিন্তু যোগী সৃষ্টি ও বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি ঐ প্রকার অচিরস্থায়ী বা মিথ্যা নহে। উহা পারমার্থিক দৃষ্টিতে সমগ্র জগতের ন্যায় তুচ্ছ হইলেও ব্যবহার ভূমিতে সম্পূর্ণ সত্য ও চিরস্থায়ী। জগতের অন্যান্য সৃষ্ট পদার্থ যে প্রকার, উহার ঠিক সেই প্রকার। সত্যাসত্য নির্ণয়ের যে সকল Pragmatic test আছে তাহা দ্বারা বিচার করিলে উহা সত্য বলিয়াই মানিতে হইবে। 'পঞ্চদশী' প্রভৃতি গ্রন্থে ঈশ্বরসৃষ্টি ও জীবসৃষ্টিতে যে ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে, তদনুসারে বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি ও জীবসৃষ্টি হইতে বিলক্ষণ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। জীবের উপাধি মলিন সত্ত্ব অর্থাৎ রজঃ ও তমোমিশ্র সত্ত্ব। এই উপাধি হইতে যে সৃষ্টির উদয় হয় তাহা প্রাতিভাসিক,—স্বপ্নদৃশ্যবৎ ভ্রান্তিজল মাত্র। ইহা বন্ধনের হেতু। কিন্তু ঈশ্বরসৃষ্টি বিশুদ্ধ সত্ত্ব বা ঈশ্বরোপাধি হইতে উদ্ভূত হয় বলিয়া ব্যবহারিক-সত্তা-সম্পন্ন—ইহাকে মিথ্যা বলিয়া বর্ণনা করা চলে না। পরমার্থদশাতে ব্যবহার-ভূমি অতিক্রান্ত হইয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাতে ব্যবহারের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয় না। যোগ ও বিজ্ঞান উভয়ই বিশুদ্ধ সত্ত্বের প্রতিষ্ঠিত। তাই যোগ ও বিজ্ঞান বলে যে পদার্থ নির্মিত হয় তাহা সত্য হইয়া থাকে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা যথাস্থানে করা হইবে।

জ্ঞানগঞ্জ রহস্য

জ্ঞানগঞ্জের তত্ত্ব সম্বন্ধে যথাজ্ঞান কিঞ্চিৎ আলোক প্রক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিব। কারণ দেহ ও কর্মতত্ত্বের সহিত জ্ঞানগঞ্জের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। জ্ঞানগঞ্জের রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে না পারিলে এই বিষয়ের প্রকৃত সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই।

সিদ্ধভূমি অনেক আছে—শাস্ত্র পাঠে তাদের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং কোন কোন শক্তিশালী মহাত্মা নিজের জীবনে ঐ সম্বন্ধে কিছু কিছু প্রত্যক্ষ অনুভবও প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কথিত আছে, যে জ্ঞানগঞ্জ আমাদের এই পরিচিত পৃথিবীর একটি গুপ্ত স্থান বিশেষ—কিন্তু উহা এমন গুপ্ত যে, বিশিষ্ট শক্তির বিকাশ না হইলে এবং ঐ স্থানের অধিষ্ঠাতার অনুজ্ঞা না হইলে এই মর্ত্য জীবের দৃষ্টিগোচর হয় না। সিদ্ধভূমি মাত্রেরই ইহাই বৈশিষ্ট্য। সিদ্ধভূমি স্বয়ংপ্রকাশ হইলেও যে সকল জীব ঐ স্থান হইতে কোন প্রকার শক্তির আনুকূল্য প্রাপ্ত না হয় তাহাদের পক্ষে উহার দুর্ভেদ্য রহস্য ভেদ করা অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না1 বিভিন্ন সিদ্ধভূমির স্বরূপ পরিস্থিতি ও ক্রিয়া বিভিন্ন প্রয়োজন সাধনের জন্য বিভিন্ন ভূমি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে সিদ্ধভূমি, দিব্যভূমি প্রভৃতি অলৌকিক জীব-নিবাস-স্থান সকলকে এক বর্গেরই অন্তর্গত বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইল। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে উহাদের পরস্পর ভেদ ও প্রত্যেকটির নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান আছে। গোলক ধাম, নিত্য বৃন্দাবন, কৈলাস, নিত্য সাকেত প্রভৃতি স্থানের মহত্ব বিভিন্ন প্রকার। এই জাতীয় বিশিষ্ট স্থান মায়িক জগতে বিভিন্ন স্তরে বহু আছে। মায়ার ঊর্দ্ধেও আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, কেদারেশ্বর জল্পেশ্বর, মহাকাল এবং শ্রীশৈল—এই সকল ভুবন তেজতত্ত্বে বিদ্যামান আছে। উহারই অংশ অবলম্বন করিয়া যোগিগণ পৃথিবীতে অর্থাৎ ভারতবর্ষে ঐ সকল নাম দিয়া তীর্থ স্থাপন করিয়াছেন। তদ্রূপ অট্টাহাস কনখল, কুরুক্ষেত্র ও গয়া—এইগুলি বায়ুতত্ত্বের ভুবন। অবিমুক্ত, গোকর্ণ স্থাণু—আকাশ তত্ত্বের ভুবন। এইরূপ সর্বত্রই বুঝিতে হইবে। মলিন মায়ার উর্দ্ধে বিশুদ্ধ মায়া-রাজ্যেও অনেক ভুবন আছে, যাহাদের প্রতিরূপক পৃথিবীতে স্থাপিত হইয়াছে। বৌদ্ধশাস্ত্র অনুসারে অনাস্রব ধাতুতেও বিভিন্ন বুদ্ধ-ক্ষেত্র ও দিব্য ধাম বর্তমান রহিয়াছে। পৃথিবীতে উর্দ্ধলোকের প্রায় সমস্ত স্থানই আংশিকভাবে অবতীর্ণ ও প্রকট রহিয়াছে—এই সকল অংশকে অবলম্বন করিয়া অল্প আয়াসেই মূল স্থানকে প্রকাশ করা যায়। এই জন্য আমাদের এই সুপরিচিত বৃন্দাবন হইতেও নিত্য বৃন্দাবনের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং এই জাগতিক দৃষ্টি গোচর কাশী

হইতেও সুবর্ণময় শঙ্করের ত্রিশূলে প্রতিষ্ঠিত নিত্য কাশীর দর্শন লাভ করা যায়। সর্বত্রই অচ্ছিন্ন যোগসূত্র রহিয়াছে।

জ্ঞানগঞ্জের আলোচনাকালে স্মরণ রাখা উচিত যে, এই স্থান সাধারণ ভৌগোলিক স্থানের ন্যায় নহে। ইহা যদিও গুপ্ত ভাবে ভূ-পৃষ্ঠে বিদ্যমান আছে তথাপি ইহার প্রকৃত স্বরূপ বহুদূরে। প্রকৃত যোগী ভিন্ন এই স্থানের সন্ধান কেহ পাইতে পারে না, ইহাতে প্রবেশ লাভ করা তো দূরের কথা। তবে অধিকারিগণের অনুগ্রহ হইলে এই জগতের সাধারণ মানুষও সেখানে যাইতে সমর্থ হয়। ভৌম জ্ঞানগঞ্জ কৈলাসের পরে এবং উর্দ্ধে অবস্থিত। কিন্তু তাহা হইলেও উহা সাধারণ পর্য্যটকের গতিবিধির অতীত। জ্ঞানগঞ্জ, রাজরাজেশ্বরী মঠ, এবং পরম গুরুদেবের শ্রীমন্দির স্তর-বিন্যাসের দৃষ্টিতে বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত। জ্ঞানগঞ্জই সকলের নিম্নস্তর, রাজরাজেশ্বরী মঠ মধ্য স্তর এবং পরম গুরু মহাতপার স্থান সর্বোচ্চ। এই স্থানটি যোগী নির্মিত। ইহা সৃষ্টির আদিতে লোকস্রষ্টার সৃষ্টিরূপে প্রকট হয় নাই। ধ্রুবলোক যেমন সাধক বিশেষের তপস্যার ফলে কাল বিশেষে প্রকট হইয়াছে, গোলোক যেমন শ্রীকৃষ্ণের ভূ-পৃষ্ঠে অবতরণের সঙ্গে সংসৃষ্ট উচ্চতম নিত্য ধাম, সুখাবতী যেমন অনাস্রব ধাতুতে অমিতাভ বুদ্ধের বিশুদ্ধ শক্তির প্রভাবে প্রতিষ্ঠিত, জ্ঞানগঞ্জও তেমনি যোগী বিশেষের তীব্রতম যোগসাধনার প্রভাবে বিশ্বকল্যাণের মহালক্ষ্য পূর্ণ করিবার উদ্দেশয রচিত হইয়াছে। বস্তুতঃ নিত্য হইয়াও উহা নিমিত্তযোগে প্রকট হইয়াছে।

ব্রাহ্মী সৃষ্টির সহিত উহার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এই সম্বন্ধটি কি তাহার আলোচনাই দেহ কর্মের তত্ত্ব আলোচনা। এইবার সেই কথাই সংক্ষেপে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। কর্মের অসংখ্য প্রকার ভেদ আছে, তাহা এখানে আলোচ্য নহে। আমরা এখানে শুধু সাধক ও যোগীর কর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিব। যাহারা সাধক নয়, যোগীও নয়, তাহাদের কর্মে আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। জন্মমৃত্যুর অতীত হওয়া সাধকের একমাত্র লক্ষ্য। প্রাচীন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে শ্রাবকদের যে স্থান আমাদের আলোচনার ক্ষেত্রে সাধকদিগের স্থানও কতকটা তাহারই অনুরূপ। সাধক জ্ঞান প্রাপ্ত হয় এবং সেই জ্ঞানের অনলে অশুদ্ধ বাসনা দগ্ধ করিয়া মায়িক উৎপত্তির মূল বীজ দগ্ধ করিতে সমর্থ হয়। ফলে সে জন্ম মরণের অতীত কৈবল্য-স্থিতির মতন স্থিতি প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তাহার পতন হয় না ইহা ঠিক, কিন্তু সে আর উর্দ্ধে উঠিতে পারে না এবং পূর্ণ ভগবত্তার পথে অগ্রসর হইতে পারে না। সাধকের লক্ষ্যও যেমন ক্ষুদ্র, তাহার আধারও তেমনি ক্ষুদ্র। সে গুরুর তীব্র শক্তি ধারণ করিতে পারে না, তাই গুরু তাহাকে তাহার সামর্থ্যের অনুরূপ জ্ঞানই প্রদান করেন।

এই যে জ্ঞান প্রদানের কথা বলা হইল ইহার সহিত কুণ্ডলিনী শক্তির প্রবোধনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। সদ্‌গুরু সাধককে শক্তি-পাত কালে ঠিক সেই পরিমাণ শক্তি সঞ্চার করেন যাহাতে তাহার কুণ্ডলিনী শক্তি উদ্‌বুদ্ধ হইয়া উর্দ্ধগতি অবলম্বনপূর্বক অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়। যে সকল অশুদ্ধ বাসনা সাধকের অন্তর্নিহিত জ্ঞান-শক্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে সেইগুলি গুরুকৃপাতে কুন্ডলিনী জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে দগ্ধ হইয়া যায়। ইহার ফলে সাধকের অন্তরাত্মা শুদ্ধ হইয়া গুরুদত্ত চিন্ময়ী শক্তি স্বরূপ ইষ্টের আকার ধারণ করে। ইহা ক্রমশঃ ঘটিয়া থাকে। এই জন্য সাধকের দীক্ষার পর তাহার যথাবিধি নিজ কর্ম-প্রভাবে প্রবুদ্ধ কুণ্ডলিনী শক্তি বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমশঃ চৈতন্যরূপে আত্মবিস্তার করে এবং ধীরে ধীরে সমস্ত দেহ ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতিকে চিন্ময়ত্ব দান করে। অশুদ্ধ বাসনা দূর করাই চিৎশক্তির কার্য্য। এই কার্য্য সম্পন্ন হইতে হইতে ক্রমশঃ নিজের সঙ্গে অভিন্নভাবে ইষ্ট—স্বরূপ ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হইতে থাকে, কিন্তু উহা সাধকের দর্শনগোচর হয় না। কারণ অশুদ্ধ বাসনার কিঞ্চিৎ অবশেষ বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত শুদ্ধ বস্তুর সাক্ষাৎকার সম্ভবপর নহে। পক্ষান্তরে ইহাও সত্য যে অশুদ্ধ সত্তা কিঞ্চিৎ পরিমাণে না থাকিলে দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতির আত্মসত্তা রক্ষা অসম্ভব। এই শোধন-কার্য্য সম্পূর্ণ হইল মলিন বাসনা ক্ষীণ হইয়া যায়। পরে উহা একেবারে থাকে না। তখনই নির্ব্বিকল্প জ্ঞানের উদয় হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দেহপাত হয়। নির্ব্বিকল্প জ্ঞানের উদয় মানে এই যে সাধক তখন বাসনামুক্ত হইয়া নিজকে ইষ্টের সহিত অভিন্নরূপে দর্শন করে। ইহাই এক হিসাবে তাহার ইষ্ট দর্শন এবং অন্য দিক দিয়া দেখিলে ইহা তাহার আত্মদর্শন।

গুরু-কৃপাকে সহায় করিয়া সাধক নিজ শক্তির প্রভাবে সম্যক জ্ঞান লাভ করে এবং সিদ্ধবস্থায় চিদাকাশে স্থিতি প্রাপ্ত হয়। তখন সে বাসনামুক্ত চৈতন্যময় আত্মা মাত্র—তাহাতে কোন শক্তির বিকাশ থাকে না এবং তাহার কোন প্রয়োজনও নাই। কিন্তু যে সাধক এই প্রকার দেহাবস্থায় থাকিতে থাকিতে সাধনকর্ম সম্পূর্ণ করিতে না পারে তাহার পক্ষে এই প্রকার মরণান্তে চিদাকাশে স্থিতি ঘটে না। সেই সাধক অপূর্ণ নিজের কর্মকে পূর্ণ করিবার অবসর পায় না, কারণ সাধকের তো আসন নাই। বর্তমান দেহত্যাগের পর আসন-প্রাপ্তির অভাবে সাধক নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। তাহার অগ্রগতি একেবারে রুদ্ধ হয়। এই দেহ থাকিতে থাকিতে যাহার যতটা বিকাশ হইয়াছিল সে সেইখানেই নিশ্চল ভাবে অবস্থিত থাকে। প্রকৃতির স্রোতে তাহাকে অর্থাৎ তাহার তত্ত্বকে চিদাকাশের দিকে টানিয়া লইয়া যায় ইহা সত্য, কিন্তু সাধক নিজে উহা বুঝিতে পারে না।

যোগীর আধ্যাত্মিক গতি ঠিক এই প্রকার নহে। জন্ম-কাল হইতেই যোগীর আধার অধিকতর শুদ্ধ। এইজন্য সদগুরু তাহাকে যোগ-দীক্ষা প্রদান করেন। ইহার ফলে সঞ্চারিত শক্তির মাত্রা তীব্র হয় এবং অগ্রগতির পদ্ধতিও ভিন্ন হয়। আধার পরিপক্ক না হইলে তীব্রশক্তি ধারণ করা যায় না। যোগীর উপলব্ধ শক্তি শুধু যে পরিমাণে তীব্র তাহা নহে, তাহার প্রকৃতিও ভিন্ন। এই শক্তির প্রভাবে শুধু যে বাসনাদি সংস্কার দগ্ধ হয় তাহা নহে, উহা শোধিত হইয়া যোগীর সহায়করূপে তাহার নিত্য সাথী হয়। সাধকের ক্ষেত্রে ভগবদনুগ্রহে প্রতিকূল শক্তি প্রতিকূলভাব পরিত্যাগ করিয়া তটস্থ রূপ ধারণ করে, কিন্তু যোগীর ক্ষেত্রে শুধু যে শক্তির প্রতিকুলতা নিবৃত্ত হয় তাহা নহে, উহা অনুকূল শক্তিরূপে পরিণত হয়। এই অনুকূল শক্তি তখন যোগীর আত্মশক্তিরূপে প্রকাশ পায়। সাধক সাধনার পরিসমাপ্তিতে নিরাকার চিৎস্বরূপে স্থিতি লাভ করে, কিন্তু যোগী যোগক্রিয়ার মহিমায় বিশুদ্ধ সাকাররূপে বিরাজ করে। যোগী কখনই নিরাকার অথবা কায়াহীন থাকে না। সাধকের কুণ্ডলিনী জাগরণ হইতে যোগীর কুণ্ডলিনী জাগরণও অনেকাংশে পৃথক। সাধক গুরুদত্ত শক্তি মূলধনরূপে গ্রহণ করিয়া উহাকে নিজ কর্মদ্বারা সংবর্দ্ধিত করে—তাহার ফলে উক্ত শক্তিরূপ চিদগ্নি দ্বারা তাহার মলিন বাসনাদি ক্রমশঃ দগ্ধ হইয়া যায় এবং চরমাবস্থায় বাসনাদির পূর্ণ নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই সাধন-কর্ম পরিসমাপ্ত হয় এবং সাধক ইষ্ট স্বরূপে নিজকে প্রাপ্ত হয়। ইহাই তাহার সিদ্ধি—ইহা বিদেহ অবস্থা। বাসনা নিবৃত্তির আনুষঙ্গিক ফল দেহপাত। পক্ষান্তরে যোগীকে কর্মদ্বারা চিৎশক্তি হইতে চিন্ময় আকার গঠন করিতে হয় না। যোগী উচ্চ অধিকার সম্পন্ন বলিয়া দীক্ষাকালেই গুরুদহ চিদাকার প্রাপ্ত হয়। যোগীর কর্তব্য চিৎশক্তিদ্বারা আকার রচনা নহে, কিন্তু কর্মবলে গুরুদত্ত চিদাকারের সহিত সংঘর্ষ করিয়া মলিন বাসনাকে শোধনপূর্বক উহাকে অনুকূল শক্তিরূপে পরিণত করা। সর্বশক্তিসম্পন্ন এই চিন্ময় আকারকে যোগী নিজের সহিত অভিন্নরূপে বোধ করে, কিন্তু যোগী ইহাকেও অতিক্রম করিয়া উত্থিত হয়। অর্থাৎ যোগী এই চিন্ময় আকার প্রাপ্ত হইয়া উদ্‌বৃত্তরূপে ইহার সাক্ষী ও নিয়ামক হয়! এই আকার বস্তুতঃ মহাশক্তি বিশ্বজননীরই আকার বিশেষ। যোগী নিজ স্বরূপে এই আকার প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ ইহার পূর্ণত্ব সাধনে তৎপর থাকে। এই পূর্ণতার প্রাপ্তিগত মাত্রার উপরেই তাহার বিশ্বকল্যাণ সাধনের মাত্রা নির্ভর করে।

সাধক সঙ্কুচিত, কিন্তু যোগী উদার। নিজের ব্যক্তিগত দুঃখনিবৃত্তিই সাধকের লক্ষ্য, কিন্তু যোগীর লক্ষ্য শুধু নিজের দুঃখ-নিবৃত্তি নহে। কারণ যোগী পরার্থসেবক বলিয়া নিজের দুঃখ-নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে অন্যের দুঃখ-নিবৃত্তির উপায় অবলম্বন করেন। তাই যোগী ভিন্ন অন্য কেহ যথার্থ গুরু হইতে পারে না।

সাধক ও যোগীর স্বরূপ ও ক্রিয়া ভেদ সংক্ষেপে বলা হইল। কিন্তু সকল যোগীই একপ্রকার নহে। যোগীর সামান্য লক্ষণ যোগীতেই বিদ্যমান থাকে ইহা সত্য, কিন্তু লক্ষ্যগত তারতম্যও অবশ্যই থাকে। এই দৃষ্টি অনুসারে যোগীকে খণ্ড ও অখণ্ড দুই ভাগে বিভাগ করা যায় এবং খণ্ড যোগীকেও খণ্ড ও মহাখণ্ড এই দুই ভাগে বিভাগ করা চলে। এই বিভাগের ফলে খণ্ড, মহাখণ্ড ও অখণ্ড এই তিন প্রকার যোগীর তত্ত্ব আমাদের আলোচনার বিষয়। খণ্ড যোগী এমন একটি উচ্চ আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া যোগমার্গে অগ্রসর হয় যাহা চিদাকাশের উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত। যে চিদকাশ সাধকের সাধকের কর্ম-সমাপ্তি স্থান বলিয়া পরম লক্ষ্য তাহাকে ভেদ করিতে না পারিলে এই যোগীর লক্ষ্য-স্থানে উপনীত হওয়া যায় না। ইহা অতি উচ্চাবস্থা এবং জাগতিক দৃষ্টি অনুসারে পরমেশ্বরেত্ব এই ভূমিতেই প্রতিষ্ঠিত। খণ্ডযোগের লক্ষ্য কর্ম-প্রভাবে এই ভূমি প্রাপ্ত হওয়া। আমরা মহাখণ্ড ও অখণ্ড যোগের কথা পরে আলোচনা করিব। আপাততঃ খণ্ড যোগের রহস্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিতেছি।

খণ্ড যোগের লক্ষ্য যে যোগভূমি তাহা যোগ-দীক্ষা প্রাপ্ত না হইলে প্রাপ্ত হইতে পারা যায় না। কারণ দীক্ষার পর কর্মের অভিব্যক্তি আবশ্যক। দীক্ষা দ্বারা ঐ ভূমি প্রাপ্ত হইবার অধিকারবীজ হৃদয়ে নিহিত হয়, কিন্তু ঐ বীজকে অঙ্কুরিত করিয়া, বৃক্ষরূপে পরিণত করিয়া পুষ্প-ফলরূপে প্রকাশিত করা যোগ কর্মের অধীন। যোগী কর্মহীন অথবা কর্মে উদাসীন হইলে গুরু প্রদর্শিত লক্ষ্য প্রাপ্ত হইতে পারে না। দীক্ষা-কালে গুরু কৃপা অথবা অনুগ্রহশক্তি সঞ্চার করিয়া থাকেন। ঐ শক্তিকে পূরণ করিতে হয় নিজের পুরুষকার অথবা কর্মের দ্বারা। এই কর্ম কৃপা দ্বারা পরিচালিত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কর্ম কর্মই, কৃপা কৃপাই। কর্মের প্রয়োজন কৃপা দ্বারা সিদ্ধ হয় না। যদি কোন খণ্ড যোগী গুরু অর্থাৎ সদ্‌গুরু কর্তৃক দীক্ষিত হইয়া তাঁহার কৃপা-শক্তি প্রাপ্ত হয় অথচ নিজে অনুরূপ কর্ম না করে তাহা হইলে তাহাকে নিতান্তই দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। কারণ গুরু যে মহালক্ষ্য তাহার সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছেন তাহাকে আয়ত্ত করিবার পূর্ণ অধিকার গুরু হইতে প্রাপ্ত হইয়াও যে কর্মগত অলসতাবশতঃ লক্ষ্য প্রাপ্ত হইতে পারে না। জীবনের কাল পরিমিত। এই পরিমিত সময়ের মধ্যে কর্ম সমাধা করা আবশ্যক। কারণ দেহত্যাগের পর বিদেহ অবস্থায় কর্ম-দেহের সহিত যোগ না থাকার দরুণ কর্ম্ম করিবার অবসর পাওয়া যাইবে না এবং যোগপথের অগ্রগতি স্তম্ভিত হইয়া পড়িবে। এই রক্ত মাংসের দেহ থাকিতে থাকিতে কর্ম সমাপ্ত হওয়া আবশ্যক। নতুবা লক্ষ্য-প্রাপ্তির আশা একপ্রকার সুদূর-পরাহত। মরদেহে কর্ম করিতে পারিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কর্ম সমাপ্ত হইয়া যায়। কর্ম্ম সমাপ্ত না

করিয়া স্রোতে ভাসিয়া লক্ষ্য ভূমিতে যাইয়া পৌঁছিলেও তাহার বিশেষ মূল্য নাই। কারণ তখন কমলের বিন্দুতে স্থান লাভ হয় না, দলে আপন যোগ্যতানুসারে স্থান প্রাপ্তি হয়। কিন্তু সাধারণতঃ দলে বসিবার অধিকার হওয়াও কঠিন। দলের বাহিরে জ্যোতির মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে হয়।

কিন্তু যোগী গুরু শিষ্যকে যোগদীক্ষা দিবার পর তাহাকে আশ্রয়স্বরূপ আসন দান করিয়া থাকেন। এই আসন দান একটি রহস্যময় ব্যাপার। আসন দিলেই বুঝিতে হইবে তাহাকে নিরন্তর কর্ম করিবার অবসর দেওয়া হইল। কিন্তু আসন বিস্তার করা হয় ভূমির উপর। তাই গুরুকে আসন দানের সঙ্গে সঙ্গে আসন বিছাইবার জন্য ভূমিও দান করিতে হয়। কিন্তু এই ভূমি কোথায়? যোগী শিষ্য যখন আসনপ্রাপ্ত হইয়াছে তখন বুঝিতে হইবে যে দেহত্যাগের পরেও তাহার আত্মিক সত্তা নিরালম্ব অবস্থায় উড্ডীনভাবে বিদ্যমান থাকিবে না। উহা ভূমিতে বসিবার অবসর প্রাপ্ত হইবে। এই ভূমিতে নিজ নিজ আসনে উপবিষ্ট হইয়া তাহাকে কর্ম করিতে হইবে। এই কর্ম অতি দীর্ঘকাল-সাধ্য, কারণ ইহা মর-দেহের কর্ম নহে। কিন্তু মরদেহ না হইলেও ইহাও কর্ম-দেহ যদিও এই কর্ম দেহে ক্ষিপ্রবেগে কর্ম সিদ্ধ হয় না। যোগী শিষ্য মৃত্যুর পর অবশিষ্ট কর্ম সম্পাদন করিবার জন্য যে বিশুদ্ধ ব্যাপক ভূ-খণ্ড প্রাপ্ত হয় তাহাকে গুরুধাম বলা হইয়া থাকে। ঐ স্থানে প্রতি যোগী আপনাপন আসনে আসীন হইয়া কর্মে নিরত রহিয়াছে। সুদীর্ঘকাল ঐ কর্মের প্রভাবে যোগীর যোগ-চক্ষু উন্মীলিত হয়। বস্তুতঃ তখনই যোগীর প্রকৃত যোগ পথ খুলিয়া যায়। ঐ পথে চলিবার সময় গুরুধামের কায়াও আর থাকে না। তখন দৃষ্টিময় দিব্য স্বরূপে মধ্যরেখা অবলম্বনপূর্বক ক্রমশঃ চলিতে চলিতে চিদাকাশ ভেদ করিয়া লক্ষ্যস্থানে উপনীত হয়। লক্ষ্যস্থান বলিতে এখানে কমলের কোন না কোন একটি দল বুঝিতে হইবে—কর্ণিকা নহে। কমলের কর্ণিকাতে যাইবার অধিকার একমাত্র তাহারই আছে যে মরদেহে থাকিয়া সমস্ত কর্ম সমাপ্ত করিতে সমর্থ হয়। সর্বত্রই মরদেহের কর্মের পূর্ণ প্রভাব না থাকিলে কমলের কর্ণিকাতে বসিবার যোগ্যতা লাভ হয় না। কর্ণিকাতে বসা মানেই অঙ্গিরূপে বা অঙ্গরূপে চক্রের অধিষ্ঠাতা হওয়া অর্থাৎ সমগ্র রাজ্যের অধিকারী হওয়া কিম্বা রাজার ন্যায় সিংহাসনে উপবেশন করা। দলে বসা মানে সাধারণ প্রজার ন্যায় বিন্দুর অধীনতা স্বীকারপূর্বক প্রজারূপে নিজের স্থান প্রাপ্ত হওয়া। উভয়ে অনেক পার্থক্য আছে।

সুতরাং পুর্বোক্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, প্রকৃত যোগ-দীক্ষা প্রাপ্ত হইলে মৃত্যুর পরে গুরুস্থানে গতি হয় এবং সেখানে পূর্ব নির্দিষ্ট নিজস্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়। সিদ্ধভূমি অধিকাংশ স্থলে এই গুরুস্থানের অন্তর্গত। অবশ্য ইহার বাহিরেও যে

সিদ্ধভূমি না আছে তাহা নহে। গুরুধাম হইতে যে গতি লাভ হয়, যাহা খণ্ড যোগীকে লক্ষ্য পর্য্যন্ত সঞ্চালন করিয়া লইয়া যায়, তাহাতে দেহভেদ সিদ্ধ হয় না এবং প্রকৃত মধ্য রেখাও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কথাটি অত্যন্ত দুরূহ, কিন্তু বুঝিতে না পারিলে বক্তব্যের অভিপ্রায় পরিস্ফুট হইবে না। স্বয়ং বিশ্বজননী কোন না কোন রূপ ধরিয়া উন্মীলিত যোগচক্ষু যোগীর নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ সাধক তো প্রাপ্ত হয়ই না, খণ্ড যোগীও প্রাপ্ত হইতে পারে না। খণ্ড যোগী আভাসমাত্র লাভ করে। তবে এই আভাসেরও তারতম্য আছে। যোগ-চক্ষু উন্মীলনের পরেই বিশ্ব-জননীর যে রূপ ও রাজ্য প্রকাশিত হয় তাহা সর্ব নিম্নস্তরের। ঐ রাজ্যে সাধকও আসিতে পারে এবং আসিয়াও থাকে, কিন্তু সে মায়ের স্বরূপ দর্শন পায় না। দুর্বল খণ্ড যোগী স্বরূপ দর্শন পায় বটে, কিন্তু সেইখানেই বিশ্রামলাভ করে। তাহার অগ্রগতি সেইখানেই রুদ্ধ হইয়া যায়। তাহার পরে যে রাজ্যটি আছে সেটিও বিশ্বজননীরই রাজ্য। সেখানেও কমলের দলে বিশ্বজননীরই আসন, কিন্তু ঐটি মধ্যম খণ্ড যোগীর আদর্শ। তিনি উহার দর্শন পান এবং ঐখানেই থাকিয়া যান। সাধকের উহাই চরম লক্ষ্য, কিন্তু সাধকের স্থিতি এবং যোগীর স্থিতি একই স্থানে বিভিন্ন হইয়া থাকে। খণ্ড যোগীর মধ্যে যিনি উত্তম তাঁহার আদর্শ চিদাকাশের উর্দ্ধে, যাহারা কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। মরদেহে কর্মের সমাপ্তি না হইলে কেন্দ্রে যাইয়া মাতৃ-অঙ্কে উপবেশন করা যায় না।

বিশ্বজননীর এই যে তিনটি রূপের কথা বলিলাম এই তিনটিই তাঁহার স্বরূপের ছায়া, অনুছায়া এবং প্রতিচ্ছায়া—কোনটিই প্রকৃত স্বরূপ নহে। কিন্তু যে খণ্ড যোগী অথচ পূর্ণ কর্মী সে ছায়াটি প্রাপ্ত হয়, অবশ্য মরদেহে কর্ম সমাপ্ত হইলে। কারণ রক্তহীন দেহে কর্মের সেই পরিমাণ সংবেগ উৎপন্ন হয় না যাহাতে মধ্য বিন্দুতে প্রবিষ্ট হওয়া সম্ভবপর হয়। যোগীর এই যোগভূমিতে ঐশ্বর্য্য অতুলনীয় ভাবেই প্রকাশিত হয়, কিন্তু মহাজ্ঞান আসে না। কারণ খণ্ড যোগের চরম উৎকর্ষের অবস্থাতেও মহাজ্ঞান উদিত হয় না।

মহাজ্ঞান সেই রাস্তায় প্রকাশিত হয় যাহা নিজ কায়া ভেদ করার পর উন্মুখ শুদ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করে। এই পথের যাত্রী দুর্লভ. কারণ যে সকল যাত্রী খণ্ডযোগের পথে চলে তাহারা ঠিক ঠিক এই পথ চেনে না এবং এই পথের সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত বিশ্বজননীর স্বরূপ দর্শনের আশা অলীক কল্পনামাত্র। প্রত্যেক পথেই আদি রিন্দু হইতে অন্তিম বিন্দুরূপে চিদাকাশের উর্দ্ধস্থ মহাভূমি লক্ষিত হয়, তাহার পরে অথবা বাহিরে আর যে কিছু আছে বা থাকিতে পারে তাহা ধারণাতে আসে

না। কিন্তু মহাখণ্ডযোগীর দৃষ্টিতে যে পথটি ভাসে তাহা পুর্বোক্ত পথ হইতে ভিন্ন। কারণ এই পথের অন্তিম কোটিতে বিশ্বজননীর প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। এই দৃশ্য খণ্ডযোগীর পরম আদর্শেরও উর্দ্ধস্থিত, ও তাহার দৃষ্টির অগম্য। তাহার লক্ষ্য বিশ্বজননীর স্বরূপ হইলেও বস্তুতঃ উহা এই মহাস্বরূপেরই প্রথম ছায়ামাত্র। ইহার যেটি ছায়া বা অনুছায়া তাহাই সাধকের সিদ্ধ অবস্থার লক্ষ্য। দ্বিতীয় ছায়ার যেটি প্রতিচ্ছায়া সেইটি নিম্নস্তরের খণ্ডযোগীর লক্ষ্য। তাহা হইতে যে রশ্মি নির্গত হইয়াছে তাহাই অখণ্ডভাবে প্রসারিত হইয়া সমগ্র সাধককুলের ধ্যেয়রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে।

অধ্যাত্ম মার্গে কৃপা ও কর্মের পরস্পর সম্বন্ধ বিশেষরূপে অনুধাবনের যোগ্য! সাধকের জীবনে কৃপার স্থান প্রধান এবং কর্মের স্থান গৌণ। বস্তুতঃ সাধকের প্রকৃত কর্ম একপ্রকার নাই বলিলেও চলে। যাহা কর্মরূপে প্রতীত হয় তাহা কর্মের আভাসমাত্র। পক্ষান্তরে যোগীর যোগ পথে কর্মই প্রধান—অবশ্য কৃপা সর্বত্রই আছে, কিন্তু কৃপা অপেক্ষা কর্মেরই মহিমা অধিক। ইহার মধ্যেও খণ্ড ও মহাখণ্ডযোগে কর্মের প্রাধান্য ও উৎকর্ষ থাকিলেও আপেক্ষিক দৃষ্টিতে কৃপাই প্রধান। কিন্তু অখণ্ডযোগে কৃপা গৌণ, এমন কি স্থূলতঃ লুপ্তপ্রায়, কিন্তু কর্মই আপন প্রাধান্য লইয়া খণ্ড কৃপাকে অভিভূত রাখিয়া আত্মপ্রকাশ করে। কর্ম এইভাবে স্বপ্রতিষ্ঠিত হইলে পূর্ণ পুরুষকার প্রকটিত হয় এবং মহাকৃপা আত্মপ্রকাশ করে। মহাকৃপাও পরম পুরুষকার অভিন্নরূপে একই ক্ষণে ফুটিয়া উঠে।

খণ্ডযোগী যেমন দীক্ষাকালে আসন প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ মহাখণ্ড যোগীও আসন প্রাপ্ত হয়। তবে ইহা উচ্চতর আসন। খণ্ডযোগী স্বকর্ম অসমাপ্ত রাখিয়া দেহত্যাগ করিলে দেহান্তে একটি ভুবন প্রাপ্ত হয় যেখানে স্থিত হইয়া নিজ নিজ আসনে কর্ম করিবার অধিকার জন্মে এবং কর্ম-সমাপ্তির পর নেত্র উন্মীলিত হইলে দিব্য দৃষ্টি উন্মীলিত হইয়া যায় ও উহাকে অবলম্বন করিয়া চিদাকাশের উর্দ্ধস্থ ভূমি পর্যন্ত অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর হয়। মহাখণ্ড যোগী উচ্চতর লোক হইতে সমাগত। তিনি উর্দ্ধতর ভূমির সন্ধান পান এবং তাহার অনুসরণ করিয়া চলিতে চলিতে যথা সময়ে উক্ত ভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। খণ্ডযোগীর লক্ষ্য হইতে মহাখণ্ড যোগীর লক্ষ্য বিশাল। খণ্ড যোগীর চরম লক্ষ্যের পর হইতে মহাখণ্ড যোগীর চরম লক্ষ্য পর্যন্ত যে মার্গ দৃষ্ট হয় তাহা এক প্রকার অভিনব আবিষ্কার। আপাতদৃষ্টিতে ইহাকে বিশ্বের কেন্দ্র বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। অখণ্ডযোগে এই বিশ্বের সহিত বিশ্বাতীত মহাসত্তার যোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু সে প্রসঙ্গ এই স্থানে উত্থাপিত করা সঙ্গত নহে।

মহাখণ্ড যোগী দীক্ষার পর পরম প্রকৃতির স্নেহময় উৎসঙ্গে উপবেশন করিবার অধিকার জন্মে। অবশ্য ইহা কর্ম সাপেক্ষ কিন্তু যে যোগী মরদেহে কর্ম সমাপ্ত করিবার পূর্বে দেহত্যাগ করে সে খণ্ডযোগীর ন্যায় এমন একটি আসন প্রাপ্ত হয় যাহাকে আশ্রয় করিয়া সে প্রকৃতির উর্দ্ধদেশে একটি সিদ্ধস্থান লাভ করে, যেখানে নিজ আসন বিছাইয়া অবশিষ্ট কর্ম পূর্ণ করিতে সমর্থ হয়। এই সিদ্ধ স্থানটি তিব্বতীয় যুক্ত যোগিগণের পরিভাষাতে 'জ্ঞানগঞ্জ' নামে প্রসিদ্ধ। এই জ্ঞানগঞ্জ সিদ্ধ ভূমি এবং পূর্ব-বর্ণিত গুরুধামও সিদ্ধ ভূমি, কিন্তু উভয়ে ভেদ আছে। গুরুধামে অপূর্ণ খণ্ড যোগী কর্ম পূর্ণ করিবার জন্য স্থান প্রাপ্ত হয়—এই স্থানই তাহার গুরুদত্ত আসন। তদ্রূপ জ্ঞানগঞ্জে অপূর্ণ মহাখণ্ডযোগী আরব্ধ কর্ম পূর্ণ করিবার জন্য স্থান প্রাপ্ত হয়—ইহাই তাহার আসন-প্রাপ্তি। বস্তুতঃ দীক্ষাকালেই এই আসন অথবা উপবেশন-স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়, যদিও ইহা দীক্ষাকালে দীক্ষার্থী অথবা দীক্ষিতের নেত্রগোচর হয় না।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যোগীর সাধন-জীবনে কর্মই প্রধান, সুতরাং এই জীবনে গুরু হইতে যে কৃপা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা সম্যক্ প্রকারে শোধ করিয়া ফেলিতে হয়। কৃপায় নিজ শক্তির বিকাশ স্থগিত থাকে, অথচ সাধনের প্রাথমিক অবস্থায় কৃপা ব্যতীত এক পদও অগ্রসর হওয়ার উপায় নাই। এই জন্য যোগীর পক্ষে নিয়ম এই যে গুরু হইতে কৃপা গ্রহণ করিয়া পরে উহা স্ব-কর্ম দ্বারা গুরুকে শোধ করিতে হয়। গুরুদত্ত কৃপা ঋণরূপে গ্রহণ করিয়া নিজের অর্জিত কর্ম দ্বারা উহাকে মিটাইয়া ফেলিতে হয়। তখন ভবিষ্যৎ কর্মের পথ সুপ্রশস্ত হয়, তাহার পূর্বে নহে। গুরুর প্রধান কাজ শিষ্যকে কালের রাজ্য হইতে উদ্ধার করা। সাধনমার্গে ইহা সম্পন্ন হয়, যোগ-মার্গেও হয়। কিন্তু সাধন-মার্গে শুধু কালের উত্তাল তরঙ্গ হইতে শিষ্যকে উদ্ধার করিয়াই গুরুর করুণা নিবৃত্ত হয়, তাহাকে কালাতীত কোন উচ্চপদে অভিষিক্ত করিতে পারে না। যোগ-পথে কর্মের প্রাধান্য থাকে বলিয়া কালাতীত রাজ্যে যোগী বিশিষ্ট অধিকার সম্পন্ন স্থান প্রাপ্ত হয়। খণ্ডযোগীর অধিকার হইতে মহাখণ্ড যোগীর অধিকার শ্রেষ্ঠ, এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকার অখণ্ড যোগীর—যাহা এখনও জগতে প্রকাশিত হয় নাই। অখণ্ড যোগীর মহান্ অধিকারই সমগ্র বিশ্বকে সর্বপ্রকার অভাব হইতে মুক্ত করিয়া পূর্ণ আনন্দ ও ঐশ্বর্য্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ।

সাধকের কর্মের সমাপ্তি আছে, কিন্তু যোগীর কর্মের সমাপ্তি নাই। যোগী পূর্ণত্ব লাভ করিয়াও ক্রিয়াহীন হইয়া বসিয়া থাকে না। তাহার স্বভাবসিদ্ধ কর্ম চিরদিনই চলিতে থাকে এবং ইহা নিবৃত্ত কখনও হয় না এবং হইতেও পারে না। তাই পূর্ণতা লাভের পরেও পূর্ণকে পূর্ণতর, পূর্ণতম প্রভৃতি ক্রমে অনন্ত অবস্থার ভিতর দিয়া

উৎকর্ষণ করা, ইহাই যোগীর কর্মের স্বাভাবিক পরিণতি। শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার বিশ্ব সমস্যা (The Riddle of the World) নামক গ্রন্থে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন যে আপাত দৃষ্টিতে অজ্ঞান সম্যক্ প্রকারে নিরত না হওয়া পর্যন্ত কর্মের ধারা অথবা ক্রমবিকাশ অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ভগবৎ-স্বরূপে প্রবিষ্ট হইয়াও অনন্ত অগ্রগতির সম্ভাবনা রহিয়াছে। তাঁহার এই বাক্য অত্যন্ত সত্য। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সত্য যে এই অনন্ত অগ্রগতি অখণ্ড স্থিতির মধ্যেই ঘটিয়া থাকে। স্থিতি লাভ না করিলে অনন্ত কর্মের কোন অর্থই হয় না—তখন স্থিতিই হয় কর্মের লক্ষ্য। কিন্তু স্থিতির পরেও যদি কর্ম রাখিতে পারা যায় তবে উহাই হয় দিব্য কর্ম, যাহার অন্ত কখনই হইতে পারে না।

জ্ঞানগঞ্জের যোগ-দৃষ্টি অনুসারে তিনটি যোগ ক্ষেত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথম ক্ষেত্রটিতে মহাভাব পর্যন্ত লক্ষ্য রূপে পাওয়া যায়। এই ক্ষেত্রের ভূমিটি হয় গুরুধাম। খণ্ডযোগী কর্ম পূর্ণ করিতে পারিলে এই লক্ষ্য প্রাপ্ত হয়, পূর্ণ না করিতে পারিলে যে অবস্থায় স্থূল দেহের ত্যাগ হয় সেই অবস্থায় অনরূপ স্থিতি প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। স্থূল দেহ ত্যাগের পর ক্ষিপ্রগতিতে কর্ম চলে না, মন্দ মন্দ ভাবে চলে। দ্বিতীয় যোগ-ক্ষেত্রটি পূর্বাপেক্ষা অধিক ব্যাপক ইহার লক্ষ্য স্থান মহাভাবের অতীত, এমন কি সূর্য্য-মণ্ডলের উর্দ্ধস্থ। ইহা পরম-প্রকৃতির স্বরূপ-প্রকাশ। ইহার ভূমিটিই জ্ঞানগঞ্জ। মহাখণ্ড-যোগ-ক্রিয়ার অবসানে এই লক্ষ্য খুলিয়া যায়। পূর্বের ন্যায় এই স্থলেও স্থূল দেহে কর্ম সমাপ্ত করিতে পারিলে লক্ষ্যের সন্নিহিত হওয়া সহজ সাধ্য, কিন্তু কর্ম অসম্পূর্ণ রাখিয়া দেহ ত্যাগ করিলে জ্ঞানগঞ্জ হইতে কর্মের গতি চলিতে থাকে। পূর্বের ন্যায় এই গতিও অপেক্ষাকৃত মন্দ, স্থূল দেহের কর্মের ন্যায় ক্ষিপ্র নহে।

তৃতীয় যোগ-ক্ষেত্রটি এখনও অঙ্কনের মধ্যেই পরিসমাপ্ত রহিয়াছে। ইহার ভূমি ও লক্ষ্য বিশ্বগুরু। কালরাজ্য বাহিরে নাই বলিয়া তখন ভূমি ও লক্ষ্য প্রাপ্তিতে কালের কোন ব্যবধান নাই। ইহার ক্ষেত্র অখণ্ড বিশ্ব। এই স্থলেও স্থূল দেহে কর্মের পূর্ণতা ব্যতীত ভূমিও লক্ষ্যপ্রাপ্তি অসম্ভব।

তিনটি ক্ষেত্রই কর্মস্থান। প্রথমটির পরিধি অতি বিশালা। কালের রাজ্য এই পরিধির বাহিরে অবস্থিত। দ্বিতীয়টির পরিধি প্রথমটি আপেক্ষাও অনেক অধিক বিশাল, ইহার ফলে কালের রাজ্য অনেকটা সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে। তৃতীয়টির পরিধি সমগ্র বিশ্ব বা সৃষ্ট জগৎ। এই স্থলে কালের রাজ্য শূন্য রূপে পরিণত হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে তিনটি যোগক্ষেত্র কর্মের তীব্রতা ক্রমশঃই অধিক।

সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিতে না পারিলে তৃতীয় ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও প্রতীত হইবে যে গুরুর করুণা-শক্তির মাত্রা ক্ষেত্র হইতে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রবল এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্র হইতে তৃতীয় ক্ষেত্রে আরও অধিক প্রবল। বস্তুতঃ ইহারই নামান্তর মহাকরুণা। শুধু তাহাই নহে, কৃপার ক্ষেত্রও ক্রমশঃ অধিক প্রসারিত হইতে হইতে তৃতীয় ভূমিতে বিশ্ব-ব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে।

কৃপা ও কর্ম উভয়ই মূলতঃ একই শক্তি। একই অখণ্ড সত্তা অবিভক্ত থাকিয়াও নিজেকে লীলাচ্ছলে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া থাকে। এই ভাবে একদিকে অণু এবং অপর দিকে মহান্, একদিকে বৃহৎ এবং অপর দিকে ক্ষুদ্র, এই প্রকার দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবের উদয় হইয়া থাকে। অণুকে মহানের নিকট যাইতে হইলে কর্ম অবলম্বন করিতে হয়। অণুতে যে শক্তি নিহিত রহিয়াছে তাহাই কর্ম রূপ অভিব্যক্ত হইয়া অণুর অগ্রগতির সহায়তা করে। কিন্তু শুধু কর্মশক্তির দ্বারা অণুর পক্ষে মহান্‌কে প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবপর নহে। মহানের কৃপাশক্তিও অণুর সহকারী হওয়া আবশ্যক। অতএব মহানের কৃপা-সহকৃত অণুর কর্মশক্তি একটি প্রধান উপায়। এই প্রকার কৃপাশক্তির প্রাধান্য স্থলেও বুঝিতে হইবে। মহানের কৃপা উদ্রিক্ত হইলেই যে অণু মহান্‌কে প্রাপ্ত হইবে অথবা মহান অণুকে প্রাপ্ত হইবে তাহা বলা যায় না। কৃপার সহকারিরূপে অণুর কর্মশক্তি অভিব্যক্তি ও প্রযুক্ত হওয়া আবশ্যক। এই প্রকার উভয়শক্তির পরস্পর সংমিশ্রণে অণু ও মহানের যোগ সিদ্ধ হয়। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে কর্ম-সাপেক্ষ কৃপা ও কৃপা সাপেক্ষ কর্ম উভয়ই আবশ্যক। অণুর প্রকৃতি ভেদে সাপেক্ষতার তারতম্য ঘটিয়া থাকে। মনে রাখিতে হইবে নিরপেক্ষ শক্তির ক্রিয়াও ক্ষেত্রবিশেষে সম্ভবপর। ঐস্থলে উহা পূর্ণ শক্তিরই দ্যোতক, কারণ অপূর্ণ শক্তি নিরপেক্ষ হইতে পারে না। এই পূর্ণ শক্তি যদি কৃপারূপে প্রকট হয় তাহা হইলে ঐকৃপা ধারণের উপযোগী অণুনিষ্ঠ কর্ম শক্তিও উহা হইতেই প্রকট হইবে। পক্ষান্তরে এই পূর্ণশক্তি যদি অণুর কর্ম শক্তিরূপে প্রকট হয় তাহা হইলে ঐ কর্ম-শক্তির সহকারীস্বরূপে কৃপা-শক্তিকে উহা স্বয়ংই মহাকৃপা রূপে অভিব্যক্ত করিয়া তুলে। ফলে স্বরূপে অবস্থান ও আত্মৈশ্বর্য্যের বিকাশ যথাবৎ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু ইহার মধ্যে একটি গভীর সমস্যা বিচরণীয় রহিয়াছে। কৃপার প্রাধান্যে মিলনও অদ্বৈতস্থিত ঐশ্বরিক শক্তিকে আশ্রয় করিয়া হইয়া থাকে অর্থাৎ যেমন যেমন ঐশ্বরিক কৃপা বর্দ্ধিত হয় তেমনি তেমনি আত্মা কর্মানুরূপ উর্দ্ধগতি লাভ করে ও গতির অবসানে পরমাত্মা-স্বরূপে একত্ব লাভ করে। যদি কর্মের প্রাধান্য স্বীকৃত হয় তাহা হইলে ঐ কর্মের প্রভাবে অনুরূপে অনুগ্রহ শক্তির বিকাশে ঈশ্বর সত্তা ক্রমশঃ সন্নিহিত হইতে

থাকে এবং অন্তিম অবস্থায় ঈশ্বরভূত যোগীর স্বরূপে আত্মসমর্পণ করেন। এই দুইটিই অদ্বৈত স্থিতি। কিন্তু উভয়ে পার্থক্য আছে। প্রথম অবস্থায় 'আমি' 'তুমি' রূপে পরিণত হইয়া অদ্বৈত ভাব গ্রহণ করে। তখন, অবশ্য তুমি আমি একই হইয়া যায়। দ্বিতীয় পরিস্থিতিতে তুমি আমিতে পরিণত হয়, তাহার পর অবশ্য সেই মূল স্থিতিতে প্রবেশ হয়। কিন্তু আর একটি স্থিতি আছে। তখন আমিকে তুমির কাছে যাইতে হয় না এবং তুমিকেও আমির কাছে আসিতে হয় না। তখন আমি নিজের মধ্যেই তুমিকে খুঁজিয়া পায় তুমি খুঁজিতে বাহিরে যাইতে হয় না। তদ্রূপ তুমিও নিজের মধ্যে আমিকে খুঁজিয়া পায়, আমির জন্য তুমিকেও বাহিরে আসিতে হয় না। উভয়ের মধ্যেই আশ্রয়তত্ত্ব ও বিষয়তত্ত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে যে আশ্রয় সেই বিষয় এবং যে বিষয় সেই আশ্রয়। সুতরাং একের অভাব অপরের অভাব একের প্রাপ্তি অপরের প্রাপ্তি—উভয়ে কোন ভেদ নাই। এই দুই-এর সমীকরণ হইলে পরম পরিপূর্ণ সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়। তখন আশ্রয় ও বিষয়ের সাম্য অভিব্যক্ত হয়।

তিনটি যোগ-ক্ষেত্রই কালের অতীত। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রের বাহিরে কালের রাজ্য বিদ্যমান। তৃতীয় ক্ষেত্র অভিব্যক্ত হইলে কালের রাজ্য পৃথক্‌ভাবে আর থাকিবে না। প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষেত্র কালের রাজ্যের সমসূত্রে থাকিলেও ঐ দুইটি রাজ্যের মধ্যে কালের প্রভুত্ব নাই। কিন্তু প্রভুত্ব না থাকিলেও কিঞ্চিৎ প্রভাব বিদ্যমান আছে। প্রতি ক্ষেত্রেই বিভিন্ন স্তর আছে। নিম্নবর্ত্তী স্তরে কালের কিঞ্চিৎ প্রভাব লক্ষিত হইলেও উর্দ্ধ স্তরে তাহা অত্যন্ত হ্রাস প্রাপ্ত হয়। অবশ্য অতি সূক্ষ্মভাবে তাহা থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই। তৃতীয় ক্ষেত্রে বাহিরে-কালের রাজ্য না থাকিলেও অন্তঃপ্রবিষ্টভাবে ঐ ক্ষেত্রের মধ্যে কালের শক্তি ক্রিয়া করিয়া থাকে। পরিপূর্ণ অবস্থা প্রাপ্তির জন্য ইহা আবশ্যক। ইহা ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইবে।

কালের ধর্ম জরা এবং মৃত্যু। দেহের ক্রমিক বিকাশ, যাহার ফলে সদ্যোজাত শিশু-দেহ বৃদ্ধ শরীরে পরিণত হয়, উহাও জরা। কালের প্রভাব বশতঃই ইহা ঘটিয়া থাকে। কালের জগতে জরা হইতে কেহ মুক্ত হইতে পারে না। কালের দ্বিতীয় ধর্ম মৃত্যু। কালের জগতে ইহাও সর্বত্র দৃষ্ট হয়। এই জন্য কালের জগৎকে মরলোক অথবা মৃত্যু লোক বলিয়া অভিহিত করা হয়। সুতরাং কালের রাজ্যের উর্দ্ধে কোন রাজ্য স্থাপিত হইলে তাহা হইতে কালের এই দুইটি ধর্ম স্বভাবতই বর্জ্জিত হইবার কথা। এই ছাড়া, ক্ষুধা ও পিপাসা ইহাও কাল-রাজ্যের আনুষঙ্গিক ধর্ম। সুতরাং ক্রমশঃ শুদ্ধ জগতে এই দুইটি ধর্ম তিরোহিত হইয়া যায়। কালের রাজ্যের আর একটি আনুষঙ্গিক ধর্ম কাম-বৃত্তির প্রভুত্ব এবং তদাশ্রিত ও তন্মুল অন্যান্য মানসিক বৃত্তির ক্রিয়া। শুদ্ধ রাজ্যে সম্বন্ধেও বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়।

মর্তলোকের উর্দ্ধে নানা প্রকার স্বর্গীয় ভুবনাবলী ও তদনুরূপ ভোগপ্রধান দিব্য স্থান আছে। এইজন্য এই সকল স্থানে কামের অভাব নাই এবং ভোগেরও নিবৃত্তি নাই। তবে ওখানে কালের বেগ ভূলোক হইতে অন্য প্রকার বলিয়া জরার অনুভব হয় না এবং কালে দেহের পতন ঘটে। ঐ সকল স্থান কর্ম-ভূমি নহে। উহারা ভোগভূমি এবং যোগীর পক্ষে সর্বথা হেয়। পূর্বে যে যোগক্ষেত্রের বর্ণনা করা হইয়াছে উহারা অত্যন্ত বিশুদ্ধ এবং কর্ম-ভূমি বলিয়া ঐ সব স্থানে ভোগের আধিপত্য নাই, যদিও কালের প্রভাব অনুভূত হয়। কিন্তু উর্দ্ধ স্তরে তাহা হয় না। তবে কালের কিঞ্চিৎ প্রভাব থাকে বলিয়াই নিম্ন স্তর মৃত্যু-বর্জিত হইলেও আপেক্ষিক মৃত্যু-বর্জিত নহে, এইগুলি ঠিক তাহার বিপরীত। মৃত্যু-বর্জিত হইয়াও জরা-বর্জিত নহে। উর্দ্ধ স্তরে মৃত্যু তো নাই, জরাও নাই। নিম্ন স্তরে জরা থাকে বলিয়াই সেখানকার যোগী ঋষিগণ সহস্র সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন এবং জরাজীর্ণ দেহে কর্ম পূর্ণ করিতে নিরন্তর উদ্যত থাকেন। এই কর্মের ফলেই তাঁহারা নিম্ন স্তর হইতে উর্দ্ধ স্তরে উন্নীত হন। তখন তাহাদের স্থবির জীর্ণ দেহ কিশোর অথবা তরুণ দিব্য লাবণ্যময় শ্রী-বিগ্রহ রূপে পরিণত হয়। গুরুধাম এবং জ্ঞানগঞ্জ উভয় স্থানেই এই বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়।

জ্ঞানগঞ্জ পূর্বে কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। তাহা হইতেই জ্ঞানগঞ্জের তত্ত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। জ্ঞানগঞ্জ এক প্রকার অভিনব আবিষ্কার বলা চলে অথচ অনাদি কাল হইতেই ইহা বিদ্যমান রহিয়াছে—প্রথমে অব্যক্ত রূপে, তাহার পর অভিব্যক্ত ও পুষ্টরূপে আমরা পূর্বে পর পর তিনটি যোগ-ভূমির কথা বলিয়াছি—এগুলি যোগীর উপলব্ধি-গোচর এবং প্রাপ্য মায়াতীত ও কালাতীত রাজ্য। এই তিনটির মধ্যে প্রথমটিকে আমরা গুরুধাম অথবা গুরুরাজ্য বলিয়া নামকরণ করিয়াছি—দ্বিতীয়টিকে জ্ঞানগঞ্জ বলিয়াছি এবং তৃতীয়টির কোন নাম নির্দেশ করি নাই, কারণ উহা এখন অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্ত অবস্থায় ফুটিয়া উঠে নাই। প্রথম যোগ-ভূমিরূপ গুরুরাজ্যটি আগম শাস্ত্রে বিশুদ্ধ, অধ্বা নামে সাঙ্কেতিক ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সাধারণতঃ প্রচলিত সাধন-প্রণালীতে উহার স্পষ্ট সন্ধান পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু গুহ্য সাধন সংক্রান্ত আগম সাহিত্যে উহার অতি স্পষ্ট নির্দেশ আছে।

আমরা শুষ্কজ্ঞান ও দিব্যজ্ঞানের আলোচনা করিলে এই উভয় জ্ঞানের মধ্যে ভেদ দর্শন করিতে পারি। শুষ্কজ্ঞানের সন্ধান সর্বত্রই পাওয়া যায়; কিন্তু উহা দ্বারা পূর্ববর্ণিত গুরুরাজ্যে প্রবেশ করা যায় না, জ্ঞানগঞ্জ প্রভৃতিতে প্রবেশ তো বহু দূরের কথা।

দিব্যজ্ঞানের আশ্রয় ব্যতীত গুরুরাজ্যের দ্বার উন্মুক্ত হয় না। প্রাচীন গুহ্য শাস্ত্রে এই পর্য্যন্ত স্পষ্টভাবে নির্দেশ করা ছিল। এই গুরুরাজ্য সৃষ্টির অবতরণ মুখে লক্ষিত হয় না। কারণ আত্মা অণুরূপে সঙ্কুচিত হইয়াই সাক্ষাৎভাবে ঈশ্বর প্রেরণায় মায়া-গর্ভে পতিত হয় এবং কর্মজালে জড়িত হইয়া পড়ে। তদনন্তর তাহার ভোগ-প্রধান সংসার জীবন আরম্ভ হয়। গুরুরাজ্যের অস্তিত্ব অবতরণশীল চিদণুর দৃষ্টিগোচর হয় না। পক্ষান্তরে ফিরিবার সময় উচ্চ অধিকার সম্পন্ন হইলে গুরুরাজ্যে প্রবেশ হয় এবং ভাগ্য থাকিলে উহার ভেদও হয়। যে সকল আত্মাতে কুণ্ডলিনী শক্তি কম জাগ্রৎ হয় তাহারাও গুরুকৃপার অংশীদার তাহা সত্য, কিন্তু এই গুরু-কৃপা প্রত্যগাত্মার কৃপাত্মক পুরুষকার রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। ইহার ফলে বিবেকজ্ঞানের উদয় হয়, যাহার প্রভাবে অনাত্মাতে আত্মদৃষ্টিরূপ ভ্রান্তি নিবৃত্ত হয় ও আত্মস্বরূপ অনাত্মভাব হইতে মুক্ত হইয়া চিদরূপে প্রকাশিত হয়। এই জ্ঞানের অনলে কর্মবীজ দগ্ধ হইয়া যায় বলিয়া আত্মস্বরূপে স্থিতি হইতে চ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না এবং পুনর্বার জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হইবার আশঙ্কাও থাকে না। ইহাই প্রচলিত কেবলীভাব বা কৈবল্য।

কিন্তু যে সকল আত্মা গুরুর তীব্রতর কৃপা প্রাপ্ত হয় তাহারা আরও উচ্চপদের অধিকারী হয়—তাহাদের কুণ্ডলিনী-জাগরণের পর ক্রমশঃ উর্দ্ধগতি হইয়া থাকে। পূর্বোক্ত আত্মার কুণ্ডলিনী জাগরণ হইতে দ্বিতীয় প্রকার আত্মার কুণ্ডলিনী জাগরণ অধিক মহত্বসম্পন্ন। কারণ এইস্থানে উর্দ্ধগতির সূচনা হয় এবং চরম অবস্থায় উর্দ্ধতম শিখর পর্য্যন্ত পৌঁছান যায়। বোধই আত্মার স্বরূপ, ইহা প্রথম ক্ষেত্রেও অভিব্যক্ত হয়। তাই এই স্থিতিও চিৎস্বরূপে স্থিতি তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু চিৎশক্তির বিকাশ ইহাতে থাকে না। দ্বিতীয় জাগরণে চিৎশক্তির উন্মেষ হয়। অবশ্য ইহা আভাস—ইহারই নাম শুদ্ধ বিদ্যার উদয় অথবা গুরুরাজ্যে প্রবেশ। শুদ্ধ বিদ্যার পূর্ণত্ব হইতেই ভবিষ্যতে শিবত্বের অভিব্যক্তি হয়। শুদ্ধ বিদ্যা গুরুরাজ্যের বস্তু, ইহাই দিব্যজ্ঞান। ইহাতে জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি উভয়ই থাকে। কৈবল্যরূপ স্থিতিতে চিৎস্বরূপে স্থিতি হয় বটে, কিন্তু চিৎশক্তির আভাসাত্মক উন্মেষও থাকে না। কিন্তু গুরুরাজ্যে চিৎশক্তির ক্রমশঃ অধিকতর বিকাশ ঘটিয়া থাকে—প্রথমে মিশ্রভাবে অর্থাৎ রিপুর সহিত মিলিত ভাবে, পরে শুদ্ধ ভাবে। গুরুরাজ্যের দ্বার উন্মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞানশক্তির পরিপূর্ণ উন্মেষ হয় এবং সমগ্র বিশ্ব কেন্দ্রস্থ এক অহংভাবের উপরে স্পষ্টভাবে ভাসিতে থাকে দেখিতে পাওয়া যায়। তখন অহং ভাবই হয় আত্মস্বরূপের পরিচায়ক—ইহাই আত্মাতে আত্মবুদ্ধির উদয়ের প্রতীক, ইহারই নাম বলের বিকাশ।

শক্তির জ্ঞানাংশ অনাবৃত্ত থাকে সম্পূর্ণভাবে, কিন্তু ক্রিয়াংশ ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করে। ক্রিয়াশক্তির ক্রমিক অভিব্যক্তির ফলে আত্মনিষ্ঠ অহংভাব ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে থাকে—পূর্ণ গুরুতত্ত্বে যাইয়া অখণ্ড বোধের পূর্ণ অহংভাব ফুটিয়া উঠে। প্রথমে যে অহং-এর উপর ইদংভাবের আভাস ছিল পরে তাহা আর থাকে না। এই প্রকাশাত্মক শিব ভাবই গুরুরাজ্যের কেন্দ্র। এইখানে মিলিত জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি ইচ্ছাশক্তি বা স্বাতন্ত্র্যরূপে দেখা দেয়। ইহারও ক্রমিক বিবর্তন আছে—ইচ্ছার যেটি পূর্ণতম বিকাশ সেইখানেই জ্ঞান ক্রিয়া ও ইচ্ছার পূর্ণ একত্ব সিদ্ধ। বস্তুতঃ শিব ও শক্তির একত্বও সেইখানেই। প্রাচীন গুহ্য সাধনাতে এইখানেই পরমশিবের স্থিতি এবং ইহাই পূর্ণত্বের নিদর্শন। যাহাকে দিব্যজ্ঞান বলা হইয়াছিল তাহার প্রাথমিক স্তরের পরিসমাপ্তিও এইখানেই।

এইভাবে দেখা যায় যে চিদণু মায়াতে নামিবার সময় গুরুরাজ্যের সন্ধান পায় না বটে, কিন্তু ফিরিবার সময় উচ্চ অধিকার সম্পন্ন হইলে সন্ধান পাইয়া থাকে। তবে ইহার পরে যে আরও কিছু থাকিতে পারে তাহা অনভিজ্ঞ পথিক সাধারণতঃ জানিতে পারে না। জ্ঞানগঞ্জের সত্তা বাস্তবিকপক্ষে গুরুরাজ্যেরও অতীত। যথার্থভাবে দেখিতে গেলে এই জ্ঞানগঞ্জই উচ্চতর গুরুরাজ্যের ভূমিস্বরূপ, অর্থাৎ জ্ঞানগঞ্জ হইতে জ্ঞানগঞ্জের লক্ষ্যস্থান পরমা-প্রকৃতি পর্যন্ত যে বিশাল রাজ্য রহিয়াছে তাহা পূর্বে জ্যোতি মাত্র ছিল, রাজ্যরূপে পরিণত ছিল না, কিন্তু উহা মহা-খণ্ডযোগীর কালদেহানুষ্ঠিত কর্মের প্রভাবে রাজ্যরূপ ধারণ করিয়াছে। জ্ঞানগঞ্জ এবং পূর্বোক্ত গুরুরাজ্য স্তরে ভিন্ন হইলেও প্রকারে ভিন্ন নহে। বলা বাহুল্য, এই বিশাল যোগভূমিও অর্থাৎ মহাখণ্ডযোগীর অধিকার-ক্ষেত্রও প্রকৃত গুরুরাজ্য নহে। তবে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত গুরুরাজ্যের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ ইহাকেই বলা চলে। প্রকৃত চরম আদর্শ অখণ্ড গুরুরাজ্যে—তাহা এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এবং তাহা প্রতিষ্ঠার জন্য কর্ম্মী যোগিমণ্ডলের মধ্যে আন্দোলন চলিতেছে। প্রথম গুরুরাজ্য হইতে দ্বিতীয় গুরুরাজ্য অধিকতর ব্যাপক এবং উচ্চতর, কিন্তু অখণ্ড গুরুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে এই উচ্চ নিম্ন ভাব থাকিবে না এবং ব্যাপকত্ব সমগ্র সৃষ্টিকে আশ্রয় করিবে বলিয়া পূর্বের গুরুরাজ্য এবং মধ্যবর্তী জ্ঞানগঞ্জ কালের সৃষ্টির সহিত উহারই অন্তর্গত হইয়া পড়িবে।

কালের রাজ্যে কালের দেহ আশ্রয় করিয়া কর্ম্মের সমাপ্তি আবহমান কাল হইতে এখন পর্য্যন্ত সিদ্ধ হয় নাই। অবশ্য আমি যোগীরই কর্ম্মের কথা বলিতেছি, সাধকের কথা নহে। কর্ম্মের আপেক্ষিক সমাপ্তি অবশ্য হইয়াছে, এমন কি কালের রাজ্যেই কেহ

না কেহ ইহা সম্পাদন করিয়াছেন ইহাও সত্য, কারণ তাহা না হইলে পূর্বোক্ত জ্ঞানগঞ্জ ও গুরুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত না। কর্ম্মের যথার্থ সমাপ্তি হয় নাই বলিয়াই পূর্বোক্ত কোন রাজ্যেই মধ্যবিন্দু ঠিক ঠিক স্থাপিত হয় নাই—ঐ সব স্থানে মধ্য বিন্দু যাহা গুরুর আসন তাহা অধিকার করিয়াছেন 'মা' গুরু নহেন। অবশ্য ঐ স্থানে 'মা'ই গুরু। প্রথম রাজ্যে অর্থাৎ পূর্বোক্ত গুরুরাজ্যে মা-ই শিবরূপে প্রকট। জ্ঞানগঞ্জাত্মক দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বিশাল ত্রিশক্তিময় ত্রিকোণ রাজ্য স্থাপিত রহিয়াছে, তিন কোণে তিন শক্তির রাজ্য রহিয়াছে—একটি হইতে অপরটি অধিকতর ব্যাপক। ত্রিকোণের মধ্যবিন্দুতে পরমাপ্রকৃতির অধিষ্ঠান। এইটিই তুরীয় বিন্দু এবং বিশ্বসৃষ্টির অন্তরতম ও ঊর্দ্ধতম স্থিতি-কেন্দ্র। জ্ঞানগঞ্জের কর্ম কালের দেহে সমাপ্ত হইলে এই বিশাল পরমাপ্রকৃতির রাজ্যে প্রবেশ করিয়া মধ্যবিন্দুতে স্থিতি লাভ করা যায়। প্রথমটি হইতে এইটি শ্রেষ্ঠতম গুরুরাজ্য ইহা সত্য, কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি ইহাও প্রকৃত গুরুরাজ্য নহে। এই স্থলেও 'মা'-ই গুরুরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। ইহাও প্রকৃত গুরুর স্ব-স্থান নহে। এই রাজ্য ভেদ করার পর অখণ্ড গুরুরাজ্যের প্রারম্ভ বলিতে পারা যায়। কিন্তু ইহা এখনও অব্যক্ত রহিয়াছে। এই অখণ্ড গুরুরাজ্যের আলোচনা পরে হইবে। তবে ইহা মনে রাখিতে হইবে, প্রকৃতির বা মার রাজ্যই আনন্দের রাজ্য, পরমাপ্রকৃতি ভেদের পর চৈতন্য রাজ্যের সূত্রপাত হয়, তৎপূর্বে নহে।

কিন্তু এইখানে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। প্রথম গুরুরাজ্যের যেটি চরম লক্ষ্য সেইখান হইতেই প্রকৃত অখণ্ড গুরুরাজ্যে যাওয়ার পথ বিদ্যমান রহিয়াছে! ঐ পথ সূর্য্যমণ্ডলের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়াছে এবং যোগ্য অধিকারী ভিন্ন সকলে ঐ পথে চলিতে পারে না। সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিতে হইলে মহাজ্ঞান আবশ্যক হয়। এই মহাজ্ঞানের প্রাপ্তি প্রথম গুরুরাজ্যের কেন্দ্রে স্থিত হইতে পারিলে ঊর্দ্ধ হইতে আপেক্ষিক মহাকৃপা সঞ্চারের ফলে আপনিই ঘটিয়া থাকে। এই আংশিক মহাকৃপা ব্যতীত প্রথম গুরুরাজ্য ভেদকরা সম্ভবপর হয় না। ইহার ফলে অখণ্ড গুরুরাজ্য উদ্ভাবনের পক্ষে অপরিহার্য্য সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যায় ইহা সত্য। কিন্তু জ্ঞানগঞ্জের লক্ষীভূত পরমাপ্রকৃতিকে ভেদ করিতে না পারিলে প্রথম কৃপা কার্য্যকরী হয় না এবং অখণ্ড গুরুরাজ্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা থাকে না। পরমাপ্রকৃতিকে ভেদ করিতে হইলেও পূর্বোক্ত মহাজ্ঞানই আবশ্যক হয়। পূর্বে সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করা থাকিলে এবং তাহার পর প্রকৃতি-রাজ্য ভেদ করা হইয়া গেলে প্রকৃত গুরু বা বিশুদ্ধ ভগবৎ সত্তাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথম গুরুরাজ্যে কেন্দ্র স্থাপন হয় নাই—উহার বাহিরে কালের ঘের বিদ্যমান রহিয়াছে। দ্বিতীয় গুরুরাজ্য আরও ঊর্দ্ধে অবস্থিত। ইহার ভূমি পূর্ববর্ণিত

জ্ঞানগঞ্জ এবং শেখর সেই বিন্দুটি, যাহা লোকোত্তর কর্মের প্রভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখন পর্যন্ত সূর্যমণ্ডল ভেদের কোন প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু সূর্যমণ্ডল ভেদ না হইলে প্রকৃত গুরুরাজ্য প্রবেশের সম্ভাবনা থাকে না। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাকৃপা ইহার পক্ষে পর্যাপ্ত নহে, তজ্জন্য তৃতীয় মহাকৃপা আবশ্যক হয়। এই মহাকৃপাতে প্রকৃত অর্থাৎ অখণ্ড গুরুরাজ্যের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া যায়। তখন এমন একটা ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হয় যাহাতে জগতের যাবতীয় প্রাচীর ভগ্ন হইয়া যায়। পূর্বোক্ত রাজ্য ভাঙ্গিয়া যায়, চিদাকাশে চিন্ময় রাজ্যও ভাঙ্গিয়া যায় এবং মায়া হইতে পৃথিবী পর্যন্ত সকল স্তরের অধিবাসীদের পক্ষেই লক্ষ্য খুলিয়া যায়। এই অভিনব রাজ্যে সকল স্তরের জীবেরই প্রবেশের সমান অধিকার। ইহা কাহাকেও উপেক্ষা করে না, ইহাতে কাহারও বঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। ইহাতে প্রবেশ করিবার এবং অবস্থান করিবার অধিকার সকলেরই আছে। এই অভিনব রাজ্যের দ্বার উন্মুখ হইলে ইহার ভিতরে সমস্ত বিশ্বেরই স্থান লাভ হইয়া থাকে। এই স্থান প্রাপ্তির মধ্যে যোগ্যতা-বিচার অবশ্য আছে, কিন্তু প্রবেশ সম্বন্ধে যোগ্যতার কোন প্রশ্ন নাই। যোগ্য হউক অথবা অযোগ্য হউক এইখানে প্রবেশের সকলেরই সমান অধিকার। এই পরম গুরুরাজ্যে কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই কেন্দ্ররূপী আসনে কর্মী সন্তান শ্রেষ্ঠতম অধিকার প্রাপ্ত হইয়া বসিতে পায়। তখন বিশ্ব-কমল প্রস্ফুটিত হয়, তাহা অনন্তদল সম্পন্ন—পূর্ববর্ত্তী বিভিন্ন রাজ্যের যাবতীয় প্রজা ঐ সকল রাজ্য ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পর এই অখণ্ড গুরুরাজ্যে আসন লাভ করে। পৃথিবীবাসী যাবতীয় মনুষ্যও তখন ঐ মহাকমলের দলে স্থিত হয়, ইহাই তাহাদের আসন। এই আসন লাভ করিবার জন্য এই অখণ্ড রাজ্যের কেন্দ্রস্থ অধিষ্ঠাতার অনুজ্ঞা আবশ্যক হয়, কারণ তাহার অনুমতি বা অনুগ্রহ ব্যতীত তাহার রাজ্যে প্রজা অবস্থান করিতে পারে না। প্রকারান্তরে বলা যায়, কেন্দ্রস্থ অধিষ্ঠাতা হইতে সঞ্চারিত শক্তি ও অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া ঐ রাজ্যে স্থিতি লাভ হয়।

কিন্তু এইখানেই শেষ নহে। প্রথম গুরুরাজ্যে গুরুর অনুগ্রহ আশ্রয় করিয়া প্রবেশ হয়। অনুগ্রহ এবং কর্মপ্রাপ্তি কালের দেহে অর্থাৎ মরদেহে হইয়া থাকে। মরদেহেই কর্ম সম্পূর্ণ হইলে রাজ্যের কেন্দ্রে উপবেশন করিতে পারা যায়, নতুবা চারি পার্শ্বে। ঐখান হইতে কর্মের অনুষ্ঠান ক্রমশঃ পূর্ণ হইতে কেন্দ্র পর্যন্ত যাওয়ার অধিকার জন্মে। ইহাই শিবত্ব। দ্বিতীয় রাজ্যে কেন্দ্রাধিষ্ঠাতা গুরুর অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া কর্মে অধিকার জন্মে। ইহা মরদেহের কথা। ঐ দেহে কর্ম পূর্ণ হইলে পূর্ববৎ কেন্দ্রে বসিবার অধিকার জন্মে। ইহা উচ্চতর কেন্দ্র। কালের দেহে কর্ম পূর্ণ না হইলে—জ্ঞানগঞ্জ যাইয়া সেইখান হইতে কর্ম পূর্ণ করিতে হয়। উহা সুদূর ভবিষ্যতের কথা। এই উভয়স্থলেই

মরদেহে কর্ম সম্পূর্ণ হইবার যেমন সম্ভাবনা আছে তেমন অসম্পূর্ণ থাকিবারও সম্ভাবনা আছে। অখণ্ড গুরুরাজ্যের সম্বন্ধেও ঐ একই নিয়ম। এই স্থলেও কর্ম-প্রাপ্তি মরদেহেই হয়। মরদেহে কর্ম পূর্ণ হইলে ঐ রাজ্যের মধ্যবিন্দুতে আসন পাওয়া যায়। তখন কালের সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটে, অর্থাৎ কাল আর থাকে না, মৃত্যুর মৃত্যু হইয়া যায়! প্রথম ও দ্বিতীয় রাজ্যে কর্ম দেওয়া হয়, তাহার পর ঐ কর্ম পূর্ণ করিবার ভার থাকে আশ্রিতের উপর। কালের জগতে উহা পূর্ণ করিতে পারিলে তো কথাই নাই, নতুবা কিঞ্চিৎকাল স্পর্শযুক্ত অমর গুরুরাজ্যে গিয়া সুদীর্ঘ কালে উহা পূরণ করিতে হয়। উহা পূরণ না করিলে গুরুর ঋণশোধ হয় না, গুরুর অনুগ্রহ নিরর্থক হইয়া পড়ে। দ্বিতীয় রাজ্য তাই। কিন্তু তৃতীয় রাজ্যে ঠিক তাহা নহে, কারণ ঐ রাজ্য সূর্যমণ্ডলের ওপারে। তাই মহাজ্ঞান দ্বারা সূর্যমণ্ডল ভেদ হইলে এবং এদিকে পরমাপ্রকৃতি ভেদ হইলে মহাকৃপার অন্তিম উন্মেষে অন্তিম দ্বার আপনিই উদ্‌ঘাটিত হয়। তখন এপার ও ওপারের ব্যবধানকারক ও সংযোজক ভেদ-রেখা মিটিয়া যায়, ইহকাল ও পরকাল এবং লোক ও লোকান্তর একই অখণ্ড প্রকাশে প্রকাশিত হয়। এই মহাপ্রকাশে উদয়াস্ত নাই এবং হ্রাস-বৃদ্ধিও নাই, ইহাই তৃতীয় গুরুরাজ্যের বিন্দুর পরিচয়। অথচ গুরুরাজ্যের কেন্দ্র হইতে কর্ম আসিলে কর্ম পূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী! বর্তমান দেহে কর্ম পূর্ণ না হইলে অলৌকিক দেহে কর্ম পূর্ণ হইবে, এই নিয়ম এখানে কার্যকর নহে, কারণ এখানে লৌকিক দেহই লোকোত্তর রূপে পরিণতি লাভ করে সুতরাং এই তৃতীয় রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইলে অর্থাৎ অন্ততঃ একজনও যদি এই পূর্ণ অবস্থা কর্মের পূর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে মরদেহে প্রাপ্ত হয় তখন আর তাহার কিছুই করণীয় থাকে না— বিশ্ব জগতের প্রতি অণু পরমাণু তাহার সহিত যুক্ত হয় তাহার প্রেরণালাভ করিয়া অনতিবিলম্বে নিজ কর্মের পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং মহা বিন্দুর সহিত তাদাত্ম্য লাভ করে।

এইখানে আরও একটি নিগূঢ় সন্ধান দিতে চেষ্টা করিতেছি। গুরুরাজ্যের কেন্দ্রে আমরা যাহাকে পাইয়াছি তিনি অখণ্ড প্রকাশ রূপ, তিনিই শিবতত্ত্ব। অবশ্য এই শিব দেহস্থিত সমস্ত চক্রভেদের পর সহস্রারে অথবা সহস্রারের উর্দ্ধে অনন্ত প্রকাশরূপে প্রকাশমান হন। জ্ঞানগঞ্জ হইতে যে রাজ্যের সূচনা হয় তাহার লক্ষ্য পরমা প্রকৃতি বলিয়া আমরা উল্লেখ করিয়াছি। এই লক্ষ্য প্রাপ্ত হইলে শিব-ভাবকে পরমশিব-ভাবে পরিণত করা আবশ্যক, কারণ এই পরমাপ্রকৃতি পরম শিবেরই নাভিকুণ্ড হইতে উত্থিত কমলাসনে বিরাজ করিতেছেন। শিবাবস্থায় ইহার আবির্ভাব সম্ভবপর নহে। গুরুরাজ্যের লক্ষ্য যে শিব তাঁহার সহিত শক্তির যোগ সিদ্ধ হইলে ঐ শিব পরমশিবরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। শক্তির পূর্ণ বিকাশ সম্পন্ন হইলে নাভিমার্গ খুলিয়া

যায় এবং তখন ঐ নাভিমণ্ডল হইতে ব্রহ্মনাল উত্থিত হয়। ইহা ষট্‌চক্র ভেদনকারী ব্রহ্মনাল হইতে উৎকৃষ্ট, কারণ ইহা শিবের নাভি হইতে উত্থিত হয় এবং ইহারই উপর কমলের কর্ণিকাতে মহাশক্তি বিরাজ করেন। শিব তখন অর্থাৎ পরমশিব তখন নিদ্রিতবৎ অবস্থিত। প্রথম রাজ্যের শিব শ রূপে স্থিত হন, কিন্তু দ্বিতীয় রাজ্যের শিব অর্থাৎ পরমশিব শব না হইলেও সুপ্ত হন (নিমেষ)। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে এই দ্বিতীয় রাজ্যেও পূর্ণত্ব সম্ভবপর নহে। তন্ত্রশাস্ত্রে ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্বের উপদেশে শিব ভাবের আদর্শ প্রদর্শিত হইলেও ইঙ্গিতে তত্ত্বাতীত পরমশিবের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু শিবতত্ত্ব হইতে তত্ত্বাতীত পরমশিবে কি প্রকারে উপনীত হওয়া যায় তাহার পথ নির্দেশ করা হয় নাই। তবে প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে যে শিবভাবের মধ্যে শক্তির পূর্ণসত্তা অভিন্নভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। এইজন্যই শিবভাব প্রকাশাত্মক বলিয়া বিশ্বাতীত হইলেও উহাই পূর্ণত্বের মূল ভিত্তি, কিন্তু শক্তির জাগরণ ব্যতীত উর্দ্ধগতি সম্ভবপর নহে। শক্তির কিঞ্চিৎ জাগরণে শিব হন শব, কিন্তু শক্তির আরও অধিক জাগরণে শিব হন সুপ্ত। শক্তির পূর্ণতম জাগরণে শিবও হন পূর্ণ জাগ্রত। কালী আদ্যাশক্তি, ইহা শিবময়ী শক্তির জাগরণের প্রথম পর্ব। শিব তখন শব। তারা সন্ধিস্থান—তখনও শিবের শবত্ব পরিহৃত হয় নাই। ললিতা বা রাজরাজেশ্বরী তৃতীয়া শক্তি, ইহার পূর্ণ জাগরণে শিব হন নিদ্রিত। এবার শবভাব কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু নিদ্রাভাব (নিমেষ) এখনও আছে। জ্ঞানগঞ্জের পরম অবধি এই পর্যন্ত। এখনও পূর্ণত্ব অবশিষ্ট। জ্ঞানগঞ্জের সাধনাতে শাস্ত্রের যাহা অস্ফুট ইঙ্গিত তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে। কারণ শিবভাবের পরে পরম-শিবভাব এখানে প্রতিষ্ঠিত।

আমরা জানি শ্রীশ্রীগুরুদেব জ্ঞানগঞ্জের সাধনা পূর্ণ করিবার সময় নাভিধৌতি ক্রিয়া লাভের জন্য কি পরিমাণে উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং কিভাবে উহা শ্রীগুরুর কৃপায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই নাভিধৌতির ফলেই তিনি শিবভাব হইতে পরম শিবভাব পর্যন্ত উন্নীত হইয়াছিলেন মনে করা যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে মহাশক্তি রাজ রাজেশ্বরীকে নিজেরই নাভি হইতে উত্থিত কমলে আসন দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। উন্মুক্ত নাভিকমলের সঙ্গে নবোদিত জ্ঞান-সূর্যের গভীর সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই সূর্য্য উদিত হইলে নাভিকমল প্রস্ফুটিত হয়, ইহাও যেমন সত্য, তেমনি নাভিকমল প্রস্ফুটিত না হইলে এই সূর্যের সন্ধান পাওয়া যায় না ইহাও তেমনি নাভিকমল প্রস্ফুটিত না হলে এই সূর্যের সন্ধান পাওয়া যায় না ইহাও তেমনি। সত্য, এই জ্ঞানসূর্য মহাজ্ঞানের দ্যোতক। গুরুরাজ্যের কেন্দ্রে যে শিবভাবের স্থাপনা হইয়াছে তাহার পর এই মহাজ্ঞানের সম্ভাবনা। সূর্যমণ্ডল ভেদ করা আবশ্যক নতুবা সূর্যমণ্ডলের পরপারে

স্থিত অখণ্ড গুরু ব্রহ্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ সুকঠিন। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সত্য যে পরমাপ্রকৃতি অথবা রাজরাজেশ্বরীকেও ভেদ করিতে হইবে। যে অখণ্ড গুরুরাজ্য অথবা তৃতীয় রাজ্যের কথা বলা হইয়াছে তাহার প্রতিষ্ঠার জন্য এই দুইটিই আবশ্যক, শিবের শবত্ব মুক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু পরম শিবের সুপ্তিভঙ্গ (নিমেষ ত্যাগ) এখনও হয় নাই। পরমশিবের জাগরণ সিদ্ধ হইলেই পূর্ণ জাগরণ হইল বলা চলে। তখন আর শিবশক্তি বলিয়া পৃথক্ কিছু থাকিবে না, এক অখণ্ড চৈতন্যই থাকিবে! তবে ইহার মধ্যেও ক্রম আছে, কারণ প্রথমে হয় আনন্দের প্রতিষ্ঠা, তাহার পর হয় বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা, তাহার পর সত্যের প্রতিষ্ঠা।

একটি কথা এখানে প্রণিধানযোগ্য। যোগী কর্ম্মের প্রভাবে অগ্রসর হয় ইহা সত্য, কিন্তু এই কর্ম্মের সঙ্গে কৃপা বা অনুগ্রহের এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে যে চরমাবস্থায় এই দুইটিকে ভেদ করা যায় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে গুরুরাজ্যে গুরুদত্ত প্রাথমিক অনুগ্রহ কর্ম্মের আকারে শিষ্যের জীবনে প্রকাশ পায়, কারণ তাহা না হইলে দীক্ষাপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরে মৃত্যু হইলেও শিষ্য গুরুরাজ্যে স্থান পায় কিসের জোরে? আসন-তত্ত্ব একদিকে কৃপা ও অপরদিকে কর্ম্মকে অভেদে ধারণ করিতেছে। গুরুদত্ত আসন ইহাই বুঝায় যে এক পক্ষে ইহা যেমন গুরুর কৃপা, অপর পক্ষে তেমনি শিষ্যের ভাবী কর্ম্মের সম্ভাবনীয়তা। পরে কর্ম করিতে হয় ইহা সত্য, কিন্তু ইহার সম্ভাবনা আসন ব্যতীত হইত না। যদিও এই কৃপাও এক হিসাবে ঋণরূপ, কারণ পরে উহা শিষ্যের কর্ম্মদ্বারা শোধিত হয়, তথাপি ইহা কালরাজ্য হইতে উদ্ধার করিবার অব্যর্থ উপায়। দ্বিতীয় রাজ্যে এই কৃপা যেমন আরও গভীর তেমনি ইহার সংসৃষ্ট কর্মের বল ও প্রসারও আরও অধিক। কিন্তু এই দ্বিতীয় রাজ্যেরই সব শেষ হয় না, কারণ এখানেও কর্ম বাকী রহিয়াছে এবং কৃপাও অবশিষ্ট রহিয়াছে। কৃপা ও কর্মের মিলন এখনও হয় নাই। এখনও গুরুর কৃপা ও শিষ্যের কর্ম্ম কতকটা পৃথক পৃথকই বিদ্যমান আছে, যদিও উভয়ে অনেকটা মিলন সংঘটিত হইয়াছে। পরমাপ্রকৃতির রাজ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত কৃপার অবধি। সেই পর্যন্ত যে কর্ম্ম তাহা কৃপার অধীন অর্থাৎ স্পষ্ট কৃপার অধীন। কিন্তু পরমাপ্রকৃতির রাজ্য ভেদ করা, অখণ্ড গুরুধামে প্রবেশ করা সর্বপ্রথমে শিবাবস্থা হইতে উর্দ্ধে উত্থিত হওয়া, সবই মহাকৃপা সাপেক্ষ, কিন্তু ইহা গুপ্ত। ইহা অজানাভাবে ঘটিয়া থাকে, কিন্তু কৃপার কার্য সিদ্ধ হয়। কৃপারূপে কৃপার পরিচয় পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু কৃপা নিজ ফল প্রসব করে। পরমাপ্রকৃতির রাজ্যভেদের পর অখণ্ড গুরুধামের দ্বার পর্যন্ত পথ দুর্গম। এই পথে কৃপার অর্থাৎ প্রকট কৃপার সন্ধানে পাওয়া যায় না। তৃষ্ণার্ত পথিক পিপাসায় আর্ত হইয়া কাঁদিতে থাকে।

তৃষ্ণানিবর্তক জল অর্পণ করিবার জন্য কেহ তাহার নিকট হাত বাড়াইয়া দেয় না। কিন্তু তাহা না দিলেও অজ্ঞাতভাবে অচিন্ত্য প্রকারে তাহার তৃষ্ণার উৎকটতা কমিয়া আসে এবং কষ্টের লাঘব হইতে থাকে।

সাধকের কুণ্ডলিনী জাগরণের পূর্ণ পরিণতি চিদাকাশে ইষ্ট বা মা'র সহিত তাদাত্ম্য। উদ্বৃত্তশক্তির অভাববশতঃ সাধক যোগী হইতে পারে না। খণ্ডযোগীর কুণ্ডলিনী জাগরণের চরম ফল শুদ্ধ বিদ্যার উন্মেষ ও উহার বিকাশে শিবত্ব লাভ। এইখানেই জীবের জীবভাব কাটিয়া শিবভাব প্রাপ্তি ঘটে। সাধক শিব হইতে পারে না। কিন্তু কেবলী হয় অর্থাৎ বিদেহ-কেবলী। ইহা নিরঞ্জন পশুরই একটি অবস্থা। যোগী খণ্ড হইলেও কর্ম্মের পূর্ণতায় শিব হয়, জীবভাব আর থাকে না, বিদেহও হয় না—সিদ্ধ খণ্ডযোগী হয় ও তাহার কায়া হয় শক্তি। গুরুরাজ্যে সর্বত্র বৈন্দব কায়া, কিন্তু জ্ঞানগঞ্জের অধোদিকে বৈন্দব কায়া এবং উর্দ্ধে শক্তি কায়া। বৈন্দব কায়া অমর, শক্তি কায়াও অমর, কিন্তু বৈন্দব কায়াতে পূর্ব কাল-সম্বন্ধ সংস্কার রূপে থাকা পর্যন্ত জরা থাকিলেও মৃত্যু থাকে না, কিন্তু শক্তি কায়াতে জরাও থাকে না। উহা অজর ও অমর, উহাই শ্রেষ্ঠ দিব্যকায়া। দিব্যজ্ঞান ব্যতীত দিব্যকায়ার উদ্ভব হয় না। শুষ্কজ্ঞানে মায়িক কায়ার নিবৃত্তি হয় বটে এবং কর্মবীজ নষ্ট হয় তাহাও সত্য, কিন্তু শুদ্ধ বিদ্যার অভাবে অমায়িক কায়া লাভ হয় না। জ্ঞানগঞ্জের উর্দ্ধদিকে সকলেই স্বরূপতঃ কিশোর কিশোরী—সকলেরই স্থিতি শিবত্বরূপে মহাপ্রকাশে। ভৈরবী অবস্থাতে জরা থাকে, কিন্তু দেবী অবস্থাতে জরা থাকে না।

গুরুরাজ্যের সাধনা জীবের সাধনা শিব হওয়ার জন্য, কিন্তু জ্ঞানগঞ্জের সাধনা শিবের সাধনা পরমশিব হওয়ার জন্য অর্থাৎ নিজের আধারে পরাশক্তির পূর্ণতম বিকাশের জন্য। গুরুরাজ্যের সাধনায় যে ষট্চক্রের ভেদ হয় তাহা জীবদেহের ষট্চক্র, কিন্তু জ্ঞানগঞ্জের সাধনায় যে উক্ত ষট্চক্র ভেদ করিতে হয় না এবং শিবত্ব লাভের সঙ্গে সঙ্গে সে প্রয়োজনও আর থাকে না। কিন্তু শিবত্ব লাভ হইলেই তো সব হইল না। কারণ শিবত্বে যদি শক্তি অন্তর্লীন থাকে তাহা হইলে শক্তির কোন ক্রিয়া থাকে না বলিয়া শিবও অব্যক্তপ্রায় হইয়া যান। এই শিব বিশ্বাতীত মহাপ্রকাশের সহিত অভিন্ন। শিবের সঙ্গে তাঁহার নিজশক্তির পূর্ণ সংযোগ হইলে সামরস্য ভাবের উদয় হয়। পূর্বে হইয়াছিল শিবের জাগরণ, এবার হইল শিবের পূর্ণ শিবত্ব লাভের সঙ্গে সঙ্গে শক্তির জাগরণ। ইহার পর হইবে এমন একটি অবস্থার উদয় যেখানে জাগ্রৎ শিব ও জাগ্রৎ শক্তি অভিন্ন হইয়া প্রকাশমান হইবেন। তখন শিবের মহানিদ্রা ভঙ্গ হইবে এবং পরমশিব পৃথক সত্তা নিয়া থাকিবেন না—পূর্ণ অদ্বৈত সত্তার উদয় হইবে।

কিন্তু সূর্যমণ্ডল ভেদ না হওয়া পর্যন্ত এইরূপ স্থিতি হওয়া সম্ভবপর নহে। সূর্যমণ্ডল ভেদ করিতে পারিলে অন্তরালবর্ত্তী সকল পর্দ্দা কাটিয়া যায়। অখণ্ড গুরুরাজ্যের প্রকাশ তখনই সম্ভবপর। জ্ঞানগঞ্জের সাধনা ও সিদ্ধি এই অখণ্ড ভূমিরই প্রাপ্তির সহায়ক।

জ্ঞানগঞ্জের অথবা গুরুরাজ্যের আলোচনা প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন স্বভাবতঃই জিজ্ঞাসুর মনে উদিত হইয়া থাকে। প্রশ্নটি এই—কেহ শুষ্কজ্ঞান লাভ করিয়া প্রকৃতি হইতে বিবেক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে কৈবল্য লাভ করেন, আবার কেহ দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া ঐ জ্ঞানের ক্রমিক উৎকর্ষে গুরুরাজ্য অথবা জ্ঞানগঞ্জ প্রভৃতি ভূমিতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন। সদ্‌গুরুর অনুগ্রহের মূলে এই প্রকার পার্থক্য লক্ষিত হয় কেন? এই প্রশ্নের উত্তর এই—সদ্‌গুরু এক হিসাবে অখণ্ড বিশ্ব—গুরু তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু যে আধারে তাঁহার শক্তি সঞ্চারিত হয় তাহার ধারণ-সামর্থ্যের তারতম্যানুসারে সঞ্চারিত শক্তির তারতম্য ঘটে। এইজন্য অনুগ্রহের প্রকাশে পার্থক্য অনুভূত হয়। বস্তুতঃ তাঁহার কোন পক্ষপাত নাই। আধার সামর্থ্যের তারতম্যের কারণ এই যে, সকলে অবতরণ মুখে একই স্থান হইতে অবতীর্ণ হয় না। কেহ জ্যোতি হইতেই মায়াতে বিসৃষ্ট হয়—অবশ্য অণুরূপে জ্যোতির মধ্যে পূর্বেই স্থিতিলাভ করিয়াছিল, কেহ জ্যোতির অতীত চিন্ময় রাজ্য হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে। এই চিন্ময় রাজ্যেরও ইতর-বিশেষ আছে, মূলে সব সেই অখণ্ড অচৈতন্যরই শক্তি-স্পন্দন হইতে উদ্ভুত তাহা সত্য। এইজন্য ফিরিবার সময় যে যেখান হইতে নামিয়া আসিয়াছে তাহাকে সেইখানে টানিয়া লওয়া হয়। যে জ্যোতি হইতে সুপ্ত অবস্থার সঙ্গে মায়াগর্ভে পতিত হইয়াছে—অবশ্য কর্ম সমষ্টির ভিতর দিয়া—সংসারে প্রবিষ্ট হইবার পরে তাহার পক্ষে শুষ্কজ্ঞান লাভ করিয়া প্রকৃতির বাহিরে শুদ্ধ বোধস্বরূপে স্থিত হওয়াই মুক্তিপদ, ইহার বেশী আকাঙ্ক্ষা সে করিতে পারে না। আপাততঃ উহা তাহার প্রাপ্যও নহে। অনাত্মাতে আত্মবোধ নিবৃত্ত হইলে কর্মবীজ স্বভাবতঃই বিনষ্ট হয়। তখন জন্ম মৃত্যুর কারণ কাটিয়া যায় এবং কৈবল্যপদে অবস্থান ঘটে। এই সব আত্মার পক্ষে দিব্যজ্ঞান প্রাপ্তির সম্ভাবনা কোথায়? কিন্তু যে আত্মা চিন্ময় ভূমি হইতে নামিয়া আসিয়াছে তাহার পক্ষে ফিরিয়া যাইতে হইলে জ্যোতি ভেদ করিয়া চিন্ময় রাজ্যে যাওয়া আবশ্যক। এই অবস্থায় শুধু অনাত্মাকে আত্মবোধের নিবৃত্তি যথেষ্ট নহে, আত্মাকে আত্মবোধের উদয়ও আবশ্যক। এই আত্মবোধ যেমন যেমন বিকাশপ্রাপ্ত হয়, তেমনি তেমনি আত্মাকে অনাত্মবোধ কাটিয়া আসে অর্থাৎ শুদ্ধ আত্মাতে পূর্ণ অহংভাব বিরাজ করে। ইহাই শিবত্ব। এইভাবে গুরুরাজ্যের উর্দ্ধ সীমা পর্য্যন্ত গতির

প্রণালী গুহ্যভাবে হইলেও তান্ত্রিক সাহিত্যে ইহা প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু গুরুরাজ্য হইতে জ্ঞানগঞ্জে উঠিবার প্রণালী কোথাও বর্ণিত হয় নাই, কারণ ইহা আর ও গুহ্য। জ্ঞানগঞ্জে সেই সব আত্মাই প্রত্যাবর্তন করে যাহারা ঐ ভূমি হইতে প্রপঞ্চে নামিয়া আসিয়াছে। মহাখণ্ড গুরু বাছিয়া বাছিয়া তাহাদিগকে টানিয়া নেন। এই পর্য্যন্তই আমাদের আলোচনার বর্তমান সীমা। কিন্তু এই নীতির অনুসরণ করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে অখণ্ড গুরুরাজ্যের অধিকার অনুসারে গতি হইয়া থাকে।

প্রত্যেক রাজ্যেই দুইটি বিভাগ আছে। একটি কেন্দ্র, অপরটি বাহ্য। কেন্দ্রের বল কম হইলে তাহার অধিকার ক্ষেত্ররূপ গোলকটি ছোট হয়। কেন্দ্রের বল বেশী হইলে ঐ ক্ষেত্রটি আরও বড় হয়। কেন্দ্রের বল অপরিসীম হইলে ঐ ক্ষেত্রটি ফলতঃ বিশ্বব্যাপী, এমন কি অনন্ত হইয়া পড়ে। কেন্দ্রের শক্তি প্রবল হইলে কেন্দ্রে প্রবেশ করিবার অধিকারীর সংখ্যা খুব কম হয়, কিন্তু কেন্দ্র প্রবল বলিয়া কৃপা-বিস্তারের ক্ষেত্রটা অপরিসীম বৃহৎ হয়। যতই নামিয়া আসা যায় ততই কেন্দ্র হয় দুর্বল, তাই কৃপা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু নিয়ন্ত্রণাদির বন্ধন থাকিয়া যায়। কেন্দ্র আরও দুর্বল হইলে অনুগ্রহের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হয় বলিয়া নিয়ম ও বিধান অপেক্ষাকৃত কঠিন হয়। কারণ তাহা না হইলে শুধু দুর্বল কেন্দ্র দ্বারা ফলসম্পাদন সম্ভবপর নহে।

এইজন্য অখণ্ড গুরুর দৃষ্টিতে তাঁহার অনুগ্রহের অযোগ্য বা অবিষয়ীভূত কিছুই থাকিতে পারে না।

জ্ঞানগঞ্জ সম্বন্ধে মোটামুটি কিছু তত্ত্ব প্রকাশ করা হইল। কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে জ্ঞানগঞ্জ এবং তদনুরূপ অন্য স্থান (যেমন বৃন্দাবন), এই উভয়ে পার্থক্য কি? জ্ঞানগঞ্জ বলিতে আমরা তিব্বতের অন্তর্বর্তী নিগূঢ় স্থান বিশেষকে লক্ষ্য করিতেছি না, যদিও ইহা সত্য যে ঐ স্থানও প্রকৃত জ্ঞানগঞ্জের সহিত সংসৃষ্ট, কারণ তত্ত্বময় জ্ঞানগঞ্জেরই উহা অর্থময় প্রকাশ; তদ্রূপ বৃন্দাবন বলিতেও আমরা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত মথুরার সন্নিহিত স্থান-বিশেষকে লক্ষ্য করিতেছি না, যদিও এই ক্ষেত্রেও ইহা সত্য যে এই ভৌম বৃন্দাবনের সহিতও প্রকৃত বৃন্দাবনের সংসর্গ রহিয়াছে, এমন কি তাদাত্ম্যও রহিয়াছে।

বৃন্দাবন মাধুর্য্যময়ী ভক্তি-সাধনার শ্রেষ্ঠ স্থান। জ্ঞানগঞ্জ কর্মভূমি। পৃথিবীতে পার্থিব দেহে আবদ্ধ কর্ম ঐখানে পূর্ণ হইতে পারে, দেহাদির সংস্থান তাহার অনুকূল ভাবেই সেখানে পাওয়া যায় এবং ঐ কর্ম পূর্ণ হইলে যে লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যাইবে তাহাও ঐখান হইতেই আভাসরূপে দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু বৃন্দাবন এই জাতীয় কর্মস্থান নহে, কিন্তু ভাবস্থান। ভাব সাধনা এইখানে আরব্ধ হইয়া অসম্পূর্ণ থাকিয়া

গেলে বৃন্দাবনে তদুপযোগী দেহ প্রাপ্তি হয় এবং এই সাধনার ক্রম-বিকাশ চলিতে থাকে, কারণ ওখানেও স্তর-বিভাগ আছে। জ্ঞানগঞ্জে যেমন অভিনব দেহাদি প্রাপ্তি ঘটে, যাহার চরম লক্ষ্য জরা ও মৃত্যু হইতে অব্যাহতি, বৃন্দাবনেও তেমনি ভগবানের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ সাধনার উপযোগী ভাব-দেহের প্রাপ্তি ঘটে এবং ঐ ভাব-দেহের ক্রম-বিকাশে কোন না কোন সময় পূর্ণরসের অভিব্যক্তি হয় এবং চরম সিদ্ধিলাভ হয়। জ্ঞানগঞ্জে দিবা-রাত্রি বিভাগ নাই বৃন্দাবনেও তাহাই। জ্ঞানগঞ্জের ভূমি মৃত্তিকারূপ নহে, তদ্রূপ বৃন্দাবনের ভূমিও মৃত্তিকারূপ নহে, উভয়েই চিন্ময়। ইহা সত্ত্বেও উভয়ের ভেদ আছে। জ্ঞানগঞ্জের লক্ষ্য 'মা' যাহাকে পাইবার জন্য শিবকে নাভি-ধৌত সিদ্ধ করিয়া পরমশিবরূপ ধারণ করিতে হয়। বৃন্দাবনের লক্ষ্য 'মা' নহে, বৃন্দাবনে মায়ের কোন স্থান নাই। এমনকি জ্ঞানগঞ্জের যিনি পরম লক্ষ্য রাজরাজেশ্বরী বা ললিতা বৃন্দাবনে তিনি মাতৃরূপ পরিহার করিয়া রাসলীলার প্রধান সখীরূপে পরিগণিত। ইহার অতি নিগূঢ় তাৎপর্য্য আছে। শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীগুরুর ধারা জ্ঞানগঞ্জ হইতে মাকে ধরিয়া অনন্তের দিকে অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু গুরুদেবের শ্রীগুরুভ্রাতা শ্রীল ভবদেব গোস্বামীর ধারা মাকে পরিহার করিয়া ক্লান্ত ভাব ধরিয়া যুগল উপাসনায় পর্যবসিত হইয়াছে।

আলমন্দার সংহিতাতে আছে ভগবানের লীলা তিন প্রকার—একটি বাস্তব বা পারমার্থিক, একটি প্রাতিভাসিক এবং একটি ব্যবহারিক। বেদান্তে যেমন সত্তাকে পারমার্থিক, প্রাতিভাসিক ও ব্যবহারিক এই তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে, বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণের শাস্ত্রে যেমন স্বভাবকে পরিনিষ্পন্ন, পরিকল্পিত ও পরতন্ত্র—এই তিন ভাগে বিভাগ করা হইয়াছে, তেমনি বৈষ্ণবগণও লীলাকে তিন ভাগে বিভাগ করিয়াছেন। এই ত্রিবিধ লীলার স্থানও তিন প্রকার—বাস্তব বা পারমার্থিক লীলা অক্ষর ব্রহ্মের হৃদয়-প্রদেশে দৃষ্ট হয়, প্রাতিভাসিক লীলা নিতা বৃন্দাবনে হইয়া থাকে এবং ব্যবহারিক লীলা নির্দিষ্ট সময়ে ব্রজভূমিতে হইয়া থাকে। মনে রাখিতে হইবে অক্ষর ব্রহ্মের হৃদয়টি বৃন্দাবন, প্রাতিভাসিক লীলার যেটি ভূমি তাহাও বৃন্দাবন এবং ব্রজভূমিও বৃন্দাবনেরই নামান্তর। কিন্তু তিনটিই বৃন্দাবন হইলেও ইহাদের মধ্যে পরস্পর পার্থক্য আছে। অনুরূপ যুক্তি ও পরিভাষা অবলম্বন করিয়া বলিতে পারা যায় যে জ্ঞানগঞ্জের মধ্যেও এই প্রকার ভেদ আছে। যেটি প্রকৃত জ্ঞানগঞ্জ সেটি ঐ অক্ষর ব্রহ্মের হৃদয়স্থ বৃন্দাবনের মতই চিন্ময় প্রদেশ। ঐ বৃন্দাবন যেমন—

তৎস্থানং কোটি ব্রহ্মাণ্ড-মহাশূণ্যাদ বিলক্ষণম্।
মানং তস্যাপি কিমপি বিদ্যতে নৈব শাম্ভবি।।
তত্র ভূমিং স্বপ্রকাশামাকাশঞ্চ তথাবিধম্।
জলং তথাবিধং বিদ্ধি তেজশ্চৈব তথাবিধম্ ইত্যাদি।।

তদ্রূপ বাস্তব জ্ঞানগঞ্জের ভূমি আকাশ জল তেজ সবই স্বপ্রকাশ, অর্থাৎ সেখানে মাটি নাই, আকাশ প্রভৃতিও নাই, একমাত্র চৈতন্যই ভূমি প্রভৃতি রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। যেটি ব্যবহারিক জ্ঞানগঞ্জ সেইটি সিদ্ধ পুরুষ প্রভৃতির পরিচিত, কিন্তু যেটি পারমার্থিক জ্ঞানগঞ্জ সেটি যোগের চরম শিখরে উত্থিত না হইলে উপলব্ধি করা যায় না। তাই বলা হয় তিব্বতের স্থান বিশেষে জ্ঞানগঞ্জ অবস্থিত, যেখানে অধিষ্ঠাতৃ বর্গের সহানুভূতি না থাকিলে প্রবেশ করা যায় না। এমন কি সে স্থানের সন্ধানও পাওয়া যায় না।

কর্মের সার্থকতা এবং ভক্তির সার্থকতা সাধকের জীবনে পৃথক পৃথক। কর্ম দ্বারা অধিকার সম্পত্তি প্রবল হইলে উক্ত স্থান সকলের সন্ধান পাইতে পারা যায়। এই অধিকার সম্পত্তি লাভের জন্য স্থূলদেহে গুরু নির্দিষ্ট কর্মরাশিকে সমাপ্ত করিতে হয়—আভাসও যেন বাকী না থাকে। কর্ম সমাপ্ত না হইলে আধারে বলাধান হয় না, স্বরূপের মহান্ প্রকাশ ধারণা করিবার যোগ্যতা জন্মে না। কৃপা ধারণ করিতে হইলেও যোগ্যতা আবশ্যক। মহাকৃপাই প্রকৃত কৃপা, তখনকার যোগ্যতাই শ্রেষ্ঠ যোগ্যতা। জ্ঞানগঞ্জে, শুধু জ্ঞানগঞ্জে কেন, প্রতি যোগ-ভূমিতেই এই যোগ্যতা বাড়াইবার উপায় রহিয়াছে। ইহার ফলে কর্ম ক্রমশঃ পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে। এইজন্য গুরুরাজ্য জ্ঞানগঞ্জ এবং অখণ্ড গুরুর ক্ষেত্র, যাহা ভাবী প্রকাশের অন্তর্গত, সবই ভূমিরূপ। পারমার্থিক জ্ঞানগঞ্জের সন্ধান সকলের পক্ষে জানা সম্ভবপর নহে। তবে কেহ কেহ যে জ্ঞানগঞ্জের সন্ধান প্রাপ্ত হন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় তাহা ব্যবহারিক জ্ঞানগঞ্জের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট জানিতে হইবে*।"

---

* জ্ঞানগঞ্জের বিবরণ "শ্রীশ্রীযোগিরাজাধিরাজ বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস" নামক গ্রন্থের বিভিন্ন পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। "ব্রহ্মাণ্ডনো ভেদ" নামক ১৯২৬ সনে প্রকাশিত গুজরাতী গ্রন্থে যে তিব্বতে অবস্থিত "সত্য জ্ঞানাশ্রম" বা "জ্ঞানমঠ" নামক গুপ্ত মঠের কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা জ্ঞানগঞ্জের সহিত সংসৃষ্ট বলিয়া মনে হয়। এই মঠ হিমালয়ের উপরে তিব্বতপ্রান্তে অবস্থিত। ইহার পাঁচ মাইল ব্যবধানে চিরতুষার প্রদেশ। এই মঠে যে প্রকার জ্ঞান পাওয়া যায় তাহার তুলনা পৃথিবীতে আর কোন স্থানে নাই। প্রসিদ্ধ আছে যে রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকালে সিদ্ধপুরী, আত্মপুরী ও জ্ঞানপুরী নামক তিনজন পর্যটক ভ্রমণ করিতে করিতে ব্রহ্মদেশে কিছুদিন অবস্থানের পর এই গুপ্তস্থানে আসিয়া স্থায়ীভাবে বাস করিতে আরম্ভ করেন। এখানে যোগ, অমৃতসিদ্ধি অন্যান্য বিজ্ঞান বিষয়ক তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হইত। স্থানটি এত গুপ্ত যে সুদীর্ঘ কালেও চীন, ব্রহ্মদেশ ও আসামের বারজন ব্যতীত আর কেহ এই স্থানের সন্ধান জানিত না। কিছুদিন পরে দুইজন মহাত্মা ঐ স্থান ত্যাগ করেন (ঐ পৃঃ ৭৭)। রোমদেশীয় একজন পথিকও এই স্থানের কথা "জ্ঞানমঠ" নামে প্রকাশ করিয়াছিলেন। এখানকার তিনজন মহাপুরুষের অলৌকিক দিব্যশক্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে। এই মঠে অনুমতি ব্যতীত কাহারও

প্রবেশ করিবার উপায় ছিল না (ঐ পৃঃ ৭৮)। আর একজন গ্রীক পর্য্যটকও এই স্থানের কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন যে তিব্বতেই এই মঠের ন্যায় অদ্ভুত স্থান তিনি পৃথিবীতে অন্যত্র দেখেন নাই। তাঁহার মতে ইহাই প্রকৃত "Heaven on Earth" (ভূ-স্বর্গ—ঐ পৃঃ ৭৮)। চীনদেশের ঐতিহাসিক Fengliyan বলিয়াছেন যে দুর্গম পর্বতের অন্তরালে এই গুপ্ত মঠে যোগক্রিয়ার যে আলোচনা হয় তাহা অনেকেই জানে না কিন্তু ইহা মনে হয় যে একসময় পৃথিবীর প্রকৃত উন্নতি এই সব যোগীদের দ্বারাই সিদ্ধ হইবে। এই সকল যোগী যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই করিতে পারেন। আর একজন ঐতিহাসিক বলিয়াছেন যে বায়ুমন্ডলে একটি অদৃশ্য দুর্গ রচনা করিয়া জ্ঞানমঠকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে (ঐ পৃঃ ৭৯)।

"দেবদর্শন" প্রথম খন্ডে আছে যে কিংবদন্তী অনুসারে অনন্ত যোগী নামক একজন মহারাষ্ট্রীয় যোগী ভগবান দত্তাত্রেয়ের আদেশে যোগ শিক্ষার জন্য জ্ঞানগঞ্জ গিয়াছিলেন ও সেখানে কয়েক বৎসর বাস করিয়াছিলেন। "জ্ঞানগঞ্জ" নামক বর্তমান লেখকের একটি বিবরণাত্মক প্রবন্ধ গোরখপুর হইতে প্রকাশিত "কল্যাণ" নামক মাসিক পত্রিকার যোগাঙ্কে বহুদিন পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, উহা ব্যবহারিক জ্ঞানগঞ্জের বিবরণ।

দেহ ও কর্ম এবং জ্ঞানগঞ্জের সারকথা

শ্রীশ্রীগুরুদেব বলিতেন, "শরীরং কেবলং কর্ম শোকমোহাদি বর্জিতম।" কর্ম হইতে শরীর হয় ইহা যেমন সত্য, তদ্রূপ কর্মের জন্যই শরীর ইহাই তেমনি সত্য। শরীর ব্যতীত কর্মও হয় না ভোগও হয় না। প্রারব্ধ কর্মের ফল ভোগ করিবার জন্য শরীর গ্রহণ করিতে হয় এবং যতদিন শরীর দ্বারা ঐ ভোগ সমাপ্ত না হয় ততদিন শরীর-ধারণ আবশ্যক হয়। ভোগ সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শরীর-পাত ঘটিয়া থাকে। জাতি, আয়ু ও ভোগ এই তিনটি প্রারব্ধের ফল। দেহ-সম্বন্ধই জাতি বা জন্ম এবং এই সম্বন্ধ-বিচ্ছেদই মৃত্যু। উভয়ের অন্তরালবর্ত্তী সময়টি উক্ত সম্বন্ধের স্থিতিকাল। উহাকেই প্রচলিত ভাষাতে আয়ু বলা হয়। সুখ ও দুঃখ, যাহা নিজের নিয়ত-বিপাক প্রাক্তন কর্ম্মবশতঃ আপতিত হয় তাহা, বিনা বিচারে ভোগ করিয়া যাইতে হয়। তবেই উহা কাটিতে পারে। নতুবা ভোগকালেও অভিনব কর্মবীজ সঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা থাকে।

যে দেহদ্বারা কর্ম করা হয় তাহা কর্মদেহ, যে দেঁহদ্বারা কর্মফল সুখ-দুঃখ ভোগ করা হয় তাহা ভোগদেহ, এবং যে দেহে একই সঙ্গে কর্মও হয় ভোগও হয়, তাহা মিশ্রদেহ। সাধারণতঃ কামধাতুর দেবাদির, তির্য্যগাদির প্রেতযোনির, অসুরাদি ও নরকবাসী জীবের দেহ ভোগদেহ। মানুষের দেহ কর্মদেহ ও ভোগদেহ উভয়ই। কর্ম করিয়া অর্থাৎ পুরুষকার প্রয়োগ করিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইবার যোগ্যতা একমাত্র মানুষেরই আছে—অন্য প্রাণীর সে সামর্থ্য নাই। তাই মানুষের এত গৌরব। তত্ত্ববিদ্‌গণ সেইজন্য নরদেহের এত বেশী মহিমা কীর্তন করিয়াছেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্ব ও মহাপুরুষ সংশ্রয়—এই তিনটিকে জীবনের দুর্লভ সম্পৎ বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। ভক্ত রামপ্রসাদও—

"মনরে, তুমি কৃষিকাজ জান না,—
এমন মানব জমিন রইল পতিত,
আবাদ করলে ফলত সোনা,"

বলিয়া তাঁহার অমর সঙ্গীতে মনুষ্য-দেহেরই উৎকর্ষ জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই যে 'কৃষিকাজের' কথা বলা হইয়াছে ইহারই নাম কর্ম—মানব দেহকে আশ্রয় করিয়া মনের দ্বারা ইহা সম্পন্ন করিতে হয়, তাই মানব দেহের এত মহত্ত্ব! প্রকৃতির নিয়মে ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া জীব সর্বশেষে মনুষ্যদেহেই প্রাপ্ত হয়। তখন সে কর্মের অধিকারী হয় ও অধ্যাত্ম-যাত্রার পথে অগ্রসর হইবার সুযোগ লাভ করে। তাই হংস

গীতাতে আছে—"গুহ্যং ব্রহ্ম তদিদং বো ব্রবীমি, ন মানুষ্যাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ"। অবিবেকের বশে ভোগবাসনা দ্বারা চালিত মানুষ অসংযত জীবন যাপন করিয়া দীর্ঘকাল কৃত কর্মের ফলভোগের জন্য অন্যরূপ ভোগদেহ প্রাপ্ত হয় এবং এইভাবে অধঃ, উর্দ্ধ ও মধ্যলোক ভ্রমণ করিতে করিতে কদাচিৎ ভোগকালের অবসান মুখে ভাগ্যবশতঃ বিবেকের উদয়ে বিশুদ্ধ কর্ম করিতে সমর্থ। হয়। যোগরূপ কর্মই বিশুদ্ধ কর্ম জানিতে হইবে। শুক্ল, কৃষ্ণ ও মিশ্র এই তিনপ্রকার কর্ম্ম হইতে তদনুরূপ বিভিন্ন প্রকার গতিলাভ হয়। শুক্ল কর্মই পুণ্য—যাহার ফলে দেবলোকে দেবদেহ ধারণ করিয়া বাসনানুসারে আনন্দভোগের অধিকার জন্মে। তদ্রূপ কৃষ্ণ কর্ম্ম বা পাপের ফলে অধোলোকে গতি হয় ও দুঃখভোগ হয়। মিশ্র কর্মে মধ্যলোকে মনুষ্য-দেহ লাভ হয়। কিন্তু যতক্ষণ অশুক্ল ও অকৃষ্ণ কর্ম অনুষ্ঠিত না হয় ততক্ষণ মানব-দেহের সার্থকতা সম্পন্ন হয় না। পুণ্য বা পাপের জন্য নরদেহ গ্রহণ করা হয় নাই—পুণ্য-পাপের অতীত শুদ্ধ আত্মকর্মের জন্যই এ দেহধারণ করা হইয়াছে। যতদিন তাহা না হইবে ততদিন লোকে লোকান্তরে ভ্রমণ করিলেও স্থূল মানবদেহের প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না।

মনুষ্যদেহই কর্মানুযায়িনী গতির সূত্র। এইখান হইতে উর্দ্ধেও যাওয়া যায়, অধঃতেও যাওয়া যায়, বিশ্বের সর্বত্র যাওয়ার পথ পাওয়া যায়। আবার ভাগ্য থাকিলে এইখান হইতেই কর্ম প্রভাবে এমন পথ পাওয়া যায় যাহা আশ্রয় করিলে আত্মজ্ঞানের বিকাশ হইয়া পূর্ণত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায়।

"যোনেঃ শরীরম্"—যোনি হইতে শরীর উদ্ভুত হয়। নরযোনি শ্রেষ্ঠ যোনি—নরদেহ শ্রেষ্ঠ দেহ। এই দেহ একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ। যাহা কিছু বাহ্য জগতে আছে তাহা সবই মানুষের দেহে আছে। অতি গভীর পাতাল-রাজ্যের নিম্নস্থ গাঢ়তম অন্ধকার হইতে উর্দ্ধতম মহাব্যোমের পরিস্ফুট চিদালোক পর্যন্ত এই দেহে বিরাজ করিতেছে—কিছুরই অভাব নাই। পৃথিবীর দেহ মাটির দেহ, তাহা সত্য, তথাপি ইহাতে প্রকৃতির সকল তত্ত্বই নিগূঢ়ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। আত্মার বা পুরুষের ভোগ সেবার জন্য এবং কর্মের জন্য যাহা আবশ্যক সবই দেহে খুঁজিয়া পাওয়া যায়। দেহকে ক্ষেত্র বলা হয়—কারণ মন ও প্রাণের দ্বারা ইহাকে যথাবিধি কর্ষণ করিয়া ইহাতে গুরুদত্ত বীজ বপন করিতে পারিলে ইহা হইতে কল্পবৃক্ষের উৎপত্তি হয় যাহা যথাসময়ে অমৃত ফল প্রসব করে।

চেতন ও অচেতন উভয় সত্তার সংঘর্ষে দেহ উৎপন্ন হয়। লিঙ্গ ও যোনির পরস্পর সন্নিকর্ষ হইতে ইহা জাত হয়। লিঙ্গ অলিঙ্গের চিহ্ন মাত্র। মহালিঙ্গ ও মহাযোনি মূলতঃ

এক হইলেও ব্যক্তভাবে লিঙ্গে ও যোনিতে তারতম্য আছে এবং তারতম্যমূলক ক্রমিক উৎকর্ষসম্পন্ন ৮৪ লক্ষ স্তর ও তদনুরূপ ৮৪ লক্ষ দেহ বিদ্যমান আছে। বিশুদ্ধ অহংভাবের বিকাশের জন্য প্রকৃতি বিশাল বিজ্ঞানশালাতে এই বিবর্তনের কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। মূল অব্যক্ত সত্তা হইতে শক্তির স্পন্দনে অন্নময় সত্তার আবির্ভাব হয়। অন্নময় সত্তা হইতে প্রাণময় সত্তার বিকাশ ও প্রাণময় সত্তা হইতে মনোময় সত্তার অভিব্যক্তি এই বিবর্তনের অন্তর্গত। সঙ্গে সঙ্গে দেহেরও ক্রমবিকাশ জানিতে হইবে।

মানবদেহের বিকাশের পূর্বে পর্য্যন্ত প্রাকৃতিক প্রেরণা হইতেই আপনা আপনি বিকাশ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। "God made man after His own image" যে বলা হয় তাহার তাৎপর্য্য এই যে মনুষ্যদেহই ভগবৎ স্বরূপের প্রতীক বা আভাস। মনুষ্যত্বের পূর্ণতা হইতেই পূর্ণ ভগবত্তার অভিব্যক্তি হয়। নররূপী আধার ভিন্ন অন্য কোন আধারে অর্থাৎ পশু আদির আধারে দিব্যশক্তির আবির্ভাব সম্ভবপর নহে। অবতারাদির ব্যাপারে অন্যরূপ। ভক্ত রামপ্রসাদ যাহাকে কৃষিকার্য বলিয়াছেন তাহা একমাত্র এই নরদেহেই সম্ভবপর হয়, কারণ এই দেহেই অহংভাবের প্রথম স্ফূর্তি হয় এবং এই দেহেই অহংভাবের পূর্ণতা সিদ্ধ হয়। সমস্ত জড় ও জীব জগতের সমষ্টি সত্তা ঘনীভূত হইয়া মানবদেহ রচিত হয়। মনের ও অহংভাবের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে বাক্‌শক্তি বৈখরীরূপে এই দেহেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। বলা বাহুল্য, ইহাই প্রজ্ঞার বীজ। বর্ণাত্মক শব্দের ক্রিয়া এবং বর্ণাত্মক শব্দের বিলয়ন ব্যাপার উভয়ই এই দেহেই হইয়া থাকে। নাদ ও জ্যোতি যে বিন্দু হইতে ফোটে তাহার প্রথম সূচনা মানবদেহেই পাওয়া যায়। এই দেহেই বন্ধন বোধহয় বলিয়া এই দেহেই মুক্তি সম্ভবপর। কুণ্ডলিনীর স্থিতি এই দেহেই আছে। সুষুম্না নাড়ী ও ষট্‌চক্রের অবস্থান মানবেতর যোনিতে যথাবৎ পাওয়া যায় না। ব্রহ্মচর্য্যের অভ্যাস অন্য দেহে সম্ভবপর নয়। জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি পশু প্রভৃতিতেও হইয়া থাকে, কিন্তু তুরীয় ও তুরীয়াতীত একমাত্র মানবেই সম্ভবে। এইজন্য কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিরূপ যোগের অভ্যাসও শুধু এই মানব-দেহেই হইতে পারে।

প্রকৃত দিব্যদেহ যাহা তাহা মানবদেহেরই বিকাশ মাত্র। মানবদেহই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে ভগবদ্‌দেহরূপে পরিণত হইয়া থাকে। এই পরিণতি-সাধনে যে উপায় অনুসৃত হয় তাহারই নাম কর্ম্ম।

দেহে চৈতন্য ও জয় সত্তা মিলিতভাবে বিদ্যমান। মানবেতর দেহেও যেমন, মানবদেহেও ঠিক তেমনি। কিন্তু নিম্নদেহে অহং-ভাবের অবয়বরূপ রশ্মিপুঞ্জ ক্রমবিকাশের নিয়মে পরিস্ফুট হয় না। এই সকল রশ্মি দেহস্থ কমলের দলে আপন

স্বরূপ প্রকটিত করে। এই সকল বিকীর্ণ রশ্মিকে পৃথক্ পৃথক্ ফুটাইয়া একত্র করিতে পারিলেই জ্ঞানজ্যোতির বিকাশ হয় ও দিব্যনেত্র উন্মীলিত হয়। ষটচক্রভেদের ইহাই তাৎপর্য্য। আভাস অহং ক্রমশঃ বিশুদ্ধ অহংএ পূর্ণতা লাভ করে। মানবজীবনের সফলতা তাই আত্মসাক্ষাৎকার প্রাপ্তি বলিয়া জানিতে হইবে।

রশ্মিসকল মানবদেহে তেজঃ ও কায়াগ্নিরূপে জাগ্রত হয়। পূর্ণভাবে জাগিলে ইহারাই সম্মিলিতভাবে ঋষিগণের বর্ণিত ব্রহ্মচর্চাস্বরূপে উপলব্ধ হয়। বিজ্ঞানবিৎ যোগিগণ ইহাকে তাড়িত শক্তি বা বিদ্যুৎ নামে অভিহিত করেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে মানবদেহে সকল তত্ত্বই বিদ্যমান আছে। আপাততঃ ৩৬ তত্ত্ব না ধরিয়া প্রচলিত ২৪, ২৫ বা ২৬ তত্ত্বই ধরা যাউক। তবে ইহাদের মধ্যে পার্থিব দেহে পৃথিবী তত্ত্বের প্রাধান্য আছে। বলা বাহুল্য, পঞ্চভূতই স্থূল দেহের উপাদানরূপে বিদ্যমান থাকিলেও পার্থিব দেহে পৃথিবীরই প্রাধান্য। পৃথিবীর অংশ অন্যান্য ভূত বা তত্ত্বের অংশের সহিত মিলিতভাবে বিদ্যমান আছে। এই মিলনের বা সংঘাতের মূলে আছে সংস্কারোপহিত শক্তিরূপী চৈতন্যের সংহনন শক্তি। চিৎ ও অচিতের মিলনেই সৃষ্টি—ইহা মনে রাখিতে হইবে। যোগী বা কর্মী যখন আত্মকর্মে প্রবৃত্ত হয় তখন তাহার ক্রিয়মাণ কর্মের প্রভাবে এই সংঘাতটি ভাঙ্গিয়া যায়—অবশ্য ক্রমশঃ। ফলে চৈতন্যাংশ মুক্ত হয় ও জড়াংশ পৃথক হয়। এই পৃথক্করণ্টি বিবেকের ক্রিয়া।

দুগ্ধ বা দধি মন্থন করিলে যেমন মাখন উত্থিত হয়, যেমন গম ভাঙ্গিলে তাহা হইতে আটা বাহির হয়, তিল ও সর্ষপ ঘানিতে পিষিলে যেমন তৈল বাহির হয়, তদ্রূপ কর্মরূপে পৃথক্ হয়। ক্রমশঃ জলীয় ও অন্যান্য ভৌতিক অংশ হইতেও সত্ত্বাংশ পৃথক্ হইয়া যায়। স্থূলদেহের সমস্ত সত্ত্বাংশ যতক্ষণ পৃথক্ না হয় ততক্ষণ মন্থন-ক্রিয়ার প্রয়োজন থাকে। তাহার পরে আর ঐ ক্রিয়া আবশ্যক হয় না। তিলে যে পরিমাণ তৈল নিহিত থাকে তাহার সবটুকু বাহির হইলে আর পেষণের প্রয়োজন থাকে না কারণ অবশিষ্টাংশ তৈলহীন অসার পিণ্ড মাত্র। তদ্রূপ স্থূলদেহের ক্রিয়ার অবসান স্বভাবতঃই হইয়া থাকে। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। অনন্তকাল বিবেকক্রিয়া চলে না। বিবেকমূলক জ্ঞানের উদ্ভব হওয়াই কর্মের উদ্দেশ্য।

ঐ উদ্‌ভূত তেজঃ বা শক্তি স্থূল দেহের অন্তঃস্থ অপঞ্চীকৃত ভূত ও অন্যান্য তত্ত্বের অভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বিগলিত করে স্থায়ী আকারে পরিণত করে। সূক্ষ্ম দেহের অবয়ব—কিন্তু ঐ সকল তত্ত্ব হইতে স্থায়ী আকার গঠন এতদিন হয় নাই। তাই প্রকৃত সূক্ষ্মদেহ সাধকের ততদিন প্রাপ্তি ঘটে না যতদিন তাহার স্থূল দেহের কর্মের অবসান না হয়। ঐ সকল তত্ত্ব উপাদান হিসাবে প্রতি মানবেই আছে এবং

নিজ নিজ কার্য করিতেছে, কিন্তু স্থায়ী দেহরূপে কার্য করে না। দেহরূপে উহারা যখন পরিণত হয় তখন স্থূল দেহরূপে কার্য করে না। দেহরূপে উহারা যখন পরিণত হয় তখন স্থূল শরীরের অভিমানী পুরুষ স্থূলে অভিমান রহিত হইয়া ঐ সূক্ষ্ম শরীরে অভিমানী হয় ও আপন ইচ্ছানুসারে স্থূল পিণ্ড ত্যাগ করিয়া বাহির হইতে পারে ও ফিরিতে পারে। যোগী ভিন্ন সাধারণ মানুষ ইহা পারে না। তাহার একমাত্র কারণ, স্থায়ী রচনারূপে সূক্ষ্ম শরীর তাহার নাই ও তাহাতে তাহার অভিমানও ক্রিয়াশীল নহে। প্রকৃতির নিয়মে ও প্রেরণাতে সূক্ষ্মাদি অবস্থাতে সকলেরই সূক্ষ্ম শরীরের গতি ও সঞ্চরণ দৃষ্ট হয়, ইহা সত্য। কিন্তু তাহা বাসনাদিবশতঃ প্রকৃতির প্রভাবে হয়, স্বেচ্ছাতে হয় না। পূর্বে যাহা বলা হইল তাহা সম্পন্ন হইলে স্বেচ্ছাতে যেমন স্থূল জগতে স্থূল দেহ লইয়া ব্যবহার করা যায়, তদ্রূপ নিজের ইচ্ছানুসারে সূক্ষ্মদেহ লইয়া বিচরণ করা যায়।

অনাত্মাতে আত্মবোধরূপ অভিমান যখন স্থূল শরীর অবলম্বন করিয়া কার্য করে তখন এই অভিমান হইতেই স্থূল দেহের কর্ম প্রসূত হয়। কিন্তু যখন পূর্বলিখিত নিয়মে একদিকে স্থূল দেহের কর্ম সমাপ্ত হইবে ও অপরদিকে স্থায়ী সূক্ষ্মদেহ সূক্ষ্ম সত্তার উপাদানে অভিব্যক্ত হইবে তখন ঐ অভিমান স্বভাবতঃ স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম দেহকে আশ্রয় করিবে। তখন ঐ সূক্ষ্ম দেহকেই 'আমি' বলিয়া মনে হইবে ও স্থূলদেহে 'আমি-বোধ' আভাসমাত্র হইয়া যাইবে। কারণ স্থূলদেহ চৈতন্যের অপগমের ফলে তখন শববৎ হইবে। অভিমানশীল সূক্ষ্মদেহ তখন এই শববৎ স্থূলদেহকে নিজের অধীন করিয়া আসনে পরিণত করিবে। ইহাই প্রকৃত শবাসন—পূর্ণ যোগীর যোগ-ক্রিয়ার পরিপুষ্টির জন্য এই আসনই উপযোগী হয়। তখন স্থূল-নিরপেক্ষ অথচ শবাসনীকৃত স্থূলে অধিষ্ঠিত সূক্ষ্ম দেহে কর্ম আরম্ভ হয়।

যদি প্রারব্ধ ভোগ পূর্বেই সমাপ্ত হইয়া যায় ও স্থূল দেহের কর্মসমাপ্তির পূর্বেই স্থূল দেহের অন্ত ঘটে তাহা হইলে অবশিষ্ট কর্ম করিবার জন্য মৃত্যুর পর আবার স্থূলদেহ গ্রহণ করিতে হয়। বলা বাহুল্য আত্মকর্মই এখানে কর্ম শব্দের লক্ষ্য। আত্মকর্ম না হইয়া অন্য কর্ম হইলে সুখ দুঃখ ভোগের জন্য পুনঃ পুনঃ জন্মান্তরের আশঙ্কা থাকে। পক্ষান্তরে যদি কাহারও স্থূল কর্মের শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রারব্ধও সমাপ্ত হয় ও তাহার ফলে স্থূলদেহ ত্যাগ হয়, তাহা হইলে উহাকে শবাসনরূপে পরিণত করিবার ও তাহাকে অধিষ্ঠান করিয়া সূক্ষ্মদেহে কর্ম করিবার সুযোগ এ জীবনে ঘটে না।

স্থূল কর্ম প্রভাবের যেমন স্থূল ভৌতিক সত্তা হইতে চৈতন্যের নিস্কর্ষ হয় ও সেই চৈতন্য-শক্তিরূপী অগ্নির তাপে সূক্ষ্ম সত্তা বিগলিত হইয়া আকার ধারণ করে ও

স্থায়ীরূপে পরিণতি লাভ করে, তদ্রূপ সূক্ষ্মদেহে অভিমান উদয়ের পরে সূক্ষ্মদেহে অনুষ্ঠিত কর্মের প্রভাবে সক্ষ্ম সত্তাতে নিহিত অবিবিক্ত চৈতন্যশক্তির বিবেচন হয় ও সেই চৈতন্যশক্তি পুর্বোক্ত পদ্ধতিতে উত্থিত হইয়া কারণ সত্তাকে বিগলিত করে; যাহার ফলে কারণ সত্তা প্রকৃত কারণ দেহরূপে পরিণত হয়। যতদিন সূক্ষ্ম সত্তা হইতে তন্নিহিত সমগ্র চৈতন্য বা তেজঃ সমাহৃত না হয় ততদিন সূক্ষ্ম দেহের কর্মের অবসান হয় না। মৃত্যুর পূর্বে যদি সূক্ষ্ম দেহের দ্বারা অনুষ্ঠেয় আত্মকর্ম পরিসমাপ্ত হয় তাহা হইলে সূক্ষ্ম দেহটিও পূর্ববৎ স্থূলের ন্যায় শবরূপে পরিণত হয় ও অভিমান সূক্ষ্মকে ত্যাগ করিয়া কারণদেহকে আশ্রয় করে। 'আমি'টি তখন কারণদেহকে আশ্রয় করিয়া স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুইটি শবাসনের উপর অধিষ্ঠিত হয় ও কারণদেহের কর্ম পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। সূক্ষ্মদেহের কর্ম এক আসনের কর্ম, কিন্তু কারণদেহের কর্ম দুই আসনের কর্ম।

কিন্তু যদি সূক্ষ্মের কর্ম পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই মৃত্যু ঘটে তাহা হইলে কারণ দেহের অনুষ্ঠেয় কর্ম অনারব্ধ থাকিয়া যায়। স্থূল দেহের কর্ম পূর্ণ না হইয়া দেহপাত হইলেও তদ্রূপ সূক্ষ্মের কর্ম অনারব্ধ থাকে। স্থূলাভিমান থাকিতে থাকিতে স্থূলকর্মবন্ধ হইলে আবার স্থূলকে গ্রহণ করিবার জন্য মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিতে হয়। কিন্তু স্থূলাভিমান নিবৃত্ত হওয়ার পর বা সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ঘটিলে সাধারণতঃ মাতৃগর্ভে আসিবার প্রয়োজন হয় না। তখন স্থূলদেহ শবাসনে উপবিষ্ট হইয়াছে। তাই ঐ মৃত্যু প্রকৃত মৃত্যু নহে। সূক্ষ্মাভিমানী শবীভূত স্থূলে উপবিষ্ট যোগী তথাকথিত মৃত্যুর পরেও আসন ত্যাগ করে না—সূক্ষ্ম শরীরে থাকিয়া সে কার্য্য করিতেই থাকে। তাহার কর্মে বাধা হয় না। তবে জীবিত অবস্থাতে থাকিয়া কর্ম করিতে পারিলে কর্ম সমাপ্ত হয় অল্প সময়ে কারণ ঐ কর্ম কালের কর্ম। উহা ক্ষিপ্র গতিতে অগ্রসর হয়। কিন্তু স্থূল কর্ম সমাপ্ত না করিয়া মৃত্যু ঘটিলে শবাসন লাভ হয় না বলিয়া পুনরায় মাতৃগর্ভে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হয়। অন্য কোন উপায় নাই। অন্ততঃ একটি শবাসন লাভ করিতে পারিলেও যোগী আসনে বসিতে পারে বলিয়া গর্ভযন্ত্রণা ও কালরাজ্যে প্রবেশের উপদ্রব হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে। মৃত্যুর ভিতর দিয়াই অমরত্বের মার্গ রহিয়াছে জানিতে হইবে। পশুর মৃত্যুতে অমরত্ব আসে না—পশু "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি", পুনঃ পুনঃ জঠর-যন্ত্রণা ভোগ তাহার পক্ষে অনিবার্য। কিন্তু স্থূলদেহের আবশ্যকীয় কর্ম পূর্ণ করিতে পারিলে ও স্থূলদেহকে শবরূপে আসন করিয়া নিজে তাহাতে অধিষ্ঠিত হইতে পারিলে জন্ম-মৃত্যু বর্জ্জিত হইয়া যায়। কিন্তু কর্মের পূর্ণতা হয় নাই বলিয়া কর্ম বর্জ্জিত হয় না, মহাজ্ঞানও আসেন না। আপেক্ষিক খণ্ড জ্ঞান অবশ্য আসে।

প্রশ্ন হইতে পারে—যোগী তখন কোথায় ও কি ভাবে থাকিয়া কর্মের ক্রমিক বিকাশ সম্পন্ন করেন? এই প্রশ্নের বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নহে। তবে এই স্থানে ইহাই বলিয়া রাখি যে আত্মকর্মের গতিরোধ হয় না ও একবার শবাসন প্রাপ্ত হইলে জন্ম-মৃত্যুর অতীত, কালের অতীত, নির্মল ভূমিতে যোগী আত্মকর্ম পূর্ণ করিতে থাকেন। তবে ঐ কর্ম পূর্ণ করিতে সময় অধিক লাগে। কালের রাজ্যে বিকাশ যত দ্রুত হয় অমর দেহ তত দ্রুত হইবার সম্ভাবনা নাই।

যাহা হউক, আমাদের লক্ষ্য বর্তমান জীবনে কর্ম সমাপ্ত করা ও অভিনব অনন্ত কর্মের ধারাতে প্রবেশ করা। প্রকৃতি হইতে পুরুষকে পৃথক করিয়া প্রকৃতি জন্য কারণদেহ পর্যন্ত আয়ত্ত করিতে না পারিলে এই মহালক্ষ্যে উপনীত হইবার আশা নাই। অভিমান কারণদেহকে আশ্রয় করিয়া কারণদেহে কর্মের সূচনা করে। সূক্ষ্মের কর্ম শেষ হওয়ার পর ও সূক্ষ্মদেহ শবাসন হইয়া কারণে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর যোগী কারণদেহকেই আশ্রয় করিয়া 'আমি' বলিয়া নিজেকে অনুভব করেন। আত্মকর্ম চলিতেই থাকে এবং কারণ সত্তা বা মূল প্রকৃতিতে নিহিত গুপ্ত চৈতন্য বিবিক্ত হইতে থাকে। যখন প্রকৃতিরূপা কারণসত্তা হইতে চিৎশক্তি বিবিক্ত হয় তখন যোগীকে একটি অনির্বচনীয় স্থিতির সম্মুখীন হইতে হয়। এই অবস্থাতেই জীবাত্মা বা পুরুষের স্বরূপ-জ্ঞান জাগে। পুরুষ যে চতুর্বিংশ তত্ত্বময়ী প্রকৃতি হইতে বিবিক্ত তাহা তখন স্বচক্ষে দর্শন হয়। এই সময় যদি পরমেশ্বরের মহাকৃপা লাভ না ঘটে তাহা হইলে পুরুষ এই স্বরূপ-জ্ঞানে প্রকাশমান নিজ সত্তাতে স্থিত হয় ও কৈবল্য লাভ করে। মায়াতেও প্রায় এই জাতীয় অবস্থারই উদয় হয়। দুই আসনের ক্রিয়ার ফলে এই পর্যন্ত সিদ্ধি ঘটে।

কিন্তু ইহাকে আমি মহাসিদ্ধি বলি না—যদিও ইহাও কম নহে। প্রকৃতি হইতে পৃথক হইলেই তো চলিবে না—প্রকৃতিকেও, ঠিক প্রকৃতিকে নহে কিন্তু কারণ দেহকেও, আসন করিতে হইবে। তাহা না করিতে পারিলে প্রকৃতিমুক্ত পুরুষের কৈবল্যই প্রাপ্তি।

কারণ দেহকে আসন করিতে হইলে অভিমানকে বিসর্জ্জন না করিয়া জাগাইয়া রাখিতে হয়। এক হিসাবে দেখিতে গেলে অভিমানের পূর্ণাহুতির সময় আসিয়াছে—স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ—তিন দেহ রচিত হইয়াছে, তিন দেহেই অভিমান সমভাবে কার্য্য করিয়াছে, ফলে তিন দেহেরই কর্ম সমাপ্ত হইয়াছে। তাই প্রকৃতির কর্ম সমাপ্ত হইয়াছে এবং চতুর্বিংশতি তত্ত্বের সহিত সংকীর্ণভাবে অবস্থিত বদ্ধ চিৎসত্তা মুক্ত হইয়া স্বয়ং পুরুষরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—সুতরাং কর্মের ফলে জ্ঞান বা আত্মজ্ঞান উদিত হইয়াছে। এখন কৈবল্য স্বতঃপ্রাপ্ত—আর তাহাতে অভিমানের স্থান নাই, প্রয়োজনও নাই। কারণ, করণীয় কর্মও আর অবশিষ্ট নাই। তাই ইহাই অভিমানের পূর্ণাহুতির সময়।

কিন্তু মহাযোগী এখানেও শেষ দেখেন না। পূর্ণ[illegible] অভিমানের হয় বটে, কিন্তু অগ্নি নির্বাণ হয় না। অথবা নির্বাণের মধ্যেও অনির্বাণ অগ্নি জাগাইয়া রাখা হয়— তদ্রূপ অভিমান সমাপ্ত হইলেও একটি বিশুদ্ধ অভিমানরূপে তাহাকে রাখা হয়। কারণ, মহাকর্ম তো বাকী আছে।

অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ সত্ত্বরূপী নির্মল সত্তাতে ঐ অভিমানের যোগ হয়। বলা বাহুল্য, পুরুষ এখন পরমপুরুষ বা মহাপুরুষ পদে অভিষিক্ত। প্রকৃতির কর্ম শেষ করিয়া তিনটি শবাসনের উপরে আসীন হইয়া যোগী বিশুদ্ধ সত্ত্বময় আধারে স্থিত হইয়াছেন। ঐ আধারটি তখন মহাকারণদেহরূপী জানিতে হইবে। এইটি যোগীর বিশুদ্ধ অভিমান বা আমিত্ব। এই আসনে আসীন হইয়াই যোগী বিশ্বকর্মের মহাক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হন।

তখন তাঁহার ব্যক্তিগত প্রয়োজন থাকে না—সমস্ত জীব জগতের প্রয়োজনই তখন তাঁহার প্রয়োজন। ভগবান্ ব্যাসদেব যোগসূত্রের ভাষ্যে ঈশ্বর সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"তস্য আত্মানুগ্রহাভাবেঽপি ভূতানুগ্রহ এবং প্রয়োজনম্"। তাঁহার একমাত্র প্রয়োজন ভূতানুগ্রহ—জীবের কল্যাণ সাধন,—অন্য কোন প্রয়োজন তাঁহার নাই। যোগীও তখন বিশুদ্ধসত্ত্বময় আধারে স্থিত হইয়া ভূতানুগ্রহ বা জীবসেবাতে নিরত হন। ইহাই পরার্থ কর্ম। গীতাতে ভগবান্ বলিয়াছেন—"উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম চেদহম্"—ইহা সেই জাতীয় কর্ম।

এইখানে একটি গভীর রহস্যের কথা বলা আবশ্যক। মনুষ্য জীবিত অবস্থায় যদি এই ভূমি পর্য্যন্ত উত্থিত হইতে পারে অর্থাৎ তিন আসনের কর্ম সম্পন্ন করিতে পারে অথবা প্রকৃতির চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হইতে চৈতন্য সত্তাকে পৃথক করিয়া প্রকৃতিকে ও মায়াকে স্বায়ত্ত করিয়া বিশুদ্ধ অভিমান সহকারে মহামায়ার মুক্তক্ষেত্রে আধিকারিক পুরুষরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে সমর্থ হয় তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রভাব বিশ্বসংসার অনুভব করিয়া ধন্য হয়। তাহার প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত দেহ তখন এক হয়— উহাই মহাসিদ্ধ দেহ নামে পরিচিত হয়।

প্রকৃতির বিজ্ঞানশালাতে এক বিরাট অনুষ্ঠানের আয়োজন চলিতেছে। বাহ্য জগৎ তাহার কোনও সন্ধান রাখে না, রাখিতে পারেও না।

আমরা যাহাকে মৃত্যু বলিয়া থাকি তাহা অনেক নীচের ব্যাপার। কিন্তু নীচের হইলেও অপরিহার্য্য। স্থূলদেহ হইতে মানবের সূক্ষ্মদেহ হইতে মানবের সূক্ষ্ম সত্তা পৃথক হইলেই আমরা তাহাকে মৃত্যু বলিয়া বর্ণনা করি। কিন্তু যদি স্থূলের কর্ম অর্থাৎ স্থূলযোগ্য আত্মকর্ম সমাপ্ত হইবার পূর্বে এই ঘটনা ঘটে তাহা হইলে জীবকে অবশিষ্ট আত্মকর্ম করিবার জন্য পুনরায় স্থূলদেহ গ্রহণ করিতে হয় বা জন্ম নিতে হয়। যতদিন

আত্মকর্ম পূর্ণ না হইবে ততদিন এইরূপই চলিবে। কারণ স্থূল মানবদেহ ধারণ ব্যতীত আত্মকর্ম করার উপায় নাই। অজ্ঞানজ কর্মের ফলে যদি শুদ্ধ বা মলিন ভোগদেহের প্রাপ্তি ঘটে তবে উহা কালক্ষেপ জানিতে হইবে। কারণ মানব দেহ হইতে একবার চ্যুত হওয়াও অত্যন্ত দুর্ভাগ্য—যেহেতু উহা ক্রম-বিকাশের পথে মহা অন্তরায়। মানবদেহে শুধু প্রারব্ধ ভোগ না হইয়া যদি অজ্ঞানবশে নবীন কর্ম উদ্ভূত হয় তাহা হইলেও উহা সঞ্চিত কর্মের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয় এবং উহা নিয়ত-বিপাক হইলেও ভাবী প্রারব্ধের রচনাতে অঙ্গীভূত হইলে বিপচ্যমান হইয়া অনুরূপ সুখ-দুঃখরূপ ভোগদানের জন্য ব্যাপৃত হয়। ইহা কর্ম-জগতের দৈনন্দিন ব্যাপার। ইহার আলোচনা এই স্থলে অপ্রাসঙ্গিক।

যদি স্থূলের আত্মকর্ম পূর্ণ হয়, তৎক্ষণেই প্রারব্ধ ভোগও পূর্ণ হয় বলিয়া মৃত্যু ঘটে এবং ঐ অবস্থাতে স্থূল দেহকে শবাসন করিবার অবসর না পাওয়া যায় তাহা হইলে খাঁটি সূক্ষ্ম শরীর রচিত হইয়াছে (স্থূলের আত্মকর্ম দ্বারা) বলিয়া মানুষ ভৌতিক সত্তার উর্দ্ধে কৈবল্য লাভ করে। তাহাকে আর ভৌতিক জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। কিন্তু তখন এই অসুবিধা থাকে যে আসন প্রাপ্তির অভাবে পরলোকে নিরালম্ব অবস্থা হয় বলিয়া নিষ্ক্রিয় ভাব থাকে—সূক্ষ্মদেহোপযোগী আত্মকর্মের সূত্রপাত হয় না। কৈবল্য হইলেও ইহা ঠিক কৈবল্য নহে, কারণ লিঙ্গ বা সূক্ষ্মদেহ বিদ্যমান থাকে—শুধু কর্ম করিতে পারে না মাত্র। সে স্থুল জগতে আসে না—তাই সে এক হিসাবে মৃত্যু বর্জিত। কিন্তু তাহারও ভাবী মৃত্যু আছে। কারণ সূক্ষ্মদেহ যখন আছে তখন তাহার কর্মও কখন না কখন করিতেই হইবে এবং পরে তাহারও বর্জ্জন হইবে (যদি দ্বিতীয় শবাসন করিতে না পারা যায়)। সূক্ষ্ম দেহের মৃত্যুও মৃত্যু বটে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে স্থূলের আত্মকর্ম সমাপ্ত ও প্রারব্ধভোগ সমাপ্ত হওয়ার পর অভিমান সূক্ষ্মে যোজিত হইয়া স্থূলকে শবরূপী আসনে পরিণত করিতে পারিলে ঐ পূর্বোক্ত নিরালম্ব অবস্থার নিষ্ক্রিয়ত্ব ঘটে না। কারণ তখন আসন লাভ হইয়াছে ও কর্ম আরব্ধ হইয়াছে। ইহারই অন্য অমল ভূমির দ্বার মুক্ত হয়—সেখানে কর্মের ক্রমোন্নতি ঘটে। তবে তাহা দীর্ঘকালের ব্যাপার। কারণ কালের প্রভাবে বাহিরে অমর জগতে কর্ম ক্ষিপ্রগতিতে অগ্রসর হয় না।

স্থূল শরীর সাধারণতঃ প্রারব্ধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রারব্ধ অতি জটিল তত্ত্ব—বারান্তরে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতে অবসর নিবার ইচ্ছা আছে। কর্ম, অনুগ্রহ, সংস্কার (প্রাক্তন) প্রভৃতি বহু বিভিন্ন শক্তির একত্র সংগঠনে প্রারব্ধ রচিত হয় এবং ইচ্ছার উৎকটতা হইতে উহার সৃষ্টি হয়। তাই এক দৃষ্টিতে আয়ু নিয়ত বলিয়া অকাল মৃত্যু নাই—ইহা সত্য ; আবার আয়ুর বৃদ্ধি-হ্রাস উভয়ই সম্ভবপর—ইহাও সত্য। এই

বৃদ্ধি-হ্রাস শক্তির সংযমের বা অপচয়ের ফল হইতে পারে—অথবা বাহির হইতে শক্তির অনুপ্রবেশাদি কারণ হইতেও হইতে পারে।

যে কোন কারণেই হউক এই দেহটি বজায় থাকিতে থাকিতেই যোগী নিজের সমস্ত আত্মকর্ম সমাপ্ত করিতে ইচ্ছা করেন। এই দেহ থাকিতেই যদি ভৌতিক দেহকে শব করিয়া নিজে সূক্ষ্ম শরীরে—তাহা আভাসময় ভাবদেহই হোক বা জ্ঞানদেহই হোক—অভিমান করিয়া সূক্ষ্মের আত্মকর্ম করা যায় তাহা হইলে এই দেহে থাকিয়াও অমল ভূমিতে অবস্থান করা যায়। তবে নিম্নস্তরে।

জ্ঞানগঞ্জের তত্ত্ব আলোচনা-প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে নিজের অনুভব ও বোধ অনুসারে অমল ভূমির রহস্যের সম্মুখীন হইতে চেষ্টা করিব। গুপ্ত রহস্যের উদ্‌ঘাটন ব্যক্ত জগতে অসম্ভব। তবে অধিকারিগণের কৃপা হইলে কাহারও কাহারও ভিতরে মহালোকের ক্রিয়াতে কিছু কিছু প্রকাশের খেলাও ঘটিতে পারে।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে মাতৃ-গর্ভ হইতে সঞ্জাত স্থূল দেহই কর্মদেহ। মনুষ্য যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই দেহ ধারণ করিয়া থাকে ততক্ষণেই সে কর্ম করিতে সমর্থ হয়। এই দেহ না থাকিলে কর্ম করা যায় না। কর্মফল ভোগ মাত্র ভোগদেহে হইয়া থাকে। কর্ম কি এবং তাহার ফল কি প্রকার, ইহার আলোচনা আংশিকরূপে আমরা পূর্বে করিয়াছি। অনাত্ম-কর্মকে এই প্রসঙ্গে কর্মরূপে গণনা করা হয় নাই। অনাত্মা-কর্ম অজ্ঞান অবস্থায় হইয়া থাকে এবং উহার সংস্কারনিবন্ধনকে যে সুখ দুঃখরূপ ফল উদ্ভুত হয় তাহা ভোগ করিবার জন্য উর্দ্ধলোক, অধোলোক অথবা মুনষ্যলোকের মধ্যে কোন স্থানে তদনুরূপ দেহ গ্রহণ করিতে হয়। ভোগদেহ স্বর্গীয় হইতে পারে, নারকীয় হইতে পারে এবং পশু-পক্ষী প্রভৃতি অবচেতন জীবেরও হইতে পারে। তা ছাড়া, মুনষ্যের কর্মদেহেও ভোগানুভূতি হয় বলিয়া আংশিকরূপে মনুষ্যদেহও হইতে পারে। কিন্তু কর্মদেহ মনুষ্যদেহ ভিন্ন অন্য কোন দেহ হইতে পারে না। ইহা হইল অনাত্মকর্মের কথা। তদ্রূপ আত্মকর্মের উপযোগী দেহও একমাত্র মনুষ্যদেহই, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আত্মকর্মের দ্বারা আত্মিক স্থিতির উৎকর্ষ-সাধন ঘটিয়া থাকে। তীব্রতা অনুসারে কর্মকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। আত্মকর্ম ততক্ষণ পর্যন্ত সম্পন্ন হইতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত দেহে চৈতন্য শক্তির উন্মেষ না হয়। প্রতি মনুষ্যদেহে এই শক্তি কুলকুণ্ডলিনী নামে নিহিত রহিয়াছে। যতক্ষণ এই শক্তির উন্মেষ হইয়া শিবত্বের অভিব্যক্তি না ঘটে ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ মনুয্যাকারসম্পন্ন হইয়াও প্রকৃতিতে পশু ভিন্ন অপর কিছু নহে। পশুত্ব-নিবৃত্তির একমাত্র উপায় কুণ্ডলিনীর উদ্বোধন এবং শিব-ভাবের বিকাশ। কিন্তু এই উদ্বোধন সকলের সমান মাত্রাতে হয় না। অনেকের এই

উদ্বোধন হয়ই না—তাহাদের বিষয় বর্তমান প্রসঙ্গে আলোচ্য নহে। কিন্তু যাহাদের কুণ্ডলিনী উদ্বুদ্ধ হয় তাহাদেরও সকলের জাগরণের মাত্রা সমান নহে বলিয়া সকলকে এক শ্রেণীতে নিবেশ করা চলে না। সদ্‌গুরু সাক্ষাৎ ভগবৎ শক্তিসম্পন্ন হইলেও শিষ্যের আধারের বলবত্তার উপর তাঁহার সঞ্চারিত শক্তির ফল-প্রকাশ নির্ভর করে। যে আধারে যে পরিমাণ শক্তি ধারণা সম্ভবপর সদ্‌গুরু সেই আধারে তাহার অধিক শক্তির সঞ্চার করেন না এবং তদ্ অপেক্ষা ন্যূন শক্তিরও সঞ্চার করেন না।

আধার দুর্বল হইলে কুণ্ডলিনীর উন্মেষ কিঞ্চিন্মাত্রাতেই হইয়া থাকে। তাহার পর সাধক স্বয়ং নিজকর্ম্মের দ্বারা ঐ উন্মেষের অগ্রগতি সম্পাদন করে। এই প্রকার ধীরে ধীরে সাধকের অন্তরে এবং বাহিরে উদ্বুদ্ধ চৈতন্যশক্তির বিকাশ ঘটিয়া থাকে। চৈতন্যশক্তির বিকাশের ফলে অনাত্মাতে আত্মভাব তো কাটিয়া যায়ই, বিশেষতঃ অত্মাতে আত্মাভিমানের পূর্ণ অভিব্যক্তির পথও খুলিয়া যায়। প্রকৃতি ও মায়া হইতে আত্মস্বরূপের বিবেকজ্ঞান উদিত হইলেই কর্ম সংস্কার নষ্ট হইয়া যায় এবং জন্ম-মৃত্যুর উর্দ্ধে নিত্য স্থিতি উপলব্ধি হয়। কিন্তু পশুভাবের বীজ তখনও থাকিয়া যায়। পশুভাব নিবৃত্ত না হইলে ভগবৎ স্বরূপে স্থিতি দুর্ঘট। সাধকের আত্মা পরমাত্মা হইতে অভিন্ন অথবা পরমাত্মার সনাতন অংশভূত এবং স্বরূপতঃ নিত্য দিব্য-ভাবাপন্ন—উহা পশু অবস্থায় নিম্নস্তরে এই সকল প্রাকৃতিক সূক্ষ্ম সংস্কাররাশির আবেষ্টনে আচ্ছন্ন হইয়া বদ্ধের ন্যায় বিদ্যমান থাকে। দিব্যজ্ঞানের উদয় এবং ক্রমিক বিকাশ হইলে ঐ সকল সংস্কারের নিবৃত্তি তো হয়ই, উপরন্তু মৌলিক পশুবীজও কাটিয়া যায়।

সাধক কর্ম্মদ্বারা গুরু হইতে প্রাপ্ত জ্ঞানাগ্নির স্ফুলিঙ্গকে নিজ সত্তায় সম্পূর্ণ ভাবে বিস্তারিত করে এবং এই বিস্তারের মাত্রা অনুসারে অজ্ঞানজ কর্ম্মসংস্কারগুলি নষ্ট হইতে থাকে। দেহ কর্ম্মসম্ভূত বলিয়া দেহে অবস্থিত কাল পর্যন্ত অজ্ঞান ও কর্মসংস্কার সম্পূর্ণ নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে সাধারণতঃ দেহপাত অবশ্যম্ভাবী। এইজন্য সাধকের পূর্ণ সিদ্ধি দেহে অবস্থানকালে হইতে পারে না—লেশমাত্র অবিদ্যা অথবা অজ্ঞান দেহাবস্থায় থাকিবেই থাকিবে। পূর্ণ নির্বিকল্পক স্থিতি প্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেহ-সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া যায় এবং আত্মা সর্ব সংস্কার-বর্জিত হইয়া চিদাকাশে নিজ স্বরূপে বিরাজ করে। ইহাকে কৈবল্য, অথবা বিদেহ কৈবল্য নামে কেহ কেহ বর্ণনা করিয়া থাকেন। যে সকল সাধক এই দেহে থাকিয়া দেহের কর্ম সম্পূর্ণ শেষ করিতে পারে না তাহাদের গতি বর্তমান প্রবন্ধে প্রদত্ত বিবরণ অনুসারে বুঝিয়া লইতে হইবে।

এই যে সাধনার ক্রম বলা হইল ইহা কিন্তু ইষ্ট সাধনারই ক্রম। কারণ সাধকের ইষ্টদেবতা কুণ্ডলিনী শক্তি ভিন্ন অপর কেহ নহে। সাধক যে নাম অথবা যে রূপই গ্রহণ করুন না কেন একমাত্র কুণ্ডলিনীই তাহার ইষ্ট। সিদ্ধাবস্থায় সাধ্য ও সাধকের

মধ্যে কোন ভেদ থাকে না, সাধকের আত্মা তখন ইষ্ট স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মায়ার আভাস ও সংস্কার নির্মোক হইতে চিরদিনের জন্য মুক্ত হইয়া যায়। নিজের ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয় না বটে, কিন্তু ব্যক্তিত্বের উপযোগী হয় না, কারণ ব্যাপক মহাসত্তার মধ্যে নিজের ব্যক্তিগত সত্তা তখন মগ্ন। ইহা নিরাকার নিষ্ক্রিয় চিদাত্মস্বরূপে অবস্থান।

কিন্তু, যে আধার অপেক্ষাকৃত সবল গুরুদত্ত অনুগ্রহ-শক্তির সঞ্চারের ফলে তাহার অগ্রগতি অন্য প্রকারে হয়। বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা এই জাতীয় আধার-বিশিষ্ট উপাসককে 'যোগী' বলিয়া বর্ণনা করিব। যোগীর আধার সাধকের আধার অপেক্ষা অধিক প্রবল বলিয়াই তাহার দেহে কুণ্ডলিনী শক্তির বিকাশ প্রারম্ভ হইতেই অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে।

সাধকের সাধনা যেখানে সমাপ্ত হয় যোগীর সাধনা বস্তুতঃ সেইখান হইতেই আরম্ভ হয়। এইজন্য সাধকের কর্ম ও যোগীর কর্ম প্রথম হইতেই পৃথক হইয়া থাকে। শুধু তাহাই নহে, ঐ কর্মের ফলও পৃথক। সাধকের কর্মের ফলে বিকল্পসমূহ অর্থাৎ বাসনা কামনাদি সংস্কার ও তাহাদের মূল বীজ নির্মল হইয়া চিদালোকে পরিণত হয়। তাহাদের বিরুদ্ধ ভাব কাটিয়া যায় এবং তাহাদের সত্তা চিত্ত সত্তার সঙ্গে একাকার হইয়া যায়। অতএব সিদ্ধাবস্থাতে দেহ মন প্রভৃতির সম্বন্ধশূন্য নির্বিকল্পক চিন্ময় আত্মা স্বরূপে স্থিতি সম্ভব হয়। কিন্তু যোগীর কর্মের ফল অন্য প্রকার। শুধু বিরুদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধতা পরিহারই যোগীর কাম্য নহে, কিন্তু বিরুদ্ধ শক্তি যাহাতে বিরোধ পরিহার করিয়া অর্থাৎ নির্মল হইয়া আত্মার স্বরূপ-শক্তিতে পরিণত হয় তাহাই যোগীর লক্ষ্য। অরি অরি-ভাব ত্যাগ করিয়া উদাসীন অথবা তটস্থ হইলেই সাধকের আত্মা নিজেকে মুক্ত বোধ করে। কিন্তু যোগী ইচ্ছা করে যে অরি অরি-ভাব ত্যাগ করিয়া যেন তটস্থ হইয়া না থাকে, কিন্তু তাহার মিত্ররূপে পরিণত হয়। শক্তি পরিহার করা ও শক্তিহীন অবস্থায় স্থিতি গ্রহণ করা যোগীর উদ্দেশ্য নহে। প্রাকৃত গুণ থাকিবে না ইহা সত্য, কিন্তু অপ্রাকৃত গুণের বিকাশ তো হওয়া চাই—ইহাই যোগীর উদ্দেশ্য। যোগী প্রবল শক্তিশালী বলিয়া তাঁহার ক্রিয়ার ফলে বহিরঙ্গ শক্তি তো থাকেই না, বরং অন্তরঙ্গ শক্তির রূপ ধারণ করিয়া যোগীর আত্মাকে বলশালী করে। সাধকের আদর্শ বিদেহ-কৈবল্য—ঐ অবস্থায় কোন প্রকার বিকল্প থাকে না, কারণ দেহ ও মনের সংযোগ ভিন্ন বিকল্পের উদয় হইতে পারে না। কিন্তু যোগীর আদর্শ সাকার পিণ্ড-সিদ্ধ। যোগী বিকল্পকে শুদ্ধ করিয়া শুদ্ধ বিকল্পরূপে উহার স্থায়িত্ব আকাঙ্খা করে। এই শুদ্ধ বিকল্প পূর্বোক্ত নির্বিকল্প স্থিতির অবিরুদ্ধ। সাধকের লক্ষ্য সিদ্ধ অবস্থাতে কাম বর্জন করিয়া নিষ্কাম চিৎস্বরূপে অবস্থান, কিন্তু যোগীর লক্ষ্য মলিন কামকে শোধিত করিয়া বিশুদ্ধ

কাম রূপে অর্থাৎ ভগবৎ-প্রেমরূপে পরিণত করা। এই ভগবৎ-প্রেম মনুষ্যের জীবনের মুখ্য আদর্শ। এইজন্য যোগী মুক্ত অবস্থাতেও আকার বর্জিত হয় না অর্থাৎ যোগীর কায়া কখনই পরিত্যক্ত হয় না—এই নিত্য কায়া লাভ করিয়া যোগী অখণ্ড কর্মের পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকে।

কেহ কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন—যোগীর নিত্য কায়া লাভ বলিতে কি বুঝিতে হইবে? উহা কি মৃত্যুঞ্জয় অবস্থার প্রাপ্তি অথবা কোন দিব্যাবস্থা বিশেষ? এই প্রশ্নের সমাধান করিবার পূর্বে কর্মপ্রভাবে কায়া রচনা রহস্য সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। আমরা পূর্বে কোন একটি বিশিষ্ট দিক হইতে এই কায়া সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। এখন আরও বিস্তারিতভাবে ইহার আলোচনা করা হইতেছে।

মানুষ মাতৃগর্ভ হইতে নির্গত হইয়া কালরাত্রির রাজ্যে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকে। কালের রাজ্যে জীবনের গতি মৃত্যুর দিকে ইহা বুঝাইয়া বলিবার আবশ্যকতা নাই। জীবনের আদি হইতে জীবনের অবসান পর্যন্ত যে ধারা তাহারই মধ্যে কালের খণ্ড শক্তিগুলি ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। যেমন এক এক আনা সঞ্চিত হইয়া ক্রমশঃ যোল আনার একটি মুদ্রা রূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ কালের এক একটি শক্তি ক্রমশঃ উপচিত হইয়া সর্বশক্তির উপচয়ে দেহপাত ঘটাইয়া থাকে। বস্তুতঃ বায়ু যেমন মূলতঃ সাত প্রকারের হইলেও সপ্তীকরণ প্রক্রিয়ার ফলে উনপঞ্চাশটি পৃথক পৃথক বায়ুর রূপ পরিগ্রহ করে, তদ্রূপ একটি পরিচ্ছন্ন কালশক্তি পূর্বোক্ত প্রক্রিয়ায় অনুরূপ প্রণালীতে উনপঞ্চাশৎ অণুশক্তিরূপে পরিণত হয়। মাতৃকাচক্রের রহস্য আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে এই উনপঞ্চাশৎ শক্তিই বিষম সংযোগে মাতৃকাশক্তিরূপে জীব-হৃদয়ে বিকল্পের রচনা করিয়া থাকে। এই উনপঞ্চাশটি শক্তি শুদ্ধ জীবাত্মাকে অশুদ্ধবৎ প্রতীত করাইয়া অনন্ত প্রকার বিক্ষেপের আশ্রয়রূপে প্রদর্শিত করে। বস্তুতঃ এই বিকল্পের শোধন না হইলে আত্মার স্বরূপ-স্থিতি সম্ভবপর নহে। যোগীর মহালক্ষ্য তো দূরের কথা, সাধকের জীবনের আদর্শও আত্মাকে এই সকল মাতৃকারাশির আক্রমণ হইতে অব্যাহতি দান করা এবং তাহাকে তাহার নিজ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করা। আত্মকর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য ইহাই। বর্তমান জগতে বা সমাজে সাধারণতঃ যে কর্ম প্রচলিত আছে তাহাতে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। কারণ ঐ কর্ম মূলতঃ কর্তৃত্বাভিমানমূলক বলিয়া পুণ্য ও পাপরূপে জীবকে উর্দ্ধ অথবা অধোগতিতে প্রেরণ করে—তাহাকে তাহার নিজ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে সাহায্য করে না। ঐ কর্মের ফল সুখ দুঃখ ভোগ, আত্মজ্ঞানের উন্মেষ নহে। কুণ্ডলিনী শক্তি কিঞ্চিন্মাত্রাতেও জাগিয়া না উঠিলে অতি নিম্ন স্তরের আত্মকর্মও সম্ভব না।

পূর্ববর্ণিত উনপঞ্চাশটি মাতৃকাশক্তির যোগ বিয়োগে নানা প্রকার ভাবের উদয় হয়। এই শক্তিগুলি অপ্রবুদ্ধ অথবা মলিন থাকিলে ভাবও মলিন হয়। এই মলিন ভাবের শোধন ব্যতীত ভাবাতীত আত্মস্বরূপের বোধ কি প্রকারে হইবে? সাধারণ মনুষ্য আত্মকর্ম করিতে পারে না বলিয়া তাহাদের এই শক্তিগুলি অমার্জিতই থাকিয়া যায়। সুতরাং দেহাবস্থাতে তো দূরের কথা, দেহান্তেও তাহাদের স্বরূপ-স্থিতির পথে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। তাহাদের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। কিন্তু যাহারা সাধকরূপে নিজ কর্মের প্রভাবে এই মাতৃকাশক্তিগুলির অর্থাৎ অণু সকলের সংস্কার করিতে সমর্থ হয় তাহারা পূর্ণ শোধনের পর শুদ্ধ আত্মস্বরূপে স্থিতি লাভ করিতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সবগুলি শক্তিরই শোধন আবশ্যক। শক্তির কিঞ্চিন্মাত্রও অশোধিত থাকিলে স্বরূপ-স্থিতি হইতে পারে না। কিন্তু ইহাও সত্য যে এই শক্তি অশুদ্ধ হইলেও ইহার সহযোগ ব্যতীত আত্মার পক্ষে দেহে অবস্থান করা সম্ভবপর নহে। সুতরাং দেহাবস্থায় থাকিতে শক্তির পূর্ণ শোধন অসম্ভব। পক্ষান্তরে শক্তির পূর্ণ শুদ্ধি সম্পন্ন হইলে বিদেহ-কৈবল্য অবশ্যম্ভাবী। সাধক সিদ্ধাবস্থাতে অণুহীন বিকল্পহীন মাতৃকাসংস্পর্শহীন, দেহহীন ও মনহীন স্থিতি লাভ করে। কিন্তু যোগী প্রবলতর নিজ কর্ম প্রভাবে এই সকল মাতৃকা-শক্তিকে অন্তরঙ্গ স্বরূপ-শক্তিরূপে, মাতৃরূপে পরিণত করে। যখন এই স্বরূপ-শক্তিরূপে পরিণাম পূর্ণ হয় তখনই যোগীর সিদ্ধ অবস্থা আসিয়াছে বুঝিতে হইবে। ইহা কিন্তু বিদেহ অবস্থা নহে। শক্তি শোধিত হইয়া নির্মলরূপে যোগীর স্বরূপকে পুষ্টিদান করে। সাধকের কাজ অশুদ্ধ সত্তাকে নিজ হইতে বিযুক্ত করা অর্থাৎ পৃথক করা, কিন্তু যোগীর কাজ অশুদ্ধ সত্তাকে অশুদ্ধি হইতে মুক্ত করিয়া তাহাকে নির্মল নিজ শক্তিরূপে পরিণত করা ও নিজের সঙ্গে যুক্ত করা। যে যোগী যত বেশী পরিমাণে এই যোজনাকার্যে অগ্রসর হন তিনি তত শ্রেষ্ঠ যোগী বলিয়া পরিগণিত হন। প্রকৃত সিদ্ধ যোগী তিনিই যিনি উনপঞ্চাশটি মাতৃকাশক্তির মধ্যে সবগুলিকেই আত্মশক্তিরূপে পরিণত করিতে সমর্থ হন। এই প্রকার সিদ্ধ যোগী নিত্য কায়া-সম্পদ লাভ করিয়া থাকেন এবং সেইজন্য নিজেকে বিশুদ্ধ অহং বলিয়া বোধ করিবার যোগ্যতা অর্জন করেন। ইহাই যোগীর আত্মস্বরূপে স্থিতিরূপ সিদ্ধি। ইহা কিন্তু সাধকের বিদেহ-কৈবল্য রূপ অবস্থার অনুরূপ অবস্থা নহে, কারণ এই অবস্থায় দেহ থাকে এবং ঐ দেহ কালজয়ী নিত্য দেহ।

নিত্য দেহ লাভ করিয়াও ভৌতিক দেহের দিক হইতে এইপ্রকার সিদ্ধ যোগীকেও মৃত্যুর মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতে হয়। এইজন্য যোগ-সাধনার ক্রমোৎকর্ষের দিক

হইতে বিচার করিলে জানিতে পারা যায় যে ইহারও একটি পরাবস্থা আছে, অর্থাৎ এমন-একটি অবস্থা আছে যে অবস্থায় যোগী শুধু পূর্বোক্ত আত্মস্বরূপ ও নিত্যদেহ লাভ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হয় না, কিন্তু এই জরা-ব্যাধির আধার বিকারময় ভৌতিক দেহকেও কালের কবল হইতে উদ্ধার করিতে সে সমর্থ হয়।

পূর্বে যে শবাসনের কর্মের কথা বলা হইয়াছে তাহা যোগীরই কর্ম, সাধকের কর্ম নহে। সাধক অণু অথবা বিকল্প শুদ্ধ করিয়া বিকল্পহীন চিদাকাশে স্থিতি লাভ করে, তাহার কায়া-রচনা হয় না। লৌকিক কায়া পরিত্যক্ত হইয়া যায় অথচ অলৌকিক কায়ার উদয় হয় না এবং হইবার সম্ভাবনাও থাকে না। কিন্তু যোগী সম্পূর্ণ স্ব-কায়া রচনা করিতে সমর্থ হইলেই সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। যদিও এই স্ব-কায়া ভৌতিক কায়ার রূপান্তর নহে, তথাপি ইহা ভৌতিক কায়ার ন্যায়ই সুস্পষ্ট-স্বরূপ এবং ইহাকে আশ্রয় করিয়া যোগীর আত্মজ্ঞানের বিকাশ হয়, এবং শুদ্ধ আমিত্ববোধ উৎপন্ন হইয়া স্থায়িত্ব লাভ করে। লৌকিক কায়ার সহিত বিচ্ছেদ তাহার পক্ষেও অবশ্যম্ভাবী, কারণ লৌকিক কায়ার অবস্থান্তর না হওয়া পর্যন্ত তাহাকে গুপ্ত ভাবেই থাকিতে হয়। কিন্তু স্ব-কায়ালাভ হইলেও লৌকিক কায়া হইতে কালের প্রভাবে চ্যুত হইতে হয়। শক্তিশালী হইলেও, এমন কি সর্বজ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি অধিগত হইলেও, ইহার অন্যথাচরণ সম্ভবপর হয় না। কিন্তু যোগে উৎকর্ষ লাভ করিলে এই লৌকিক দেহেরও রূপান্তর সাধন করিয়া ইহাকে আত্মার চিরসাথী করিয়া লওয়া যায়। ইহা অতি দুরূহ কর্ম এবং সাধন-বিজ্ঞানের অগোচর, কিন্তু অসম্ভব নহে। কারণ জগতে এমন অনেক যোগী আবির্ভূত হইয়াছেন, যাহারা নিজ নিজ কায়াকে সিদ্ধ করিয়া কালস্পর্শের অতীত করিয়া ফেলিয়াছেন। ভারতীয় চৌরাশি সিদ্ধের কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। এই সিদ্ধি পূর্বোক্ত অলৌকিক কায়ালাভের তুলনায় উচ্চতর সিদ্ধি। কারণ অলৌকিক কায়ালাভ করিলে শুদ্ধ অহং-জ্ঞানের কখনও লোপ হয় না বলিয়া এক হিসেবে মৃত্যু আর ঘটে না, কিন্তু ভৌতিক দেহ হইতে বিচ্ছেদরূপ যে মৃত্যু তাহা হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায় না। কিন্তু চৌরাশি সিদ্ধগণের যে কায়া সম্পত্তি লাভের কথা বলা হইল তাহাতে ভৌতিক দেহেরও অস্তিত্ব লুপ্ত হয় না, এবং সেইজন্যই উক্ত দেহাশ্রিত আত্মবোধ জাগ্রৎ থাকে। ভৌতিক দেহ জড় বলিয়া হেয়, কিন্তু এই দেহ যখন চৈতন্য-সংযোগে উজ্জ্বল চিদাকার লাভ করে তখন ইহা স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হয়।

বর্তমানে যে অবস্থার কথা বলা হইল তাহার উদয় হইল জড় দেহসত্তা চিন্ময় আত্মসত্তার সহিত যুক্ত হইয়া যায় এবং আত্মসত্তা হইতে ইহার পৃথক অস্তিত্ব থাকে

না অথবা এই সত্তা হইতে আত্মসত্তারও পৃথকভাব থাকে না। অতি পরিমিত সংখ্যক যোগী এই গৌরবময় স্থিতিলাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাতেও ন্যূনতা আছে। আত্মা, দেহ, মন প্রভৃতি বিগলিত হইয়া এক অখণ্ড চিদানন্দময় সত্তার প্রতিষ্ঠা হয়। এই সত্তা স্থূলদেহকে আশ্রয় করিয়া বাহ্য জগতে আত্মপ্রকাশ করে। বস্তুতঃ এই অবস্থায় স্থূলদেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মা নিজ নিজ পৃথক অস্তিত্ব বিসর্জ্জন দিয়া একই অবিভক্ত সত্তারূপে প্রকাশিত হয়, তাহাকে অবলম্বন করিয়া আত্মবোধের উদয় হইয়া থাকে। কিন্তু এই অবস্থাতেও প্রকৃত পূর্ণতার উদয় হয় না।

সাধক ও যোগীর গতি সমান নহে, কারণ উভয়ের কর্ম্ম সমান নহে। উভয়ের লক্ষ্য ও সামর্থ্যও ভিন্ন। সাধক চায় কৈবল্য, যোগী চায় পূর্ণ রূপান্তর। বস্তুতঃ, রূপান্তর পূর্ণভাবে সিদ্ধ না হইলে বুঝিতে হইবে সম্যক জ্ঞানের উদয় হয় নাই এবং যথার্থ স্বরূপ প্রতিষ্ঠাও অধিগত হয় নাই।

জীবের বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রধানতঃ তিনটি পর্য্যায় আছে—প্রথম আত্মা, যাহাকে আশ্রয় করিয়া পরিচ্ছিন্ন অহংভাবে সাংসারিক জীবনের কেন্দ্র-স্বরূপ রহিয়াছে, দ্বিতীয় করণবর্গ, যাহাতে অন্তঃকরণ ও বাহ্যেন্দ্রিয়সমূহ অন্তর্গত ভাবে বিদ্যমান আছে; এবং তৃতীয় স্থূলদেহ। জাগ্রৎ অবস্থাতে আমাদের এই স্থূলদেহকে আশ্রয় করিয়া কার্য করে। স্বপ্নে করণবর্গকে আশ্রয় করে, সংস্কার সমষ্টি ও প্রাণময় কোষ এই স্তরে নিহিত। সুষুপ্তিতে ঐ অভিমান লীনবৎ হইয়া কেন্দ্রে বিদ্যমান থাকে। সাধক সাধন বলে নিজের বোধকে ক্রমশঃ স্থূল হইতে সূক্ষ্মে ও সূক্ষ্ম হইতে করণে উপসংহৃত করে। তাহার পর করণ হইতেও যখন ঐ বোধশক্তি নিষ্ক্রান্ত হয় তখন উহা প্রকৃতি হইতে মুক্ত হইয়া নিজ স্বরূপে অর্থাৎ চিৎস্বরূপে অবস্থিত হয়। বিবেক হয় প্রথমে কারণ ভাবাপন্ন অচিৎ হইতে প্রতিষ্ঠা হয় অন্তে নিজ স্বরূপভূত চিৎ সত্তাতে। ইহাই কৈবল্য। ইহাই সাধনের সাধন। প্রচলিত বহু যোগমার্গেরও ইহাই লক্ষ্য। কিন্তু এখানে যাহাকে যোগসংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে তাহার উদ্দেশ্যে শুধু অচিৎ হইতে মুক্তিমাত্র নহে। উহা অতি গভীর। পূর্ণ দৃষ্টিতে এক অখণ্ড সত্তাই স্বয়ং প্রকাশরূপে নিজের আলোকে আলোকিত হইয়া ভাসিতে থাকে, উহাই চৈতন্যময় আনন্দময় আত্মসত্তা। ঐ আত্মসত্তাকে বস্তুতঃ অচিতের কোন স্থান নাই। পূর্বে অর্থাৎ অপ্রবুদ্ধ দশাতে যাহা অচিৎ বলিয়া ধারণা হইত তাহা যে বস্তুতঃ অচিৎ নহে তাহা জ্ঞানের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পারা যায়। 'অচিৎ' তখন চিন্ময় হইয়া আত্মপ্রকাশ করে। ইহারই নাম রূপান্তর। শুধু জ্ঞানের দ্বারা ইহা হয় না—বিশিষ্ট জ্ঞান বা বিজ্ঞান দ্বারা এই প্রকার রূপান্তর সিদ্ধ হয়।

বিবেকের ও আত্ম প্রতিষ্ঠার পর চিৎস্বরূপ শক্তিরূপে সাধকের অন্তর্ভূক্ত আত্মিক স্তর, করণস্তর ও ভৌতিক স্তরের স্পর্শ করিয়া ক্রমশঃ উহাদিগকে নিজবলে চিন্ময়রূপে পরিণত করে। বিবেক বা বিয়োগের পর যোগের ক্রিয়া এইভাবেই আরব্ধ হয়। ভগবদনুগ্রহের পূর্ণ প্রকাশ ব্যাপারে প্রথমে জড়ত্ব-মোচন হয়, পাশ-ক্ষয়, অচিৎসত্তা হইতে নিষ্ক্রমণ সম্পন্ন হয়। ইহা ব্যতিরেকের পথ। তাহার পর পূর্ণ ভগবত্তার সহিত যোজনা হয়। ইহা অন্বয়ের পথ। প্রথম বিয়োগ, তারপর যোগ। যোগ-প্রক্রিয়াতে প্রাক্তন জড়সত্ত্বা জড়ত্ব পরিহার করিয়া চিন্ময়রূপ ধারণ করে। তখন শুধু জীবই বিশুদ্ধ চিৎ-স্বরূপে স্থিতি গ্রহণ করে তাহা নহে, কারণ সমষ্টিও লুপ্ত না হইয়া চিন্মরীচিপুঞ্জরূপে বা চিন্ময় রশ্মিমালারূপে পরিণত হয় ও ভৌতিক উপাদানজাত দেহও শুদ্ধ হইয়া চিদালোকে আলোকিত হয় ও চিন্ময় আকার ধারণ করে। তখন সর্বত্র চিৎ-এর অব্যাহত ব্যাপ্তি হয়। ইহারই নাম ভাগবতী সত্তাতে জাগরণ বা পূর্ণ যোগ-প্রতিষ্ঠা।

কর্ম দ্বারা অর্থাৎ কর্মজাতজ্ঞানের প্রভাবে কর্ম কাটে। শুধু তাহাই নহে। জ্ঞানোত্তর অলৌকিক কর্মের দ্বারা অর্থাৎ যোগরূপ-কর্মের দ্বারা কিংবা বিজ্ঞানের দ্বারা নবীন সৃষ্টির উদগম হয়, নবীন রচনা রচিত হয়। ইহাই চিন্ময় সৃষ্টি। প্রাকৃত শুদ্ধ মন প্রভৃতির চিন্ময়তা সম্পাদন ও অপ্রাকৃত ভাব প্রাপ্তি ইহাই নামান্তর। শুধু মায়িক কর্ম কাটিলে যে কৈবল্য হয় তাহা অশুদ্ধ বিজ্ঞান-কৈবল্য। তাহাতে পশুত্ব নিবৃত্ত হয় না—তবে জন্ম-মৃত্যুর আবর্তন নিরুদ্ধ হয়। তাহার পর আধিকারিক কর্ম বা ঐশ্বরিক কর্মও যখন কাটিয়া যায় তখন মহামায়ার বিরাট চক্রেরও ভেদ হইয়া যায়। অচিৎ-সম্বন্ধ থাকে না, পশুত্বও থাকে না। তাই মায়া ও কর্ম-পাশ কাটাইয়া মহামায়ার পাশও ছিন্ন করিতে হয়—জীবভাব ও শক্তির ভাব উভয় হইতেই সমভাবে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হয়, অশুদ্ধ ও শুদ্ধ উভয় প্রকার কারণ হইতে নিজেকে উদ্ধার করিতে হয়। তখন যে পরম দশার উদয় হয় তাহার নাম বিশুদ্ধ বিজ্ঞান-কৈবল্য। ইহা নির্মল আত্মস্বরূপ। কিন্তু আত্মার স্বরূপ-শক্তির বিকাশ না থাকাতে ইহাও প্রকৃত ভগবত্তা নহে! এই স্থিতিতেও পরমেশ্বরের সহিত ঐক্য লাভ ঘটে না। তন্ত্রমতের এইটি মহাশবের অবস্থা মহাশক্তির উদ্বোধন হইলে অর্থাৎ পরিপূর্ণ অভিষেক সম্পন্ন হইলে এই মহাশিবরূপে জাগিয়া উঠে। ভগবত্তার পূর্ণ অভ্যুদয় তখনই সম্ভব হয়।

কিন্তু মহাশবের অবস্থায় যাইতে না পারিলে পরাশক্তির পূর্ণ আত্মপ্রকাশ আশা করা যায় না। আত্মব্যাপ্তি, বিদ্যাব্যাপ্তি ও শিবব্যাপ্তিরূপ মহাব্যাপ্তি তাহার পরে আপনা হইতেই ঘটিয়া থাকে। মহাশবের অবস্থা লাভ উৎকট যোগক্রিয়া ব্যতিরেকে সিদ্ধ হয় না। এই ক্রিয়াতে গুরুশক্তিরই প্রাধান্য।

জ্ঞানগঞ্জের পত্রাবলী

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

প্রায় ২৪ বৎসর পূর্বে শ্রীশ্রীগুরুদেবের অনুমতি অনুসারে কাশীধাম হইতে জ্ঞানগঞ্জের কয়েকখানা পত্র 'ছয়খানি পত্র' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ পত্রগুলি এবং আরও কয়েকখানা পত্র আমার নিকট বহুদিন হইতে সযত্নে রক্ষিত ছিল। ১৯১৮ সালের ২১শে জানুয়ারী তারিখে আমি শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে আশ্রয় লাভ করি। তখন বেনারস হনুমান ঘাটের আশ্রমে বাবা থাকিতেন। আমার দীক্ষার কিছুদিন পরে জ্ঞানগঞ্জ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে একদিন বাবা বলেন যে, পশ্চিম হইতে পত্র আসিয়াছে তাহাতে আমাদের কথা আছে।

'পশ্চিম' বলিতে বাবা জ্ঞানগঞ্জই লক্ষ্য করিতেন, ইহা আমরা জানিতাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম 'বাবা ঐ পত্রখানা কি আমরা দেখিতে পারি না?' বাবা বলিলেন, 'উহাতে তোমাদের সম্বন্ধে আলোচনা আছে। তাই উহা এখনও তোমাদিগকে দেখাইতে পারি না।' আমি বলিলাম 'আমি আমাদের ব্যক্তিগত সমালোচনা দেখিবার জন্য উৎসুক নহি। আমার ঔৎসুক্য শুধু এই দেখিবার জন্য—তাহারা কি প্রকার লেখেন—তাঁহাদের ভাষা কি প্রকার-ভাব প্রকাশের পদ্ধতি কিরূপ, এই **সব** বিষয়।'

বাবা বলিতেন—'পুরাতন পত্র অনেক বর্দ্ধমানে আছে, তোমাকে পরে দেখাইব।' ইহার কিছুদিন পরে বাবা বর্দ্ধমান যান। পর বৎসর, কাশীতে আসিবার সময় যদৃচ্ছা সংগৃহীত কয়েকখানা পত্র লইয়া আসেন ও আমাকে দেন। ইহার পর আরও কয়েকখানা পত্র দেন। আমি পত্রগুলি পাইয়া খুব যত্ন করিয়া রাখিয়াছিলাম। এইগুলি সবই আমার দীক্ষার পূর্বকালীন পত্র! দীক্ষার পরবর্তী সময়ের কোন পত্র আমাকে দেন নাই ও দেখান নাই। তবে বহু বৎসর পর বোধহয় ১৯২৬ সালে, গোমোতে অথবা ধানবাদে অবস্থান কালে উমানন্দ স্বামীর একখানা পত্র পাইয়াছিলেন—উহা আমাকে দেখিতে দিয়াছিলেন। উহা বিজ্ঞান মন্দির স্থাপনের পরের কথা।

তাঁহার অনুমতি ক্রমে ঐ পত্র আমি নকল করিয়া লইয়াছিলাম। পূর্বের পত্রগুলির মূল কপি আমার নিকট ছিল।

পত্রগুলি কিভাবে আসিত তাহা বলা যায় না। কোন কোন পত্রে জ্ঞানগঞ্জের মোহর আছে—তাহাতে নাগরী অক্ষরে লেখা আছে 'পাঞ্জাব আশ্রম—স্বামীজী।'

একখানা খামে টিকিটের উপর মোহরে ছাপা ইংরাজী অক্ষরে আছে—Jnanananda Swami Ashram Punjab একখানাতে ছিল Golden Temple Amritsar কোন কোন খামে ইংরেজী অক্ষরে জলন্ধরের (Jullundhar City) মোহরও দেখিয়াছি।

এইগুলি ঠিক ডাকে আসিতে দেখি নাই। যেমন লেন্স বিজ্ঞানের বড় বড় যন্ত্র, বড় বড় ঔষধের শিশি শূন্যমার্গে আসিত ও এখান হইতে জ্ঞানগঞ্জের কুমারীদের জন্য বস্ত্রাদি শূন্যমার্গে যাইত, বোধ হয় এই সকল চিঠিও অধিকাংশ স্থলে সেইভাবেই আসিত। বাবা এসব রহস্য সাধারণ লোকের নিকট স্পষ্ট করিয়া খুলিতেন না। তবে অলৌকিক উপায়ে যে অনেক জিনিষ আসিয়াছে ও তিনিও পাঠাইয়াছেন তাহা আমার প্রত্যক্ষ দৃষ্ট।

আমার পূর্বোক্ত সংগ্রহ হইতেই 'ছয়খানা পত্র' নির্বাচন করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছিল। ঐ পুস্তকখানি কলিকাতাতে মুদ্রিত হইয়াছিল; সম্পাদনের ত্রুটিতে উহাতে অনেক অশুদ্ধি বর্তমান ছিল। সম্প্রতি ঐ চিঠিগুলি এবং আরও কয়েকখানা অপ্রকাশিত চিঠি 'জ্ঞানগঞ্জের পত্রাবলী' নামে প্রকাশিত করা হইয়াছে। চিঠিগুলি যথাবৎ মুদ্রিত হইবে। কোন স্থানে কোন ব্যক্তির নাম থাকিলে উহার উল্লেখ থাকিবে না। যদিও উল্লিখিত বহু ব্যক্তি এখন পরলোকগত, তথাপি ব্যবহারগত শিষ্টতার অনুরোধে কোথাও কাহারও নাম নির্দেশ থাকিবে না। ইতি—

প্রথম পত্র

নমো নারায়ণায়, *কৃষ্ণপক্ষ*

১৮২৭/১০/৬

নারায়ণস্মরণবর

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য

অভয়ানন্দ স্বামীর শুভ সংবাদে যথাবিধানে

সম্ভাষণ পূর্বক বিজ্ঞাপন পরম্—

তোমাদের প্রেরিত শুভ সংবাদে পরমানন্দ লাভ করিলাম শ্রীশ্রীবিশ্বনাথের সমীপে প্রার্থনা করি, তোমার অভিলাষ সুসিদ্ধ হউক, এই আমার ইষ্ট। (পরমারাধ্য) গুরুদেব কয়েক দিবস হইল এখানে নাই, তিনি মনোহর তীর্থে গিয়াছেন। আমিও তাঁহার নিকট শীঘ্রই যাইব। এখন দুই তিন দিন হরিদ্বারে থাকিলাম।

মানবীয় ভাব অতীত হইয়া আবার এ কি? চৈতন্য স্বরূপের উচ্ছ্বাস ভাব মন, স্থূল তত্ত্বের পরিমিত শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া দম্ভ দ্বেষাদির উত্তেজনায় সময়ে সময়ে বিপদ উপস্থিত করে এবং পৃথিবী শোণিত-সিক্ত করিয়া আত্মম্ভরিতা দোষে আক্রান্ত করে।

দুর্দমনীয় রিপুগণের প্রবল শাসনে সাধুচিন্তা, ধর্মানুরাগ, ব্রহ্মভাবে নিষ্ঠা, সদসৎ ইচ্ছা কিছুই থাকে না। তথাপি এমন অবস্থাতেও অবচেতন জড়শক্তি চেতনশক্তিসম্পন্ন চিত্তকে বদ্ধ রাখিতে সক্ষম নহে। কারণ বিধাতার অমোঘদণ্ড প্রতিমুহূর্ত কাল-পাপ প্রবৃত্তি প্রতি বর্ষিত হইতেছে। রেখামাত্র পবিত্রতার সংস্পর্শে দেবশক্তির প্রভা প্রদীপ্ত হইয়া মেঘনির্মুক্ত সূর্যের ন্যায় চিত্তকে দেবভাবে অনুরঞ্জিত করে। উহা কামাদির নির্যাতন বা তাহাদের পাপ প্রলোভনে প্রতারিত হয় না, দেবতত্ত্বের অন্বেষণে নিয়তকাল ব্যাকুল থাকে। ব্রহ্মকৃপা স্বাভাবিক আসিয়া পড়ে।

ক্রমে ক্রমে বিশুদ্ধ স্বর্গীয়ভাবে মর্মভেদ করিলে দয়া, দাক্ষিণ্য, ক্ষমা, ধর্ম, ঔদাস্য ও সারল্য এই ছয়টি মহাবৃত্তির প্রভাবে মানবীয়ভাব ও ক্রোধাদির বল ক্ষয় হইয়া দেবভাবের আশ্রয় লইতে শক্তি জন্মে। ক্ষুদ্র কীট হইতে উচ্চাধম পর্য্যন্ত কোন বিশেষত্ব থাকে না। সকলের ভিতরে একমাত্র নিরাকার অখণ্ড শক্তিরও প্রকাশ প্রত্যক্ষ হয়। তখন জ্ঞান অজ্ঞান মানব বা কীট এই সমূহ ভেদ ভাবনা থাকে না।

তাতেই বলি গুহা সম্বন্ধে উপস্থিত ইচ্ছুকের ইচ্ছা পূরণ করাই তোমার উদ্দেশ্য।

একথা পরম গুরুদেব আমায় একদিন বলেছিলেন—ভেবেছিলে যেরূপ গুরুদেব দেখিতেছি, বোধ হয় গুহা আর হইবে না। অনেকের গুহা সম্বন্ধে........। প্রস্তর নির্মিত গুহা না হওয়ায় ও সকলকার অর্থ ফেরত দেওয়ায়,—বড়ই চিন্তিত ছিলে।

যাহা হউক, তুমি চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ করিয়া, যেরূপভাবে গুরুদেবের নিকট আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছ, তাহাতেই তিনি পরম সন্তোষ। গুরুদেব পূর্বেই বলিয়াছিলেন গুহানির্মাণ যে করিয়া দিবে সে ত্রিতাপ-যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইবে, কোন যন্ত্রণা থাকিবে না।

গুহা নির্মাণের জন্য যে স্থানে লৌহফলক পুতিয়াছিল, সে স্থানে গুহা হইবে না, এই কথা গুরুদেব বলিলেন। গুহা নির্মাণ—বাণলিঙ্গ শিবের ঘরের দক্ষিণ-দিকে যে দুয়ার আছে, সেই দুয়ারের সম্মুখস্থিত স্থানে গুহা হইবে।

গুহার পরিমাণ—ভিতরের লম্বা আটহাত, চওড়া ছয়হাত ও উচ্চ সাড়ে চারি হস্ত। এই গেল গুহা। তাহার উপরে আর একটি ঐরূপ বড় ঘর হওয়া আবশ্যক, কারণ উপরে ঘরে মাতা আনন্দ ভৈরবী বলিয়াছেন, আমার যে আনন্দময়ী দেবী আছেন তাহা উক্ত ঘরে স্থাপন করিব। উপর হইতে গুহায় প্রবেশ করা যায়, এরূপ বন্দোবস্ত হইবে।

আর গুহায় পরমানন্দ গোস্বামী থাকিবেন, দাদা গুরুদেব প্রভৃতি মধ্যে মধ্যে। গুহায় অনেক অনেক সন্ন্যাসী থাকিবেন। উপর ঘরে যে ভৈরবী থাকিবেন উক্ত ঘর দ্বাদশ হস্ত দেওয়াল বাদ উত্তীর্ণ হইলেই ভাল হয়। উপর ঘরের তিন দিকে পিড়ে হওয়া

আবশ্যক, আড়াই হস্তের কম না হয়, বরং বৃদ্ধি হইলে ক্ষতি নাই। দুয়ার প্রভৃতি যেরূপ রাখিলে ভাল হয় সেরূপ রাখাইবে। গুহার দুয়ার যেন সুদৃঢ় হয়।

মাতা আনন্দ ভৈরবীর সহিত সাতটি ভৈরবী থাকিবেন। কেহই আহার করেন না। আনন্দ মাতার বয়ঃক্রমে পাঁচশত বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে। বোধহয় সেইস্থানেই সমাধি লইবেন। গুরুদেবেরও আদেশ ঐরূপ।

গুহার স্থানে অন্য কাহারও অধিকার থাকিবে না, নিয়ত ভৈরবীমাতা ও উত্তম উত্তম সাধু উক্তস্থানে থাকিবেন। তোমার আগ্রহের কারণ গুহা নির্মাণের জন্য শ্রীমান....কে সকলে স্বস্তি করিলেন না। তুমি চিত্তবৃত্তি এরূপ ভাবে আর কখনও কাহারও জন্য কদাচ করিবে না, গুরু আজ্ঞা।

.... র বাড়ী সম্বন্ধে সমস্ত ঠিক করিতে জ্ঞানানন্দ পরমহংসকে বলা হইয়াছে, তার জন্য তুমি কদাচ কোন কার্য করিবে না। তাহার অশুভজনিত দুঃখ নষ্ট হইয়া যাহাতে তাহার সমস্ত শুভ হয় ও শেষ জীবন পর্য্যন্ত সুখে থাকে ও পরিণামে স্বর্গীয় সুখ অনুভব করে, তাহার পর্য্যন্ত চেষ্টা করা হইতেছে।

গুরুদেবের আদেশ, তুমি তাহাকে ধৃতি যোগ দিয়া তাহার খারাপ কার্য্য সকল নষ্ট করিয়া দিবে। একার্য্য বর্ষা না পড়িলে কদাচ দিবে না.....প্রভৃতির নিকট হইতে কদাচ অর্থ গ্রহণ করিবে না।

যে প্রস্তরে গুহা নির্মাণ বলিয়াছিল তাহা...র ন্যায় পরিত্যাগ করিবে তাহা কদাচ গ্রহণ করিবে না। পত্র পাঠ তাহাকে সংবাদ দিবে,—অন্যান্য সমস্ত বিষয় পরে লিখিতেছি ইতি—

দ্বিতীয় পত্র

ওঁ তৎসৎ

নারায়ণ স্মরণবর

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য

শ্রীঅভয়ানন্দ স্বামীর শুভ সংবাদে যথাবিধানে সম্ভাষণ পূর্বক বিজ্ঞাপন পরম্—

তোমার প্রেরিত শুভ সংবাদে পরমানন্দ লাভ করিলাম। আদিনাথের সমীপে প্রার্থনা করি—তোমার অভিলাষ সুসিদ্ধ হউক, এই আমার ইষ্ট। পরমারাধ্য গুরুদেব ভৃগুরাম পরমহংসদেবের সম্প্রতি যে সংবাদ আসিয়াছে, তাহার কিয়দাংশ তোমাকে লিখিতেছি।

তাঁহার আদেশ এই—যাহাকে যাহাকে পূর্বে পত্র লিখিয়াছেন ক্রিয়া দিতে, তাহাদিগকে ক্রিয়া আষাঢ় মাস হইতে অগ্রহায়ণ মাস পর্যন্ত দিতে পার।

.....কে ধৃতি যোগ ও কিরাত কুম্ভক দিবে, অন্য কাহাকেও ক্রিয়া দিবে না। ...এর পিতার জন্য তুমি লিখিয়াছিলে, তাঁহার দুরারোগ্য রোগ। যাহা হউক তাহার জন্য আনন্দ ভৈরবীকে বলা হইয়াছে। বোধ হয় তিনি ক্রিয়া আরম্ভ করিয়াছেন। তুমি কদাচ কাহার জন্য কোন ক্রিয়া করিবে না।

যাহা যাহা করিতে হইবে তুমি সংবাদ দিলেই আমরা সমস্ত করিয়া দিব। কারণ তোমার শেষ ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। আর চার বৎসর বাদে তোমার সমস্ত সমাধা হইবে। তখন যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিবে।

.....এর ও এর বিষয় যাহা লিখিয়াছ তাহাদের জন্য যে ক্রিয়া করা হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট, এবং তাহারা যে কার্য করিতেছে তাহাতে তাহাদের সমস্ত বাসনাই সিদ্ধ হইবে। তবে উহাদের চিত্তের অবস্থা এখনও বড় খারাপ যাহা হউক উহা থাকিবে না। ....কে সমাধি উড্ডীন দিতে পার, তাহাতেই সত্বর ফল পাইবে।....এর বিশেষ আগ্রহ দেখিলে চাক্ষুষী কুম্ভক দিতে পার।

অগ্রে তাহার চিত্তে চিত্ত প্রবেশ করাইয়া উত্তম করিয়া দেখিবে। ....কে কোন ক্রিয়াই দিবে না। না দেওয়ার কারণ ইহার পর বুঝিতে পারিবে। ...কে চক্ষু উড্ডীন দিতে পার। তাহা হইলেই পীড়ার সাম্য হইবে। ...কে ক্রিয়া দিবার জন্য লিখিয়াছ, তাহার চিত্ত বৃত্তি এবং স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া গিয়াছে—তাহাকে উষা-লৌকিক ক্রিয়া দিতে পার।

যাহাকে কোন ক্রিয়া দিবে অগ্রে তাহার চিত্তবৃত্তি দেখিবে এবং আমাদের ক্রিয়া দ্বারা সংবাদ দিবে। ....এর স্ত্রীর আগ্রহের কারণ আমি লিখিতেছি তাহাকে সাম্মোহিক চাক্ষুষ দিবে। যাহাকে যাহাকে ক্রিয়া দিবে প্রত্যক্ষ এবং সিদ্ধিলাভ যাহাতে শীঘ্র হয়, তাহা করিবে।

........কে ও তার স্ত্রীকে উদভবিতা ক্রিয়া দিবে। অন্যান্য শুভ। লিঙ্গাশ্রম সমাধানের প্রকৃত বাদিত্ব (?)

এবং আগ্রহকারীদের বিশেষ বিবেচনা করিয়া অর্থ গ্রহণ করিবে। তাহা না করিলে নিরয়গামী হইবে। ইতি অবিদ্যাপক্ষ আষাঢ়।

তৃতীয় পত্র

ওঁ তৎসৎ

নারায়ণ স্মরণবর ১৮৩০ কৃষ্ণপক্ষ।

পরমহংস ভৃগুরাম স্বামীর শুভ সংবাদে যথাবিধানে সম্ভাষণ পূর্বক বিজ্ঞাপন পরম্—

তোমার প্রেরিত শুভ সংবাদে পরম সন্তোষ হইলাম। এতদিন পত্র না লেখার কারণ আমরা কেহই এখানে ছিলাম না। আর অধিক দিন ভাই তোমাকে তাপ ভোগ করিতে হইবে না। তোমার পরীক্ষার শেষ হইতেছে। প্রাণাধিক, সমদৃষ্টিরূপে হৃদয়কোষে চিত্তকে স্থির করিয়াছ বলিয়াই অধঃউর্দ্ধ উভয় দৃষ্টি সমান হইয়াছে।

এরূপে অনেক কার্য করাইবার জন্যই এত শাসন। ভ্রম মুক্ত চিত্ত প্রতি ঘটনার মূলে আদেশ-তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হয়। মাতৃক্রোড়ে শিশু যেমন জননীর অমিয়মাখা স্নেহ-বাক্যে তৃপ্ত হইতে থাকে, তেমনি অনন্ত জননীর পূর্ণ স্নেহে ধ্যানস্থ চিত্তও ডুবিয়া যায়।

স্বর্গীয় অখণ্ড ভাবাবেশে ধ্যানের জীবন্ত জ্যোতি প্রকাশ পাইতে থাকে—উর্দ্ধ দৃষ্টির তীব্র ধ্যানে উত্তাপশক্তি হৃদয় প্রেমাকর্ষণে শীতল হয়। তখন সেই অনাদি আনন্দময় গুরুদেবের জন্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, চক্ষের পলক কাল ইষ্ট চিন্তার বিচ্ছেদ ঘটিলে অশ্রুজলে সকল শরীর ভাসিয়া যায়। আবার ঐ অশ্রুই অখণ্ড ধ্যানের সহায়।

নিবিড় অন্ধকারই গন্তব্য পথের সঙ্গী। গুরুদেবের নামই একমাত্র আশ্রয়। গুরুদেবকে সমস্ত নির্ভর ইহাই কর্ম। হৃদয়ভেদী ব্যাকুলতাই সাধন। গুরুদেবের আকর্ষণই স্বাভাবিক যোগ। ইহার অমিয় আস্বাদন কেবল অনাসক্ত সংন্যাস ভাবসম্পন্ন পরমহংসই ভোগ করেন।

যাহারা ভীষণ কোলাহল পূর্ণ জনতার মধ্যেও গম্ভীরভাবে চিত্তের অকম্পিত লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে দেন না ও নির্ভীক অন্তঃকরণে স্বাভাবিক সরলপথে অন্বেষণে নিভৃত চিন্তা করেন, তাহারই সংসারে অনাসক্ত পরমহংস।

যাঁহারা মৃণাল-ছিদ্রভেদী সূত্রের ন্যায় অনন্ত যোগপথে প্রবেশ করেন, গগন-চিত্রিত নক্ষত্রমণ্ডল ও জগৎ সকলে গূঢ়-প্রবিষ্ট অস্পর্শ গুরুশক্তি যোগে প্রাণীর প্রাণাধার ভেদ করিয়া, আত্মাযোগে সমস্ত জগৎ সুধাময় বুঝিতে পারেন তাঁহারাই সংসারে যোগী।

বিশুদ্ধানন্দ সকলই ত বুঝিতেছ ও জানিতেছ। গুরুদেবের কৃপায় তোমার কোন অভাব নাই। তোমার অনেক শিষ্য অনেক সময়ে তোমার উপর সন্দিগ্ধ চিত্তে থাকে।

তাহারা জানে না যে গুরুর প্রতি অর্থাৎ তোমার প্রতি, তোমার দয়ার প্রতি, অবিশ্বাস করিয়া কল্পিত অনুষ্ঠানের দ্বারা বদ্ধ থাকিয়া পথভ্রষ্ট পথিকের মত ক্লেশ ভোগ ভিন্ন অন্য কোন লাভই হয় না।

বলিতে কি তোমার ন্যায় গুরুকে অবিশ্বাস যে করে তাহার অভীষ্ট লাভের ইচ্ছা ক্লীবের পুত্রমুখ দর্শনের ন্যায়। তুমি কদাচ কাহাকেও কোন বিষয় বলিবে না বা যোগ ক্রিয়ার দ্বারা দেখিবে না। এমন কি শিষ্যদের বিষয়ও দেখিবে না। যাহা করিতে হইবে সমস্ত আমি করিব ও দেখিব। প্রতিদিনই তোমার শিষ্যের কার্য্য আমি দেখি।

শ্রীমান.....কে ক্রিয়া উড্ডীন যোগ দিতে পার। শ্রীমান.......ইহাদের ক্রিয়া মন্দ হইতেছে না। সময়ে সময়ে বড়ই বিক্ষিপ্ত হইতেছে। তাহার কারণ এই ঠিক দেখিতে পাইতেছে না ও মন স্থির হইতেছে না। ইহাদের কার্য শীঘ্র হইবে। শ্রীমান.......এর উপস্থিত বড়ই বিক্ষিপ্ত অবস্থা। তাহাকে সাবধান করিয়া দিবে। চিন্তা করিতে নিষেধ করিয়া দিবে।

তোমার অনেক শিষ্য, অল্প দুঃখে অতি কাতর, অল্প সুখে অতি সন্তোষ হয়—তাহারা জানে না যে জগতে প্রথমে দুঃখ ব্যতীত সুখের আশা নাই। যাহাদের খুব অশান্তি তাহারা যাহাতে শীঘ্র শান্তি পায় তাহারা বিশেষ চেষ্টা হইবে। চিন্তা নাই। শ্রীমান.....কে সাবধান কর তাহার বোধ খুব কম, বিশেষ বিবেচনা করিয়া কোন কার্য করিতে পারে না। তাহার বিষয় তুমি দেখিবে না।

যাহা করিতে হইবে বা দেখিতে হইবে আমার দ্বারাই হইবে। সেরূপ নির্বোধ শৈথিল্য লোক আশ্রমের উপযুক্ত নয়। সে ইচ্ছা করিলে পরম যোগী হইতে পারে। আমি তাহাকে দুই তিনবার ক্ষমা করিয়াছি।

আশ্রমের অনেক অর্থ ও কার্য নষ্ট করিয়াছে তাকে খুব সাবধান কর। তুমি যেরূপভাবে তাহাকে হৃদয়ের ভাবে করিতে চাও, সেভাবে সে গ্রহণ করিতে চায় না, সে জিনিস্ তাতে নাই। তবে যোগ্য অধিকারী হইলে হইতে পারিবে।

কেউ জানে না ভৃগুরাম স্বামীর আশ্রমের কেউ জানেনা যে ভৃগুরাম স্বামীর আদি, অন্ত মধ্য নাই, কেউ জানে না যে ভৃগুরাম পরমহংসের গুরুদেবের বাণলিঙ্গ অলেহ্য।

সংসারে সব আশ্চর্য্য। শান্তি কেউ চায় না। আমার উদ্দেশ্য মহাপাতকদিগকে উদ্ধার করিব, তাতেই পাপীদিগকে স্বর্গ সুখ দিবার জন্য তোমায় শিষ্য করিতে বলা।

করি এক সবে করে এক। শ্রীমান...... এর বিষয় ত্রিপুরা ভৈরবী মাতাকে বেশ করিয়া বলা হইয়াছে। তিনি কার্য করিবেন। তাহার সম্পূর্ণ শুভ হইতে এখনও সময় আছে। তাঁর জন্য তুমি ব্যস্ত হও কেন? কদাচ তার জন্য কোন বিষয় লিখিবে না।

চতুর্থ পত্র

গাগরি পাঞ্জাব
১৮৩০
কৃষ্ণপক্ষ।

নারায়ণ স্মরণবরেষু—

পরমহংস জ্ঞানানন্দ স্বামীর শুভ সংবাদে যথাবিধানে সম্ভাষণ পূর্বক বিজ্ঞাপন—

তোমার প্রেরিত শুভ সংবাদে পরম সন্তোষ হইলাম। যেখানে আছ সেখানে আনন্দ বা নিরানন্দ কোথায়? সে যে অব্যক্ত পদ। গুরুবাক্য বিশ্বাস করিয়া ক্রিয়াদি করিয়া ব্রহ্মের অণুতে থাকা, এই ত পরম পদ। না, আর কিছু আছে? তবে কেন ব্যস্ত হও? সে পদে গেলে সমস্ত এক ব্রহ্মময় হয়, নিজে তাতে এক, কাজেই আর কিছু থাকে না। এই ব্রহ্ম যে কিছু নয়, অবস্তু; আবার অবস্তুই বস্তুভূতে প্রকাশ হইয়াছে। যখন দুইই এক তখন সেই একই নিত্য, নির্মল, শিবস্বরূপ, ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপক অব্যক্ত।

তিনি কূটস্থ ব্রহ্মরূপ তাঁহা হইতেই সৃষ্টি ও অন্তে লয়, তিনি পরম ব্যোম স্বরূপ, ত্রিগুণাতীত—সত্ত্ব, রজঃ, তমাতীত সৎ। অগ্রে গুরু বিচার তারপর আত্মচিন্তন, মনন, ধ্যান।

তুমি যেমন গুরুদেবের ইচ্ছানুসারে কার্য করিয়াছ, করিতেছ সমস্ত প্রকাশ পাইয়াছে, তবে তোমার শিষ্যরা জ্ঞানের অধিকারী কেন না হইবে? কেন জন্মিবে। সবই ত জান, জানিয়াও অনেক বিষয় ব্যস্ত হও কেন? তাকি বুঝ না? মঙ্গলদাতা বিধাতা নির্বিকার বিকারময় সাকার ভাবেও; পাত্রে পারদবৎ আপনাকে আপনি স্পর্শ করেন না।

প্রাণী সম্বন্ধেও তাদৃশ বিধান স্পষ্ট রহিয়াছে। ভ্রান্তি কুজ্ঝটিকা আবরণ ঘুচাইতে পারিলে জীবত্বের উজ্জ্বল তত্ত্ব প্রকাশ পায়। তথাপি সংসারের বিভিন্ন প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া পতঙ্গের ন্যায় পাপানলে দগ্ধ হয়। পূর্ণ পরমেশ্বরের কার্যে পক্ষপাতিত্ব কখনই নয়। ইহা কি সম্ভবে?

প্রকৃত কার্য করিলে কখনই অকাল মৃত্যু হয় না। তোমার শিষ্যের মধ্যে দুই তিনটি প্রকৃত কার্য্য করা দূরে থাকুক, কিছুই করে না। কাজেই তাহাদিগকে অকালে কাল-সদনে যাইতে হইবে বই কি? তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দাও।.......র আয়ু শেষ হইয়াছে।

৬ই বৈশাখ বেলা সাড়ে দশটার পরে তাহারা কাল পূর্ণ হইল। এ জগতে তাহাকে আর পাইবে না। তবে তাহাকে জঠর যন্ত্রণা আর ভোগ করিতে হইবে না। তোমার সমস্ত শিষ্যদের জন্য ত্রিপুরা-ভৈরবীমাতা একটি যাগ করিতে প্রস্তুত আছেন। উক্ত যাগের কারণ আশ্রমের জমা টাকা একশত এক টাকা (১০১) পাঠাও। তিনি যাগ করিলে শিষ্যদিগের অশুভ বলিয়া কিছু থাকিবে না।

অতএব যত শীঘ্র পার প্রস্তুত হও। অন্যান্য বিষয় পরে লিখিতেছি। পরমারাধ্য গুরুদেব মনোহর তীর্থে গিয়াছেন। আশ্রমের কার্য্য সমাধা না হওয়ার কারণ কেহ যাইতেছেন না।

পরম পূজ্যপাদ ভৃগুরাম স্বামী দুই তিন দিবস যাইয়াছিলেন। তঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করিলে আশ্রমের দেবালয়ে পৃষ্ঠদেশে অমাবস্যা কিম্বা পূর্ণিমা মহানিশায় দেখিতে পাইবে। সকল শিষ্যের বিষয় পরে লিখিতেছি।

পঞ্চম পত্র

ওঁ তৎসৎ

পাঞ্জাব আশ্রম — *পাঞ্জাব জ্ঞানগঞ্জ হইতে*

স্বামীজী!

নারায়ণ স্মরণবর বিশুদ্ধানন্দ তীর্থস্বামী বা পরমহংস ভায়া নারায়ণ স্মরণবরেষু,

নারায়ণ স্মরণবর পরমহংস ভৃগুরাম স্বামীর শুভ সংবাদে যথাবিধানে সম্ভাষণ পূর্বক বিজ্ঞাপন পরম্—

তোমায় প্রেরিত শুভ সংবাদে পরম সন্তোষ হইলাম। শ্যামা ভৈরবী মাতাকে যাহা টাকা পাঠাইয়াছ তাহা তিনি পাইয়াছেন। তুমি যে সকলকে বর্তমান সময়ে শিষ্য করিয়াছ আমি তাহাদের নিকট প্রতিদিনই যাই, ও সম্যক্ দৃষ্টিরূপে প্রতি ঘরে ঘরে বেড়াই।

আমি সমস্তই দেখি, তোমার দেখিবার প্রয়োজন দেখি না। তোমার শিষ্যের যে সকল কার্য দেখি, তাহাতে অধঃ উর্দ্ধ দুইই আছে। যে সকল শিষ্য একবার দীক্ষা লইয়া পুনরায় তোমার নিকট দীক্ষা লইয়াছে, তাহারা যেন তোমার পদস্পর্শ না করে, করিলে তাহাদের সমস্ত ক্রিয়া নষ্ট হইয়া যাইবে।

তাহাদের পদস্পর্শের অধিকার হইলে তবে স্পর্শ করিতে পারিবে নচেৎ দুই তিন বৎসর স্পর্শ যেন না করে। শুদ্রেরা স্পর্শ করিলে ক্ষতি হইবে না, কারণ তাহাদের

সে বস্তু নাই। শ্রীমান....র বিষয়ে আমাদের আপত্তি নাই, সে যাহাতে সন্তোষ থাকে সেরূপ কার্য করিতে পারে।

তুমি তাহার প্রতিবন্ধক হইবে না, প্রতিবন্ধক হইলে তোমার সমূহ ক্ষতি হইবে জানিবে। যে চারিটি ভৈরবীর....ব্যবস্থা করিয়াছে তাহাতে ভৈরবী মাতারা স্বস্তি করিয়াছেন। আর চারটি ভৈরবী সেখানে থাকিবেন ও হঠযোগী আটটি থাকিবেন। আর বারটির জন্য তুমি প্রস্তুত হও।

তাঁহাদের ব্যবস্থা যেরূপভাবে করিতে হইবে তাহা তুমি জান। আমার আশ্রমটি বাণের নিকট করিলেই ভাল হয় বা পূর্বেই যাহা ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাই করিতে পার। অন্যান্য সমস্ত বিষয় পরে লিখিব।

শ্রীমান....আশ্রমটি করিয়া দিবে বলিয়াছে। তাহার সময়ে সময়ে বিক্ষিপ্ত অবস্থা হয়; কাজেই তাহার দ্বারা সমস্ত কার্য শেষ হওয়া৷ ভাবের অভাবে মাত্র জানিবে।

আমি আমি, কি আমি তুমি, কি জগৎ আমি, তাহা আমি জানি না—তবে যাহা লিখিব বা বলিব তাহা অব্যর্থ। দিবারাত্রি আলো অন্ধকার দেবদ্বিজ না থাকিতে পারে। সৃষ্টি লয় হইতে পারে, দেবতাদের কার্য ধ্বংস হইতে পারে, কিন্তু আমি যাহা বলিব তাহা ঠিক এবং তাহাই সত্য।*

পরমাধ্য গুরুদেব তিনি আমায় লইয়া এবং তাঁহাকে আমি লইয়া মনোহর তীর্থে যাইতেছি। শিবরাত্রির সময় একবার না একবার আমার ক্রিয়া সকলেই বুঝিতে পারিবে। আশ্রমের অধিকারী তুমি নও, তোমার শিষ্যেরা; তাহাদের আদেশমত তুমি আশ্রমে যাইবে বা কার্য করিবে, নচেৎ তোমার সমস্ত ক্রিয়া ধ্বংস হইবে। ক্রিয়ার দ্বারা কাহারও বিষয় কদাচ করিবে না বা দেখিবে না-আমি বলিতেছি অন্য কেহ বলে নাই।

ভাই বিশুদ্ধানন্দ, তবে তুমি আমি কে, ভাই? তাহা জানি না, জানিবার ইচ্ছাও করি না। জগৎ মিথ্যা, মানসিক মানবীয়ভাব সত্য। তাহাতেই বলি সত্য মিথ্যা এক হইল। বিচার করিয়া কার্যকর বা বিচার না কর গুণে ভাবে এক ভেবে যাহা করিবে, তাহাই ঠিক।

তুমি আমি উপাধিকারী মাত্র। এক ছাড়া জগতে দ্বিতীয় বস্তু কি আছে ভাই? যদি থাকে তাহাই আছে। তাহাতেই বলি জগৎ মিথ্যা সত্য সত্য প্রকৃতির খেলা কি না।

---

* তুলনীয় Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away —Mathew (24.35)

এ খেলার খেলা যিনি, খেলাইতেছেন তিনি জানেন না, যিনি জানেন তিনিই জানেন। জ্যোতির্ময় জ্যোতি, যে জ্যোতি, দেখিতে ইচ্ছা করিলে বা দেখিলে বলা যায় না—জ্ঞানে ভক্তি আসিয়া ভাব হয়, তাহাই ঠিক।

সকলেই ক্রিয়া করিলে অমরত্ব প্রাপ্ত হইবে। কেহ মরে না, কেহ বাঁচে না—মরা বাঁচা স্থূলের খেলা। তাহাতেই বলি জগৎ মিথ্যা ব্রহ্ম সত্য।

ব্রহ্ম কি ভাবিবার বিষয়, অন্য কিছু নয়। তুমি আমি এবং জগৎ। তবে তুমি আমি কে, ভাই?

আশ্রমের অর্থ আশ্রমের সন্ন্যাসীদের জন্য, তোমার আমার নয়। যাহারা অধিকারী তাহারা অধিকার করিবে। তবে তুমি আমি কে ভাই?

তুমি ভাই এবার পরমহংস হইলে, তবে পরীক্ষা দিতে হইবে।

ষষ্ঠ পত্র

(পত্রাংশ)

........আমাদের অনুমতি ব্যতীত তোমার শিষ্যদের বা অন্য কাহারও বিষয় যোগক্রিয়া বা জ্যোতিষের দ্বারা দেখিবে না। যে মুহূর্তে দেখিতে ইচ্ছা করিবে, সেই মুহূর্তে তোমার এতদিনের ক্রিয়ার সমস্ত ফল ধ্বংস করিব। আমি বলিতেছি অন্য কেহ বলেন নাই।

আমি কি তাহা তুমি বিশেষ জান। আমি তোমার সমস্ত শিষ্যের বিষয় দেখি। শীঘ্রই একজন সন্ন্যাসীকে পাঠাইবার মানস করিয়াছি, তোমার সমস্ত শিষ্যের পরীক্ষার জন্য।

ক্রিয়া ভাল করিলে উপাধি পাইবে এবং অলৌকিক একটি ক্রিয়া দেওয়া হইবে, যাহাতে সপ্তাহ মধ্যে ফল দেখিতে পাইবে।

আশ্রমের বিষয় তৎপর হও। যাহা করিবে তা বলিবে না, যাহা বলিবে তাহা করিবে না। গুহ্য বিষয় ব্যক্ত করিলে ক্রিয়া নষ্ট হয়। এই পত্রখানি কামাখ্যায় পাঠাও। নকল পাঠাইবে।......কে যে ক্রিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাই করুক।

পশ্চিম আসিতে ইচ্ছা করিলে.....কে ভিন্ন কাহাকেও লইয়া আসিবেনা। শিব চতুর্দশীকে অতিক্রম করিয়া তবে আসিবে। শিব চতুর্দ্দশীতে আশ্রমে আমার দুই একটি খেলা দেখিতে পাইবে। আমার জন্য আশ্রমের কিয়দ্দুরে বিটপী? বৃক্ষের তলদেশে ক্ষুদ্র করিয়া একটি আশ্রম কর। যাহারা ক্রিয়াতে অধিকারী হইয়াছে,

সেইরূপ শিষ্যের নিকট অর্থ লইয়াও....র নিকটে কথঞ্চিৎ লইয়া আশ্রমটি কর। অতিশয় ব্যয় বাহুল্য না হয়।

.....কে লইয়া উপস্থিত এ বৎসর পশ্চিম আসিবে না, আসিলে তাহার ক্রিয়াও সমস্ত নষ্ট হইয়া যাইবে। তাহারা নিকট হইতে কিছু অর্থ আমার আশ্রমের জন্য লইতে পার।

তাহার জন্য নির্দ্ধারিত বিষয় এখন তাহাকে দিবে না, আমি বলিলে তাহাকে দিবে। আশ্রমে যাইয়া তোমার সকল শিষ্য শঙ্করের নিকট যোনি মুদ্রা করিয়া বসিলে সাক্ষাৎ দেখিতে পাইবে।

ক্রমান্বয়ে দেখিবে। দুঃখ ব্যতীত এজগতে সুখের আশা কম। ঠিক ঠিক ভাবে ক্রিয়া করিলে মৃত্যুঞ্জয় হইতে পারিবে। ভাই, তুমি এইবার পরমহংস হইলে পরীক্ষা নিমিত্ত মাত্র জানিবে। ইতি

সপ্তম পত্র

ওঁ তৎসৎ

জ্ঞানগঞ্জ
পাঞ্জাব আশ্রম
১৮৩৫ শুক্লপক্ষ

নারায়ণ স্মরণবরেষু,—

পরমহংস ভৃগুরাম স্বামীর শুভ সংবাদে যথাবিধানে সম্ভাষণ পূর্বক বিজ্ঞাপন পরম্—

যথা স্বপ্নে দ্বয়াভাসং চিত্তং চলিত মায়য়া।
তথা জাগ্রদ দ্বয়াভাসং চিত্তং চলতি মায়য়া।।
অস্তি নাস্তীতি নাস্তীতি নাস্তি নাস্তীতি বা পুনঃ।
চল স্থিরোভয়াভাবৈরাবৃণোত্যেষ বালিশঃ।।

যখন কর্তৃত্বপদকে পায় অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় কাজের এক বোধ হয়। এক বলিলেই এক হয় না। মন সকল দিকেই যাউক না কেন,—কার্যের সময় ক্ষণকালের জন্য ঠিক থাকিলে যোগের উপদেশ আমাদের যেমন সহজসাধ্য, তাহাতেই প্রত্যক্ষ হইবেই হইবে। তবে আসন ঠিকভাবে হওয়া কর্তব্য।

উপযুক্ত গুরু ব্যতীত যোগপ্রাপ্তি কোন যুগে, কোন কালে, কোন মতে হইবে না। "তরতি শোকমাত্মবিৎ" ইতি। যিনি আত্মাকে জানেন তিনিই শোক হইতে পরিত্রাণ

পান। তাঁহাকে পরব্রহ্ম জানিও। তিনিই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম জানিয়া পরমপদকে পায়। তবে তুমি কে—আমি কে ভাই?

বিশুদ্ধানন্দ ভাই আর নারে, আর না—তোর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। সংসার শ্মশানভূমির ভীষণ দর্শনেও অসারকে সকলে সার ভাবে। প্রকৃত সত্যকে উপেক্ষা করিয়া আমিত্বের দাসত্ব বাধ্য হয়। বিশে ভাই, আমিত্ব কি ভয়ঙ্কর! কিছুতেই মানব প্রকৃতিকে উচ্চ আদর্শের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেয় না।

ইহাতে আবার মায়ার বিবিধ প্রলোভন উপস্থিত। কিন্তু ইহা কি কর্তব্য নহে যে এই সকল বিঘ্ন বিড়ম্বনা সত্ত্বেও গন্তব্য পথের [পথ]? স্থির রাখিতে হইবে? মুহূর্তে সময়েই যদি শ্মশান-বৈরাগ্যকে আসক্তির পদতলে নিক্ষিপ্ত করে তাহা হইলে কি হইল? অন্তঃ সলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় পবিত্র বৈরাগ্যকে অন্তরের জাগ্রত রাখিয়া প্রত্যেক ঘটনার মধ্যে প্রবেশ করিলেই সংসারের নিষ্কলঙ্ক বিশুদ্ধ সত্যের অনুষ্ঠানে অনায়াসেই শান্তিলাভ হইতে পারে।

ঠিক জ্ঞান কি? বস্তুতঃ জ্ঞানের মৌলিকত্ত্ব চেতন শক্তি। যোগীরা ইহাকে স্বরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। স্মৃতি, বুদ্ধি, বাক্য, মন, দর্শন, শ্রবণ এ সকল ঐ শক্তিরই বিকাশ। ইহারাও শম, দম, তিতিক্ষা ও দ্বেষ, দম্ভ, হিংসা, প্রভৃতি শুভাশুভ উত্তম বৃত্তির মধ্যে বিচরণ করে [করতে?] জ্ঞান স্বরূপ বিধাতা সকল প্রকার ব্যক্তিকেই স্বাধীনতা দিয়াছেন।

তাহারা সেই স্বাধীন শক্তি বশে সুখ, দুঃখ শান্তি ও অশান্তি ভোগ করিতেছে। পশুপক্ষীর মধ্যে সীমাবদ্ধ জ্ঞানের বিধানেও কোন যন্ত্রণার কারণ দৃষ্ট হয় না। কিন্তু উচ্চ জ্ঞান বিশিষ্ট মানবগণ স্বাধীন শক্তির—স্বার্থ প্রলোভনে পড়িয়া জ্ঞানকে নানাভাবে গ্রহণ করে।

মানবের চিন্তাশক্তি সকল অপেক্ষা উন্নত। এ জন্য কেহ গুরু-ব্রহ্মের অস্তিত্বই স্বীকার করে না, একেবারেই উড়াইয়া দেয়। তাহার প্রমাণ তুমি ও তোমার শিষ্য বুঝিতে হইবে। এই যে জ্ঞান বিভ্রাট্ ইহার দুইটি কারণ আছে।—

একটি শাস্ত্রে অবিশ্বাস, আর একটি রুচিগত স্বার্থচিন্তা। এই দুই অনুদার ভাব দ্বারা সরল প্রকৃতিকেও সন্দেহের তরঙ্গ ঘোরে আকুল করিয়া তোলে। নদী যেমন বাধা প্রাপ্ত হইলে বহুদিকে প্রবাহিতা হয়, তেমনি তেজস্বী মনস্বীরাও স্বার্থ চিন্তার উত্তেজনায় বিবিধ প্রকার যুক্তি পথে ছুটতে থাকে। অনাবৃত সরল তত্ত্বের প্রতি তাহাদের আদতেই দৃষ্টি পড়ে না। যদি পড়িত তাহা হইলে সত্যের এত অনাদর হইত না, বর্ধমান আশ্রমের এত বিভ্রাটও ঘটিত না।

অন্য শিষ্যের দ্বারা কার্য চালাইবে। যাহারা এভাব তাহার নিকট আমার নির্দিষ্ট আশ্রমের ভার গ্রহণার্থ সকলে অর্থ গ্রহণ করিবে না। নররূপী পিশাচ ....১৩১৯ সালে তোমায় কিভাবে পত্র লিখিয়াছি তাহা মনে আছে কি?

সেই হইতেই তাহাদের উপর আমি বিরূপ। পিশাচ তোমার নাম করিয়া না করিয়াছে এমন কর্ম নাই। অতি পাতক সমগ্র নষ্ট করিতে বসিয়াছে।

তাহাকে তুমি সাবধান করিতে যাও। তুমি সাবধান করিয়া কি করিবে?....ঐরূপ ব্যবহার প্রায় ধরিয়াছে। ঐরূপ প্রবঞ্চক হওয়াতেই ঐরূপ ঘটনা হইতেছে। কাহার উপর কৌশল পাতিয়া সকলে কার্য করিতেছে।....একটি প্রধান অন্ত্যজ। সে না পারে এমন কোন কার্য নাই।

আরও জানিতে চাও তাহাদের সমস্ত বৃত্তি এবং সকলের সমস্ত বৃত্তি লিখিব! ......প্রভৃতি নরাধমদিগকে সাবধান হইতে বল। শুভ চায় ত সাবধান হইতে বল। তোমার নাম করিয়া যে সকল কার্য যাহার নিকট করিয়াছে বা বলিয়াছে তাহার নিকট যাইয়া সমস্ত সত্য বলিতে বল।

এখনও যদ্যপি ভাল চাহে। তুমি আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর বস্তু। তোমাকে যখন বলিয়াছি তখন তাহা বলিতেছ বা করিতেছ। তুমি যাহা দেখ না বল না বা কর না, তোমার জন্য আমি সমস্তই করিতেছি।

তোমার দাস আমি, অথচ তুমি আমার দাস হইতে পার। তুমি আমি, আমি তুমি-তুমি জান না। অথচ ঐ দুষ্কৃতেরা অনেক কার্য করিয়াছে। যাহা করিয়াছে তাহা সমস্ত মিথ্যা।

সমস্ত প্রকাশ করুক তাহা হইলে অনেক পাপের লাঘব হইবে। তাহা হইলে ত্রিপুরা ভৈরবী তাহাদের জন্য-কার্য করিবেন। ৯ই ভাদ্র হইতে...যে ভাল গ্রহ পড়িবে তাহার দ্বারা শুভ কিছুই হইবে না, বিশেষ ক্রিয়া করিতে হইবে।

তাহাকে সংবাদ দাও। আসিলে পত্রের মর্ম সমস্ত বুঝাইয়া দাও। তোমায় এত বিশৃঙ্খলতা দেখিতে হইত না, তোমায় এত উদ্বিগ্ন হইতে হইত না। ১৩১৮ সালের ১৩ই আষাঢ় বর্ধমান আশ্রমে বসিয়া বেলা ঠিক দ্বিপ্রহর কি ভাবিলে? গুষ্করা হইতে তোমায় যখন বর্ধমানের শিষ্যরা বর্ধমানে আনিল, তখন কি ভাবিলে? ভাবিলে এইবার ধর্মের উন্নতি হইবে।

সকলকে রীতিমত যোগশিক্ষা দিয়া পরম আনন্দে সকলে থাকিব, শিষ্য সকল জাতিস্মর হইবে, ত্রিকালজ্ঞ হইবে—কি আনন্দই হইবে। এখন কি হইতেছে ভাই? তখন আর এখন। তোমার শিষ্যসকল ফল্গুনদীর ন্যায় থাকিয়া তোমার দ্বারা সকল কার্য্য করিয়া লইবে।

হাঁরে, দাস প্রভু যে চেনা ভার-রে! অথচ সাবাস লওয়া চাই। ধন্য কাল প্রভাব! তোমার সেবাযত্ন দূরের কথা—অন্তরালে থাকিয়া মজা দেখিব।

কি দূরদৃষ্টের কথা। ইহাতেই তাহারা ধার্ম্মিক ও যোগী হইবে। কোন কার্য না করিয়াও—গুরুর যত্ন গুরুর কার্যে কেহ বাধা না দেয়; এরূপ করিলে যে সিদ্ধ ও সর্বজ্ঞ হয় তাহা তাহারা জানে না।

আশ্রমের সুবন্দোবস্ত সকল শিষ্য যদি না করে তাহা হইলে তুমি তথায় থাকিবে না, অন্যত্র যাইবে কিম্বা আমাদের নিকট থাকিবে। আর যথেষ্ট হইয়াছে। বর্দ্ধমান আশ্রমের ভার যাহার, তাহার উপর ন্যস্ত করিয়া তুমি চলিয়া আসিবে।

ঐ আশ্রম হইতে যাহা হইবে ভৈরবীদের হইবে। যদ্যপি শীঘ্র তাহারা উত্তমরূপ বন্দোবস্ত করে তাহা হইলে যতদিন ইচ্ছা বর্দ্ধমান আশ্রমে থাকিতে পার।

আমি অনেকবার বর্দ্ধমান আশ্রমে যাইতেছি। বর্দ্ধমান আশ্রমের ভার আমি যাহাদের উপর ন্যস্ত করিতেছি, তুমি তাহাদের উপর ন্যস্ত কর।

উহারা যাহাকে বা যে শিষ্যকে ইচ্ছা তাহাকে লইয়া কার্য করিতে পারিবে। ইহারা যাহা বলিবে বা যাহা করিবে সকল শিষ্যই তাহাতে স্বস্তি করিবে।

স্বস্তি না করিলে আমি তাহার বিশেষ বিধান করিব। দুই হাজার শিষ্যের মধ্যে পনের শত শিষ্য বাদ দিব।.........।

অষ্টমপত্র

নারায়ণ স্মরণবরেষু,—

পরমহংস উমানন্দ স্বামীর শুভ সংবাদ যথাবিধানে সম্ভাষণপূর্বককং বিজ্ঞাপন পরং।

পিতৃসন্নিভ! মহাদুঃখ ও মহাভয়ই বন্ধু। মহাশক্তি মহামায়া জগৎ প্রসবিনীর নাম সূত্রে অসীম আকাশে স্থিতিরূপা। মহাশক্তি মহানুগ্রহ ব্রহ্মনিষ্ঠা সদব্রাহ্মণ মহাবিজ্ঞান যিনি জগৎ প্রসব করিতেছেন এবং যিনি তাঁহাকে প্রসব করিয়াছেন তাহার তত্ত্বই সর্বদা অনুসন্ধানে যিনি রত এবং করিতেছেন মেঢ্রে-চতুর্দ্দল; কণ্ঠে ষোড়শদল; চক্ষে দ্বিদল, মস্তিষ্কে-সহস্রদল প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

তিনি যোগবিজ্ঞানে পরমযোগী। তিনি যাহাকে যেভাবে শিক্ষা দিবেন, উক্ত আদেশ অনুযায়ী যিনি কার্য করিবেন নিশ্চয় তিনি প্রত্যক্ষ করিবেন ও বিজ্ঞান শিক্ষা অনুযায়ী ত্রৈলোক্যমণ্ডলং সূর্যস্য বিজ্ঞানং শিক্ষা করিলে সকল বিষয় অধিকারী হইবেন।

আবশ্যকীয় দ্রব্য ও দেবদেবীর দর্শন মুহূর্তমধ্যে প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

অবশ্য সময় সাপেক্ষ। যিনি বিশ্বাস ও ভক্তিশূন্য গুরুবাক্য বিশ্বাস নাই শাস্ত্রবাক্যে অবহেলা করেন, তিনি নিশ্চয় মূলধনে বঞ্চিত হইবেন, চিরকাল দুঃখভোগ করিবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আপনি যে সকল বিজ্ঞান যন্ত্রের বিষয় লিখিয়াছেন তাহা পাইতে দেরী হইবে।......পরে সমস্ত লিখিব।

পূর্বপত্রে অনেক বিষয় আপনাকে লিখিয়াছিলাম, তাহা পরমারাধ্য পূজ্যপাদ গুরুদেবের আদেশনুযায়ী। তিনি যেরূপ আদেশ করিয়াছেন, তাহাতে আপনার শিষ্যদের মধ্যে সরলতা নিষ্ঠাবান শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস খুব কম।

যাহারা লোকের নিকট সৎ বলিয়া পরিচয় দেয়—তাহারা নিতান্ত মূঢ় ও মহাপাপী। এইসব দেখিয়াই আপনাকে সকল তত্ত্বের বিষয় জানিবার খুব যে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা বন্ধ রাখিয়াছেন।

পাছে আপনার মানসিক বৃত্তি তাহাদের দেখিয়া খারাপ হইয়া যায় এবং যোগবিজ্ঞানের অনিষ্ট হয় সেইজন্য। আপনি কোন বিষয়ে চিন্তিত হইবেন না আশ্রমের সকল বিষয় সেইজন্য আপনাকে সঠিক তিনি লেখেন না বা বলেন না।

আমি তাঁহার আদেশ অনুযায়ী লিখিতেছি। আমার এ বিষয়ে কোন দোষ নাই। আপনার ব্রহ্মচারী শিষ্যের মধ্যে অনেকই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এখন তাঁহারা এইখানে থাকিবেন, পরে যেরূপ আদেশ করিবেন সেইরূপ কার্য করিব।

যে পত্রে বিশেষ আবশ্যকীয় গুপ্ত বিষয় আছে তাহা কোন শিষ্যের নিকট বা কাহারাও নিকট এখন প্রকাশ করিবেন না। পূর্ব পূর্ব পত্রে যাহা আছে যাহা ছাপাইতে আদেশ করিয়াছেন, তাহা এখন বন্ধ রাখিবেন।

বিবেচনা অনুযায়ী কার্য করিবেন ও ছাপাইবেন। আপনার অনেক শিষ্যের মধ্যে সেব্য-সেবকের ভাব বেশ আছে, তবে অহং শুষ্কজ্ঞানের তীব্রতাপে বিশুদ্ধ তত্ত্বের স্পর্শযুক্ত বা আস্বাদন বুঝিতে পারে না। তাহাদের ৫/৬ বৎসরের মধ্যে বিশ্বজনীন প্রেম উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইতে পারে।

অনেকের ভিতর বেশ কার্য হইতেছে, অথচ অস্ফুটভাবে রহিয়াছে বটে ও ভাবিতেছে এতদিন কার্য করিতেছি কি হইল? নিজের দোষ নিজে বুঝিতে পারিতেছে না। তাহার কারণ শুদ্ধ আত্মগরিমা। আত্মগরিমা ঝটিকা বন্ধ হইলেই পাইবেই পাইবে। যে পর্যন্ত আত্মাভিমান কর্মানুরাগ ত্যাগ না হইবে সে পর্যন্ত যোগ বিভ্রাট হইবেই হইবে। কারণ যে ক্রিয়া বা বীজ তাহাদিগকে দিয়াছেন তাহাতে সমস্ত দোষ ও ক্ষোভ বিরহিত।

ভাবিয়া দেখুন যোগীদের ইষ্টলাভ সত্ত্বেও প্রর্থনার বিরাম নাই। ইহা কি পরমানন্দের বিষয় নয়? তাঁহাকে পাইয়াও আশার প্রবল স্রোত অনিবার্য প্রবাহিত হইয়া থাকে। এই কারণেই জননী ও পুত্রের মধুর ভাবাদি শ্রেষ্ঠ।

গুরুদেবকে যদি আন্তরিক মন-প্রাণ উৎসর্গ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই স্বর্গীয় পবিত্রতার অধিকারী হয় এবং তাঁর কৃপায় চেষ্টা শূন্য হইলেও স্বভাবতঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

পরিণাম ব্যাপার পূজ্যপাদ স্বয়ং গুরুদেবই জানেন ও দেখিতেছেন। বগুল আশ্রমের প্রতি আর দৃষ্টি নাই কেন? তাহা তাঁহার জানিতে বিশেষ ইচ্ছুক। যাঁহার দৃষ্টি পড়িবে তাঁহার নিশ্চয়ই মহাভাবের আবির্ভাব হইয়া কাম ক্রোধাদির অসার ভাব বিনিষ্ঠ হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের প্রবল জ্যোতি প্রকাশ কলুষিত চিত্ত দূর হইয়া অপার আনন্দ আসিবেই আসিবে।

আশ্রমের যে কার্য্যই হউক—আপনি দৃষ্টি রাখিবেন। আদান-প্রদান প্রভৃতি কার্যে নিজের নিকট শিষ্য রাখিয়া বলিয়া দিবেন বা নিজে করিবেন, তাহা হুইলে শিষ্যদের কোন আপত্তি থাকিবে না।

পরমারাধ্য পূজ্যপাদ ভৃগুরাম পরমহংসদেব তিনি সমস্ত আশ্রমের আয় ব্যয়াদি সমস্ত কার্য দেখিতেছেন; আপনি দেখিবেন না ইহার কারণ কি? যিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কেন সমস্ত জগতের ব্যাপার দেখিতেছেন এবং বিচার করিতেছেন তাহার দণ্ড ও পরিত্রাণ দিতেছেন?

আপনি না যদি দেখেন বা করেন তাহা হইলে আপনাকে বিশেষ দত্ত পাইতে হইবে এবং ক্রিয়াদি সমস্ত কাড়িয়া লইবেন ! আপনাকে পূর্বের ন্যায় দরিদ্র ব্রাহ্মণবেশে বেড়াইতে আজ্ঞা দিবেন। আমার কোন দোষ নাই। তাঁর আজ্ঞা এবং তিনি সম্মুখে থাকিয়া আদেশ করিতেছেন। বিশেষ বিবেচনা করিয়া কার্য করিবেন।

পরে সমস্ত বিষয় আরও লেখা হইবে। পূর্বে বলা হইয়াছে বিজ্ঞানের কার্য আরম্ভ হইলে যে সকল শিষ্য আপনার নিকট থাকিবে কার্য করিবে। তাহাদের আয় ব্যয় যে সমস্ত হইবে, সমস্ত আশ্রম হইতে দেওয়া হইবে, তাহাদের কোন বিষয়েই অভাবের কারণ যাহাতে না থাকে তাহার ব্যবস্থা হইবে।

আশ্রমের সেবা কার্যাদি মিতাহারীর ন্যায় ব্যবহার হইবে। ভোগ-যাতনা আরম্ভ হইলে কোন কার্য্যই সুসিদ্ধ হইবে না। লালসা না ত্যাগ হইলে বিশুদ্ধ আনন্দের আশা কোথায়? পরে সমস্ত বিষয় তাঁহার আদেশ অনুযায়ী লিখিব। আপনার অনুগ্রহ প্রার্থী, আপনা অপেক্ষা বয়স অধিক হইলেও আমি আপনার দাস, আমার কোন দোষ গ্রহণ করিবেন না।

আমাকেযাহা বলিলেন আমি তাহাই লিখিলাম। ক্রিয়া সম্বন্ধে পূর্বপত্রে যাহা লেখা হইয়াছে যোগ-জ্যোতিষ প্রভৃতি উপযুক্ত শিষ্যকে এইবার দিতে পারিবেন। সূর্যবিজ্ঞান সকল শিষ্যকে দেখাইবার নিয়ম নয়, উপযুক্ত বোধে দিবেন। কারণ ইহার দ্বারা না হইতে পারে এমন কার্য কিছুই না। পরমারাধ্য পূজ্যপাদ ভৃগুরাম পরমহংসদেব কাশী ও বণ্ডুল আশ্রমে গিয়াছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে যান। আপনার মানসিক বৃত্তি পরীক্ষার জন্য নানা ঘটনা করিয়াছেন ও করিতেছেন। ইহা আপনার শুভরই লক্ষণ। এখন আমি আসি।

—উমানন্দ স্বামী

নবম পত্র

ওঁ তৎসৎ

১৮৩৪/৪ শুক্লপক্ষ
পাঞ্জাব, জ্ঞানগঞ্জ আশ্রম।

নারয়ণ স্মরণবরেষু,

পরমহংস জ্ঞানানন্দ স্বামীর শুভ সংবাদে যথাবিধানে সম্ভাষণ পূর্বক বিজ্ঞাপন পরম্—

ভাই বিশুদ্ধানন্দ, তোমার প্রেরিত শুভ সংবাদে পরম আনন্দ লাভ করিলাম। ভাই, সংসার-সমুদ্র বিশাল, বিরাট, অনন্তের অনন্ত জলরাশি, দিক্‌শূন্য প্রবল তরঙ্গ, আবার ধীর, স্থির ও গম্ভীর। আবার কখন তরঙ্গ, কখন তরঙ্গ নাই, গর্জ্জন নাই, ভীম-ভৈরব নর্তন নাই, আছে কেবল আশাশূন্য আশাদায়ক শব্দ। চন্দ্রালোকজনিত স্ফীত, মধুর মিলনে সুধা ও গরল বা প্রাকৃতিক আকর্যণে বিকৃতি ভাবের ভাবে সিন্ধুজল কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, চলিতেছে, পড়িতেছে, কোথাও কোথাও বা ধীর তরঙ্গ-ভঙ্গ হইতেছে। কোথাও বা বিন্দুমাত্র আশা, সিন্ধুর ন্যায় আশাশূন্য; কোথাও বা সিন্ধু ন্যায় আশা, নিরাশা বিন্দুমাত্র। প্রকৃতির বিকৃতি-ভাব এখানে নাই। রম্য নিকেতনে সাম্যভাব অনেক স্বভাব(?) সে ভাবের শোভার সঙ্গমস্থলে বিক্ষিপ্ত মনের ভাঙ্গা-গড়ার কল্পনায় গুণ ডুবাইয়া ভাব লইয়া ভাবুক উপস্থিত। হাসা ছাঁদ ফাঁদে পড়ে চিরদিন হাসে। হাসা অরুণের বর্ণ বিবর্ণ, সোহাগ-শূন্য কিনা। ডুবি ডুবি করিতেছে। সম্মুখে সীমাশূন্য বারি অরিশূন্য হইয়া গা এলাইয়া চক্ষু বুজিয়া জগৎ-প্রকাশকের মহিমা প্রকাশ করিতেছে। কূলে এলেই আত্মহারা, নারায়ণের কৃপায় সীমাশূন্যের সীমা হয়। শক্তিশূন্য হইলে

নারায়ণও আত্মহারা হয়েন, তাহারা নিশানা আমরা তাঁহার এবং জগৎ। সবই ত জান, বেশ আছ, তোমার ন্যায় যথার্থ পুরুষেরই সংসারে থাকা কর্তব্য। মহাত্মা মহাপুরুষ ভগবান্ পরামারাধ্য দাদা গুরুদেব শ্রীমৎ ভৃগুরাম পরমহংসদেব তোমার বিষয় কত যে বলিলেন তাহা বর্ণনাতীত। তুমিই যথার্থ ভক্ত, মহাপুরুষ, যোগী, জ্ঞানী, ত্যাগী ও গৃহী। অসীম সহ্যগুণ অথচ ভেগী। দাদা গুরুদেব একদিন সকল যোগীকেই তোমার অসীম যোগের বিষয় দেখাইলেন, এখনও যে উগ্র তপস্যা করিতেছে তাহাও দেখাইলেন। ফিরে দেখি কিছুই নাই, চকিতে অন্তর্হিত। দেহ কণ্টকিত হইল পুনঃ দেখি জগত নাই, আমিও নাই। একি খেলা ভাই। তাই জিজ্ঞাসা করি জীবের অতীত বয়ঃক্রম হইল, অনেক ম্লেচ্ছ, হিন্দু, মুসলমান শিষ্য করিয়াছি, অনেক দেখিলাম, অনেক করিলাম, তোমার ন্যায় যোগশিক্ষা পরমারাধ্য ভৃগুরাম স্বামী আমায় দিলেন না। আমার ইচ্ছা তোমার নিকট কিছুদিন থাকিয়া চাত্বর এবং যাগ-কল্প যোগ শিক্ষা করি, ইহাতে অভিপ্রায় কি? জীবে শিবে পার্থক্য নাই, তবু মানে না! মঙ্গলময়ের রাজ্যে জীব যৌবনাবস্থাতে কাম-ক্রোধাদি অধীন হইয়া পাপ-পুণ্যাত্মক বিবিধ কর্ম আচরণ করে। আচ্ছা! জীব দেহের ভোগার্থই কর্ম আচরণ করে। দেহ আত্মা হইতে বিভিন্ন, আত্মা ত কিছুই ভোগ করেন না, যদি করেন তাহা হইলে পাপপুণ্যের ভাগী কে? এতে তোমার মত কি ভাই? ব্রহ্মচারী প্রায় নয়শত হইতে পরীক্ষা করিতে হইবে। এই চতুর্থ মঠের মত। তোমাকেই সকলে স্বস্তি করিয়াছেন। বোধ হয় শীঘ্রই তোমাকে পাঞ্জাব আসিতে অনুমতি করিবেন। ভৈরবী মাতাদের কুয়া যাহা...করিয়া দিবে তাহাকে কাটাই খরচ বারশত টাকা হইবে, বাঁধাই প্রভৃতি আলাহিদা লাগিবে। ভৈরবী মাতা তাহার বাড়ীর জন্য যাহা করিয়াছেন তাহাতেই তাহার যথেষ্ট হইয়াছে, ও তাহার বাড়ীর জন্য যাহা করিয়াছেন তাহাতে তাহাদের শুভ। তাহার জীবন রক্ষা হইয়াছে এবং অন্যান্য বিষয় শুভ হইবে। ইহা অপেক্ষা তাহার পক্ষেতাহার শুভের বিষয় আর কি হইতে পারে?.........তোমার একজন ভক্ত সেইজন্যই তাহার জন্য ভৈরবী মাতার দুই একটি ক্রিয়া করেন এবং করিয়াছেন। অষ্টমে রাহু প্রযুক্ত তাহার স্ত্রীর শরীর উপস্থিত সুস্থ থাকিবে। না।.... র বিষয়—এখন তাহার গ্রহ বিরুদ্ধ, পরে তিনি লিখিবেন। বর্ধমান শিষ্যদের সম্বন্ধে শীঘ্রই তিনি লিখিবেন। বর্তমান বর্ধমান আশ্রমে তোমার থাকা সন্দেহ। আশ্রমের নিকটে ক্ষুদ্র গৃহ নির্মাণ করিয়া কিম্বা আশ্রমের শিখর-দেশে গৃহ নির্মাণ করিয়া থাকিতে আদেশ করিবেন। চারটি ব্রহ্মচারী ও চারটি সন্ন্যাসী থাকিবেন। বর্ধমান আশ্রমের বন্দোবস্ত ত্রিপুরা ভৈরবী মাতা করিবেন। তাঁহার অবস্থায় তুমি তথায় থাকিতে পাইবে না। আশ্রমের নিকটেই ক্ষুদ্র গৃহ নির্মাণ করিয়া

ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী সহ থাকিবে।.....র বিষয় যাহা লিখিয়াছ তাহার বিষয় সমস্ত পরে লেখা হইবে। অন্যান্য সমস্ত বিষয় পরে লিখিব। এই পত্রের নকল করিয়া চন্দ্রনাথ শ্যামানন্দ স্বামীকে পাঠাইবে। ভাই শ্যামানন্দ, তুমি বিশুদ্ধানন্দের সহিত একবার সাক্ষাৎ করিবে। পূর্বে সে বিষয়ে লেখা হইয়াছিল, তাহার সাঙ্কেতিক চিহ্ন দেখাইয়া তাহার নিকট প্রকাশ করিয়া লিখিতমত কার্য করিবে। এ বিষয়ে তাচ্ছিল্য করিবে না, করিলে কি হয় তাহা বিশেষ জান। কলিকাতার ....এর বিষয় যাহা লিখিয়া ছিলে তাহার উপস্থিত ভাল কই? তাহার সকল বিষয়েই উপস্থিত খারাপ হইবে। পরে সুবিধা হইতে পারে। ত্রিপুরা ভৈরবী এই কথা বলিয়াছেন। তাহার ভাদ্রবধূর সহিত যাহা দ্বন্দ্ব হইবে সে দ্বন্দ্ব বৃথা সে না করে। বালিকার সহিত দ্বন্দ্ব করা অতীব অকর্তব্য।....পেটের অসুখের মত হইতে পারে। শীঘ্র সারিবে। তাহার ক্রিয়া ভাল হইতেছে। তাহার স্ত্রীর সম্বন্ধে যাহা করা কর্তব্য তাহা জ্ঞান ভৈরবী মাতা করিবেন। এখন আমি আসি—

দশম পত্র

ওঁ তৎসৎ

জ্ঞানগঞ্জ পাঞ্জাব

১৮৩৫ / ১১ / ১১

নারায়ণ স্মরণবরেষু,

পরমহংস ভৃগুরাম স্বামীর শুভ সংবাদ যথাবিধানে সম্ভাষণ পূর্বক বিজ্ঞাপন পরম্—

ভাই, সংসারের প্রত্যেক ব্যাপার মধ্যে ধ্যান অথবা চিন্তাশক্তি নিহিত আছে বটে কিন্তু তাহা প্রাকৃত। ঐ প্রাণিহন্তা ব্যাধ পাখীটির প্রতি যে অকম্পিত শর লক্ষ্য করিয়াছে তাহাকে কি বলিতে পারা যায় সে ধ্যানী? অথচ ইহার ভিতরে ভক্ত সাধুভাবে শিক্ষা গ্রহণ পূর্বক ব্যাধকেও গুরু বলিয়াছেন। এ স্থলে বুঝ স্পর্শমণি যেমন লৌহময় বস্তু সকলকে স্বর্ণ করিতে পারে, কিন্তু নিজে নিষ্প্রভ প্রস্তর, তেমনই ঐ পাখীটির প্রতি নিষাদের শর লক্ষ্য ভাবে অন্যের উন্নতি হয় বটে, ফলতঃ ব্যাধের প্রকৃতির পরিবর্তনে হয় না—তাহার হৃদয় যে পাষাণ হইতেও কঠিন। ইহাতে স্পষ্টই বিবেচনা হয়, নারায়ণ —চিন্তার অভাবে স্থুল বস্তুর ধ্যানে ডুবিয়া গেলেও তাহা শান্তির কারণ নহে, এবং পদার্থ গত বিজ্ঞান-চিন্তাতেও হরিনাম দ্বারা চিত্ত যতই কেন ডুবুক না তাহাতে প্রকৃত ধ্যান বা চিন্তা দ্বারা গুণী হওয়া যায় না।

যোগের দ্বারা অনন্তদেব হরিকে চিন্তা প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন অন্যবিধ যাহা করিবে তাহা যোগের গন্তব্য পথের সময় পাত ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। এই জন্য যোগে নারায়ণ চিন্তাই শ্রেষ্ঠ ও যোগীর সিদ্ধাবস্থা।

এই বিশুদ্ধ যোগে নারায়ণ উপলব্ধির অধিকার জন্মে, অন্তর্দৃষ্টি পরিষ্কাররূপে প্রকাশ পায়, ইন্দ্রিয়াসক্তির কূট বন্ধন ছিন্ন হয়, এবং মর্ম-প্রবিষ্ট বাসনার গ্রন্থি সমূহ শিথিল হইয়া যায়। চিত্তের বহির্মুখ তীব্রগতি ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইতে থাকে, নানা পথে ভ্রমণ করিতে আর ইচ্ছা হয় না।

শুভ বৃত্তি প্রদর্শিত পবিত্র পথের অনুসরণে কামাদির দুর্জয় বল দুর্বল হইয়া পড়ে, যোগী সকামজনিত তৃপ্তি একেবারে পরিত্যাগ করেন এবং নিষ্কাম যোগশক্তির আকর্ষণে অনাসক্ত বৈরাগ্যের সাধন সাহায্য বুঝিতে সক্ষম হন। যে পর্যন্ত সাধকত্ব শক্তি না জন্মে সে পর্যন্ত হরিচিন্তা বা ধ্যানের গূঢ়তত্ব বুঝা যায় না, নিরবচ্ছিন্ন নিবিড় অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টি হয় না।' তাহার মধ্যে বিষম বিপদ সঙ্কুল আমিত্বের বিচিত্র লালসায় পৃথিবীর ঘটনা সমূহ বুদ্‌বুদের ন্যায় অবিশ্রান্ত ফুটিতে থাকে। এই নিমিত্ত যোগের বিশেষ প্রয়োজন। বাস্তবিক ধ্যানরাজ্যে আবার ঐ ভয়ানক অন্ধকারই অকৃত্রিম বন্ধু বা সহায়। যদি আমিত্বের আধিপত্যকে বিনাশ করা যায়, তবে আর কিছু থাকে না—একমাত্র অন্ধকারই গতি স্থিতির উপায়।

চিত্ত তখন সেই ভীষণ অন্ধকার ঠেলিয়া কোথায় যাইবে? অগত্যায় একাকী মহাভয়ে আক্রান্ত হইয়া স্বভাবতঃ মধুসূদন না ধরিলে আর উপায় কি। কিন্তু নাম সাহায্যে সাধকের ভয়ঙ্কর পরীক্ষা আছে, কারণ যে উপায়হীন বলিয়া তাহার নামে রুচি, এজন্য বিশ্বাস ব্যাকুলতা দৃঢ় কি দুর্বল কেনই বা প্রভু জানিবেন না?

সম্মুখে যতই কোন পরীক্ষা প্রলোভন আসুক না বিশ্বাসের জ্বলন্ত তেজে তিষ্ঠিতে পারে না। তাহা ঐ নিবিড় অন্ধকার মধ্যেও কৃষ্ণপ্রভা তড়িৎ জ্যোতির ন্যায় দৃষ্ট হয়। এই আশায় দীপ জ্বলিতেছে, ইহা যোগের পরিণাম এবং সাধকত্বের ফলও বটে।

"জ্যাসা নাগরীকা চিৎ গাগরীমে"—ভোজনে ভ্রমণে শয়নে স্বপনে অবিনাশী নিত্য পুরুষোত্তমের ধ্যান বা চিন্তা। যাবৎ জ্ঞানময় আত্মাস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে মনোলয় না হয় তাবৎকাল সাধক কৃষ্ণমন্ত্র জপ ও হোমাদি দ্বারা যোগাভ্যাস করিবেক। কর্ম ফল আছে কি না আছে এরূপ সন্দিগ্ধ-মতি ও যে ব্যক্তি আপ্লুতচিত্ত হয়, তাহাকে জ্ঞানসাধনে অসিদ্ধ অর্থাৎ অনধিকারী বলিতে হইবে।কেবল বাক্য দ্বারা আত্মজ্ঞান হয় না, কারণ মন স্থির না হইলে, আত্মজ্ঞান লাভ করা যায় না। এজন্য বেদাদি শাস্ত্র সকল কর্মনুষ্ঠান করিতে অনুশাসন করিয়াছেন। শ্রীমান ভক্ত......ও তাহার স্ত্রী কার্য করিতেছে মন্দ নয়। মধ্যে আনন্দের গোলযোগ হইবে, কারণ চিত্তবৃত্তি সকল দিন ঠিকভাবে যে থাকে না, কাজেই গোলযোগ হয়। চিন্তা নাই।

উক্ত.......যে ভৈরবী মাতাদের জন্য দুই টাকা সেবার জন্য বন্দোবস্ত করিয়াছে তাহাতে একজন কুমারীর বা ভৈরবীর কিরূপে হইবে? দিতে হইলে পাঁচ টাকার কম একটি কুমারী বা ভৈরবীর হয় না। অতত্রব তাহাকে বলিবে মাসিক একটি ভৈরবীর খোরাক তাহাকে দিতে। তাহা না হইলে প্রয়োজন নাই। তার অভাব কি? তাহার নাম আশ্রমে প্রস্তরের খাতায় লওয়া হইয়াছে। কোন বিষয়ে চিন্তা না করে, —তাহাকে বলিবে।

তাহার মাঘ ফাল্গুনের চারি টাকা পাইয়াছি। পাঠাইবার খরচ তার নিকট লওনা কেন—তাহার পুণ্যের ক্ষতি কেন কর। অন্যান্য সকল বিষয় পরে লিখিব।.......র বিষয় অনেক আছে। এখনও তাহাকে যোগ সম্বন্ধে প্রয়োগ করিবে না। সময় হয় নাই। তাহার ব্যাধির বিষয় বিবেচনা করা যাইবে। কর্ম করিতে কহাকেও ক্ষান্ত দিও না। যদ্রূপ তৈলবিনা দীপের দীপত্ব থাকে না, তদ্রূপ বিনা কর্মে শরীরেরও শরীরত্ব থাকিতে পায় না। অতএব যতদিন কর্মের অবিশ্রান্ত গতি রোধ না হইবে, ততদিন কর্ম পরিত্যাগ করিয়া, ব্রহ্মোপাসনা কিঁরুপে সম্ভবপর হইবে? সেইজন্য গুরুদেব প্রথমতঃ শম দমাদি গুণ প্রবোধিত করিয়া পশ্চাৎ শুদ্ধ নির্মল আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মকে বোধ করাইবেন।

রাম ঠাকুরের কথা ও কৌশিকী আশ্রমসহ জ্ঞানগঞ্জের বিবরণ

সে আজ অনেক দিনের কথা। তখন আমি বেনারসে ৬৩ নং মিসরী পোখরার বাড়ীতে অবস্থান করিতাম ও প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় দৈনন্দিন কর্মের অবসানের পর গঙ্গার স্নিগ্ধ সমীরণ সেবন করার জন্য কিয়ৎকাল মিত্রগোষ্ঠীতে অবস্থান করিয়া অধ্যাত্ম-চর্চ্চা করিবার জন্য নিয়মিতভাবে গঙ্গা ঘাটে যাইতাম। সাধারণতঃ প্রয়াগ ঘাটে বসিতাম, কখনও কখনও দশাশ্বমেধ অথবা দ্বারভাঙ্গা ঘাটেও বসিতাম।

একদিন, বোধ হয় উহা ১৯২৩ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী হইবে, আমরা পরস্পর সৎপ্রসঙ্গ করিতেছিলাম, এমন সময়ে আমাদের বন্ধু (ময়মনসিংহ সুষঙ্গ নিবাসী) মহিমচন্দ্র সিংহ মহাশয় সাধু-মহাত্মার আলোচনা পৃষ্ঠে সংবাদ দিলেন যে সম্প্রতি

শ্রীশ্রী রামঠাকুর

কাশীতে রামঠাকুর নামে কেজন উৎকৃষ্ট সাধু আগমন করিয়াছেন।[১] বলিলেন, সাধুটি সম্ভবতঃ কিছুদিন কাশীতে থাকিবেন—সম্প্রতি চিন্তামণি গণেশের নিকট একটি ভদ্রলোকের বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। ইহার পর তিনি শতমুখে এই সাধুটির প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখে সাধুটির প্রশংসা শুনিয়া আমাদের মধ্যে অনেকেরই ইচ্ছা হইল যে তখনই তাঁহাকে দর্শন করিতে যাই।

মহিম বাবুকে চালক করিয়া আরও ২/৩টি ভদ্রলোকের সঙ্গে আমরা সাধুটিকে দর্শন করিবার জন্য চিন্তামণি গণেশে গেলাম। সেখানে যাইয়া যে দৃশ্য দেখিলাম তাহাতে আমরা সকলেই মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম। দেখিলাম, একটি আনুমানিক ৬০/৬৫ বয়সের বৃদ্ধ মহাত্মা, গলায় তুলসীর মালা, অঙ্গে একখানা তাঁতের শুভ্র বর্ণের চাদর, মুখে বিনয়পূর্ণ মধুর হাস্য, ধীর স্থির সৌম্যভাবে আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। আমাদিগকে দেখিবামাত্র আমরা অপরিচিত হইলেও আমাদিগকে নম্রভাবে প্রণতি জ্ঞাপনপূর্বক সাদরে আহ্বান করিলেন।

আমরা যথাস্থানে উপবেশন করিয়া তাঁহার সহিত বার্তালাপে প্রবৃত্ত হইলাম। অনেকক্ষণ কথাবার্তার পর যাহা বুঝিলাম তাহাতে আমাদের ধারণা হইল যে ইনি বস্তুতঃই একজন মহাপুরুষ।

যেদিন সর্বপ্রথম ঠাকুরকে দর্শন করিতে যাই তাহার পরবর্তী চতুর্থ দিন শিবরাত্রি মহোৎসবের অনুষ্ঠান ছিল। ঐ দিন আমরা সায়ংকাল পর্যন্ত বিভিন্ন সাধু সজ্জনের দর্শন করি। ঐদিন সকলেই ব্রতী ছিলাম বলিয়া অনেকটা সময় নিশ্চিন্তভাবে ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গসুখ লাভ করিতে পারিয়াছিলাম। এইভাবে যতদিন তিনি কাশীতে ছিলেন মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকট যাইতাম এবং তাঁহার সহিত সৎপ্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা করিতাম। তিনি প্রতি বৎসরই কাশীতে আসিতেন, কখনও কখনও বৎসরে দুই তিন বারও আসিতেন। এক স্থানেই যে সকল সময় থাকিতেন এমন নহে। বিভিন্ন ভক্তের বাড়ীতে বিভিন্ন সময়ে অবস্থান করিতেন। কখনও কখনও ধর্মশালাতেও উঠিতেন। মানসরোবর, হাড়ারবাগ, চিন্তামণি গণেশ, নারদ ঘাট, খোদাইচৌকি, পাতালেশ্বর প্রভৃতি বহুস্থানে তাঁহার দর্শন পাইয়াছি এবং মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের হরসুন্দরী ধর্মশালা স্থাপিত হইলে কখনও কখনও তিনি সেখানে আসিয়া অবস্থান করিতেন।

---

১. বাস্তবিক পক্ষে ১৯৯৮ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যাবেলা আমি সর্বপ্রথম মিত্রবর শ্রীবিমলা মুখোপাধ্যায়ের নিকট এই মহাত্মার কথা শুনিয়াছিলাম। তিনি তখন কাশীতে মানসরোবর মহল্লায় কিছুদিনের জন্য অবস্থান করিতেছিলেন। কিন্তু এতদিন তাঁহার দর্শনের সুযোগ ঘটে নাই।

তাহার জীবনের ধারা অত্যন্ত অদ্ভুত ছিল। ভোজন একপ্রকার ছিল না বলিলেই চলে, অথচ শরীর এত কর্মঠ ছিল যে, এক সঙ্গে চলিতে গেলে তাঁহার সঙ্গে চলা কঠিন হইত। কখনও কখনও আমরা সন্ধ্যাবেলায় নৌকাতে বেড়াইতে গেলে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতাম। তখন দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিশ্চিন্তভাবে গঙ্গাবক্ষে গভীর তত্ত্বের আলোচনা হইত।

তাঁহার জীবন ছিল অলৌকিক রহস্যময়। তিনি নিজে পূর্ব জীবনের বহুকথা প্রসঙ্গতঃ বলিতেন। তাঁহার জীবনের অভিজ্ঞতা এত বিচিত্র ছিল যে তাহা অনেক সময় সাধারণ লোকের বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে না হইবারই কথা। তাঁহার হিমালয়ে অবস্থানকালে এবং অন্যান্য স্থানেও যে সকল অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছিল সেই সকল বিষয়ের সঠিক বিবরণ দেওয়া সম্ভবপর নহে। এই সকল বৃত্তান্ত লোকসমাজে প্রকাশিত করা তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ছিল, এমন কি তাঁহার জীবনচরিত্র রচনা দ্বারা কেহ জগৎ সমক্ষে তাঁহার প্রচার করুক ইহাও তিনি চাহিতেন না। ভক্তগণের মধ্যে কেহ ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি নিজেই তাহাতে বাধা দিতেন।

তাঁহার গুরুদেবের কথা যাহা আমি তাঁহার সংসর্গ হইতে ক্রমশঃ জানিতে পারিয়াছিলাম তাহা অত্যন্ত অলৌকিক।

যখন প্রথম ঠাকুর মহাশয়ের সহিত আমার পরিচয় হয় তাহার কিছুদিন পরেই অন্যসূত্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্বর্গীয় প্রভাতচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে পরিচয় হয়। তিনি ঠাকুর মহাশয়ের অনন্য ভক্ত ছিলেন এবং আমার নিকটও অন্তরঙ্গ সুহৃদের ন্যায় যাতায়াত করিতেন। তাঁহার সঙ্গে ঠাকুর সম্বন্ধে বহু বিষয়ে আলোচনা হইয়াছ। ঠাকুরের জীবন-কাহিনী এবং উপদেশাদি লিখিয়া রাখিতে আমি বহুবার তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছি। কিন্তু তিনি লিখিবার সুযোগ পাইতেছিলেন কিনা তাহা জানি না। "ভারতের সাধন" পত্রিকাতে যাহা কিছু বাহির হইয়াছিল তাহা অতি সামান্য এবং পরে তাহাও প্রকাশিত হয় নাই।

১৯১১-১২ সালে, কাশীর বাঙ্গালী টোলা হইতে কুইন্স কলেজে এম. এ. বিদ্যার্থী ছিলাম। সেই সময় কাশীর "বঙ্গ সাহিত্য সমাজ" নামক পুস্তকালয়ে প্রায়ই যাইতাম। যদিও "বঙ্গ সাহিত্য সমাজ" বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এক প্রাচীন শাখা ছিল। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে বঙ্গ সাহিত্য সমাজ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ অপেক্ষা প্রাচীন ছিল। এই পুস্তকালয়ে পলাশী যুদ্ধের খ্যাতনামা লেখক নবীনচন্দ্র সেনের 'আমার জীবন' নামক আত্মচরিত আমার হস্তগত হইয়াছিল। এই মনোরম গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে লেখক তাঁহার আত্মজীবনী আলোচনায়, "প্রতারক না প্রবঞ্চক" নামক একটি অধ্যায়ে রামঠাকুরের অদ্ভুত জীবনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

"একটি গল্প বহু লোকের মুখে, সর্বশেষে রামঠাকুরের নিজ মুখেও শুনিয়াছিলাম। সে বৎসর শিব-চতুর্দ্দশীতে চন্দ্রনাথে তাঁহার সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া তাঁহার গুরুদেব প্রতিশ্রুত ছিলেন। রামঠাকুর ছুটীর দরখাস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার পরিদর্শনে আসিবেন বলিয়া ওভারসিয়ার ছুটি মঞ্জুর করে নাই। রামঠাকুর শিব চতুর্দ্দশীর প্রাতে বড় মনোদুঃখে বসিয়া, গুরুদেব তাহাকে কেন এই দর্শন হইতে বঞ্চিত করিলেন ভাবিতেছেন। এমন সময়ে টেলিগ্রাম আসিল যে, সাহেব আসিবেন না। তাঁহার ছুটি মঞ্জুর হইল। রামঠাকুর আনন্দে আত্মহারা হইয়া চদ্রনাথ দর্শনে ছুটিল কিন্তু অকস্মাৎ উত্তেজনায় ভ্রান্ত হইয়া দক্ষিণ মুখে না গিয়া উত্তর মুখে চলিলেন। কিছুদূর গেলে একজন লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, সে বলিল যে; রামঠাকুর চন্দ্রনাথের বিপরীত দিকে যাইতেছেন। তখন ভ্রম বঝিয়া কে বৃক্ষতলায় বড় সন্তপ্ত হৃদয়ে বসিয়া পড়িলেন, এমন সময়ে এক সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইয়া, রামঠাকুর কি চন্দ্রনাথ যাইবে জিজ্ঞাসা করিলে রামঠাকুর বলিলেন যে, ভ্রমবশতঃ বিপরীত দিকে আসিয়াছেন। অতএব সেদিন আর চন্দ্রনাথে পৌঁছিবার সম্ভাবনা নাই। সন্ন্যাসী তাঁহার সহিত যাইতে বলিলেন এবং পাহাড়ের ভিতরে প্রবেশ করিয়া পার্বত্য পথে তাহাকে সন্ধ্যার পূর্বে চন্দ্রনাথ পর্বতের সানুদেশে উপস্থিত করিলেন। সেইস্থান হইতে চন্দ্রনাথ চল্লিশ এবং ফেণী হইতে ত্রিশ মাইলের পথ। সেই রাত্রি সীতাকুণ্ডে অতিবাহিত করিবার পর আবার সেইরূপ অজ্ঞাতভাবে তাহাকে আনিয়া ফেণীর উত্তর দিকে একটি স্থানে রাখিয়া চলিয়া গেলেন। সেখানে একজন পেয়াদার সহিত রামঠাকুরের সাক্ষাৎ হইতেই সে লুকাইতেছিল। পেয়াদা তাঁহাকে পাকড়াও করিল এবং তাঁহার দ্বারা মহম্মদের এক রাত্রিতে বিশ্বভ্রমণের ন্যায় এই তীর্থ-দর্শন-কাহিনী প্রথম প্রচারিত হইল। রামঠাকুর দেখিতে ক্ষীণাঙ্গ, সুন্দর, শান্তমূর্ত্তি নিতান্ত পীড়াপীড়ি না করিলে কাহারো সহিত সাক্ষাৎ করেন না, কোনও কথা বলেন না। পূর্বেই বলিয়াছি, তাঁহার ৮ হইতে ১২ বৎসর বয়স পর্যন্ত সামান্য বাঙ্গালা শিক্ষা মাত্র হইয়াছিল! কিন্তু ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব, এমন কি প্রণবের অর্থ পর্য্যন্ত সে জলের মত বুঝাইয়া দিত। আমি তাহাকে বড় শ্রদ্ধা করিতাম। মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিয়া আমার গৃহে আনাইতাম এবং পতি-পত্নী মুগ্ধ চিত্তে তাঁহার অদ্ভুত ব্যাখা সকল শুনিতাম। বলাবাহুল্য সে পেশাদারী হিন্দু প্রচারকের ব্যাখা নহে। একদিন রাণাঘাটে ঊষাক্ষণে জাগিয়া স্ত্রী বলিলেন যে তিনি সেবার কালী দর্শন করিতে গিয়া শুনিয়াছিলেন, রামঠাকুর কালীঘাটে আসিয়াছিল। আমাদের সহিত কেন দেখা করিলেন না—তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, কেমন করিয়া বলিব? মুখ প্রক্ষালন করিয়া আমি অফিস

কক্ষে "সোফার" উপর আসিয়া যেই বাহির দিকে দেখিতেছি, দেখি, আমার সম্মুখে বারান্দার অধোমুখে স্থিরভাবে রামঠাকুর দাঁড়াইয়া আছেন। আমার বোধ হইল, যেন রামঠাকুর আকাশ হইতে সে স্থানে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অন্যথায় আমি তাঁহাকে আসিতে দেখিতে পাইতাম।" কিন্তু কিছুদিন পর ঠাকুর মহাশয়কে নবীন সেন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে শূন্যমার্গে কোন মনুষ্য চলাফেরা করিতে পারে কি।

ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছিলেন, "বিদ্যুৎ যে পথে চলে মনুষ্যও ঐ পথে চলাচল করিতে সক্ষম। কেবলমাত্র ইহাই নহে এক সঙ্গে একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে উপস্থিত হওয়া যায়।

জ্ঞান দেহ কিন্তু এ প্রকার নহে, উহা মুক্ত দেহ এবং দেখিতে বিদ্যুতের মত উজ্জ্বল। উহা সঞ্চরণ করে একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাতায়াত করে এবং উহার অবয়বও আছে। কিন্তু উহা বুঝা অত্যন্ত কঠিন। উহা একপ্রকার জ্যোতিঃ স্বরূপ।" নবীনবাবু এইরূপ বহু আন্তরিকতাপূর্ণ আলোচনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

একবার রামঠাকুর আমার বিশেষ অনুরোধে, আমার বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। সে সময়ে প্রায় কিছুই খাইতেন না বলিলেই হয়। অন্ন ভোগ 'ত' লইতেনই না ফল প্রভৃতিও কম গ্রহণ করিতেন। তাঁহার বিনয় এত ছিল যে আগন্তুক হাত উঠাইবার পূর্বই তাঁহাকে প্রণাম করিতেন তাঁহাকে অভিবাদন করিবার অবসরও পর্যন্ত দিতেন না। তিনি যখন কাশী আসিতেন আমি তাঁহার সহিত দেখা করিতে প্রতিদিন যাইতাম। কখনও কখনও তিনি অকস্মাৎ কোথাও চলিয়া যাইতেন কেহই জানিত না। কোনও সেবককে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিত গুরুর আদেশে হঠাৎ বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন।

ঠাকুর মহাশয়ের গুরু ছিলেন একজন দিব্য পুরুষ। তিনি লৌকিক পুরুষ ছিলেন না। যাঁহারা তাঁহার অন্তরঙ্গ ছিলেন তাঁহারা বলিতেন এ মহাপুরুষের নাম অনঙ্গদেব। তিনি তাঁহার ভক্তমণ্ডলীর সহিত ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইতেন।

১৯২৩ সন হইতে ১৬/১৭ বৎসর পর্যন্ত প্রায়ই ঠাকুর মশাইয়ের দর্শন পাইতাম। ঐ সময়ে কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার নিকট হইতে যে সকল তত্ত্ব ব্যাখ্যা শুনিতে পাইতাম তাহাদের কতকটা আমি নিজের আলোচনার জন্য লিখিয়া রাখিতাম। আমার সেই লিখিত নোট বুক হইতে কয়েকটি অংশ নির্বাচন করিয়া নিম্নে প্রকাশ করিলাম। আশা করি ইহা হইতে তাঁহার চিন্তাপ্রণালী ও দার্শনিক দৃষ্টিকোণ বুঝিতে পারা যাইবে।

মন, বুদ্ধি ও প্রাণ যখন এক হইয়া যায়, তখন বুদ্ধি থাকে না বলিয়া বিচার থাকে না। তাই তাঁহাকে পাইলে 'আমি পাইয়াছি? এই প্রকার বোধ থাকে না। চিনি ত চিনির আস্বাদন জানে না।

সব জিনিষই গাঢ় বা গভীর হইলে নীল হয়। জল গাঢ় হইলে নীল হয়। গাঢ় অগ্নি নীল, মধ্যাহ্ন কালে সূর্যও তাই, গভীর আকাশও নীল। প্রদীপ নির্বাণ হইলে একটি নীল জ্যোতি দেখা যায়, উহা গভীর জ্যোতি। উহার চারিদিকে একটা সুবর্ণ জ্যোতির বেষ্টন থাকে। ঐ সুবর্ণ জ্যোতিটিকে গৌর বলে—উহার ভিতরটি কৃষ্ণ।

ব্যাধি বা রোগ বা বাধাই বিকার, অর্থাৎ আবরণ। যেখানে বাধা নাই তাহাই স্বাস্থ্য, প্রকৃতি বা স্বভাব। বিকারই দুঃখ, স্বভাবই আনন্দ।

এই দেহের মত বহু দেহ নির্মাণ করিয়া নানাস্থানে বিচরণ করা যায়—উহা সূক্ষ্ম দেহে নহে। এই স্থুল দেহকে চতুর্দেহ বলে, কারণ ইহা চারিদিকে ছড়াইয়া যায়, ইহাই বিভূতি। এক প্রদীপ হইতে যেমন বহু প্রদীপ জ্বালান যায় ঠিক সেইরূপ এক দেহ হইতে বহু দেহের আবির্ভাব হইতে পারে। মন দ্বারা অর্থাৎ ইচ্ছা শক্তির দ্বারা দেহের অংশ বাহির করিতে হয়। এই সব অংশ দেহ হইতে বাহির হইয়া আবার আসিয়া লীন হয়। অংশগুলি দেখিতে ঠিক মূলের অনুরূপ।

মৃত্যুর পরে যে দেহ নির্গত হয় তাহা ঐরূপ নহে তাহাকে সূক্ষ্ম দেহ বলা হয়।

পুরুষ মানে পৌরুষ বা চেষ্টা। উত্তম চেষ্টাকে পুরুষোত্তম বলে। কাশী দেহত্যাগের স্থান—এইখানেই দেহত্যাগ হয়। উত্তর কাশী, মধ্য কাশী ও দক্ষিণ কাশী —সবই কাশী। প্রথমটি আদি, অন্তিমটি নবীন। দক্ষিণ কাশী অগস্ত্য মুনির দক্ষিণে যাওয়ার পরে রচিত হয়। উহার রচয়িতা কুমার কার্তিকেয়।

সব আত্মাই সকলেই পরিচিত। মলিনতাবশতঃ কেহ কাহাকেও চিনিতে পারে না। চিনিলে আর পর থাকে না।

আশ্রম প্রতিষ্ঠার সময় যে শক্তির স্থাপন হয় তাহার প্রভাবে হিংস্র পশু আশ্রমে আসিয়া হিংসা করিতে পারে না। আমি উহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

সত্য=সত্ত্ব, ইহা সত্যযুগ। ত্রেতা=ত্রাণ। ত্রাণ হইলে দ্বাপর, তখন শুধু দুইটি থাকে, ভক্ত আর ভগবান। ভক্ত যখন ভগবান ভিন্ন অন্য কিছু জানে না, এই অবস্থায় কৃষ্ণ লীলার প্রকাশ হয়। পরে কলি। তখন গৌরনিতাই এর প্রকাশ।

অদ্বৈত, নিত্যানন্দ ও গৌরাঙ্গ মূলে একই বস্তু। অদ্বৈত হচ্ছেন মহাবিষ্ণু যিনি সর্ব অবতারের মূল। নিত্যানন্দ সংকর্ষণের স্বরূপ। বলরাম প্রভৃতি বা জীব প্রভৃতির ইনি উৎস। গৌরাঙ্গ লীলার প্রস্রবণ।

কাশীতে ঠিক ঠিক বাস করিলে কাশীর ঠিক ঠিক ব্যাপার চিন্তামাত্রই জানিতে পারা যায়।

বিশ্বনাথ—কালপুরুষ। ইনি সাতটি তারার সমষ্টি। এখানে আছেন মঙ্গলাদি চারটি গৌরী এবং বিশ্বনাথ দণ্ডপাণি ও বৈকুণ্ঠেশ্বর।

কাশী ত্রিশূলের উপর অবস্থিত। শূল মানে দুঃখ বা তাপ, ইহা ত্রিতাপের উপর।

গুরু যে বীজ দেন সেই বীজের সঙ্গে বাস করিতে হয়। উহর সঙ্গে ঘরকন্না করিতে হয়, উহাকে ভালবাসিতে হয়।

বীজের সঙ্গে বস্তুতঃ গুরুই জন্মগ্রহণ করেন। তাই ছাড়িয়া যাইবার উপায় নাই।

গুরু নৌকাটিকে ঠেলা দিয়া দেন। পরে শিষ্যকে দাঁড় টানিতে হয়। নতুবা শুধু গুরুর ঠেলাতে চলিতে হইলে শিষ্যের অত্যন্ত কষ্ট হয়, কারণ সে সামলাইতে পারে না। নিজে দাঁড় টানিতে হয় শুধু বেগ সামলাইবার জন্য গুরু ত সবটা দিয়া রাখিয়াছেন, প্রয়োজন অনুসারে শিষ্য সবটাই প্রাপ্ত হয়।

নিরপেক্ষ হইয়া থাকিবে, কোন পক্ষে থাকিবেন না।—ইহাই নাম প্রাণের শূন্যের সহবাস।

ভোগ আসে আসুক, বাধা দিতে নাই, আপনি কাটিয়া যাইবে। কাল পূর্ণ হইলে 'অবগুণ্ঠন' হইয়া বীজে পরিণত হইবে। বাধা দিলে সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়।

দীক্ষার কাল আছে। নারী রজস্বলা হইলে যেমন পতিসঙ্গ আবশ্যক তেমনি শিষ্যের ভিতরের প্রকৃতি যতক্ষণ রজস্বলা না হয় ততক্ষণ গুরু তাহাতে বীজ বপন করেন না। এই বীজ হইতে সৃষ্টি হয়।

শুধু শ্বাস প্রশ্বাসে লক্ষ্য রাখিলে প্রাণায়াম কুম্ভকাদি আপনি হয়।

সুখ দুঃখ কিছু নহে। ছেলেমেয়েরা যেমন পরস্পর খেলা করে এবং তার মধ্যে ঝগড়া মারামারি করে, কখনও কাঁদে কখনও হাসে, কখনও হারে কখনও জিতে, কিন্তু যেই মা খাইতে ডাক দেন অমনি সব খেলা ছাড়িয়া চলিয়া যায়। মার কাছে যাইয়া সকলে আনন্দে মগ্ন হয়। পূর্ববর্তী খেলার সুখ দুঃখ সব ভুলিয়া যায়। এও তাই।

প্রথমে যেটা আসে সেটা ভগবানের, বাকী সব ভূতের।

আমি শুনিয়াছি যে ঠাকুর মহাশয়ের ধারায় দীক্ষা শব্দের এক বিশেষ তাৎপর্য আছে। যাহাকে বাস্তবিক পক্ষে দীক্ষা বলা হয় তাহা সকলের জন্য সুলভ ছিল না। যিনি দীক্ষা পাইতেন দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার দেহের পরিবর্তন হইত। আরও শোনা যায় যে অনঙ্গদের স্বয়ং দীক্ষা প্রদান করিতেন না, সে ভার পড়িত ঠাকুর মহাশয়ের উপর। যখন এই দীক্ষার প্রয়োজন হইত ঠাকুর মহাশয় সে সময় লোকচক্ষের আগোচরে থাকিতেন।

ঠাকুর মহাশয়ের জীবনে অতি অল্প বয়সে তাঁহার গুরু সন্দর্শন হইয়াছিল। বারো বৎসর বয়সে তিনি তাঁহার সঙ্গী হইয়া পঁয়ত্রিশ বর্ষাকাল হিমালয়ের বিভিন্ন সিদ্ধাশ্রমে লোকচক্ষুর অগোচরে অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

দীক্ষালাভের পর শুরু হয় রামঠাকুরের পরিব্রাজক জীবন; গুরুর সহিত কামাক্ষ্যাধাম ত্যাগ করেন। পদব্রজে দুর্গম অরণ্য ও পার্বত্য অঞ্চল অতিক্রম করিয়া আগাইয়া চলেন হিমালয়ের দিকে, তিনি গুরুদেবের পশ্চাতে পশ্চাতে উচ্চ পার্বত্য অঞ্চল দিয়া চলিয়াছেন, হঠাৎ পথে শুরু হইল প্রচণ্ড তুষার ঝটিকা। রামঠাকুর শীতে নিঃসাড় হইয়া পড়িয়াছেন। তখন অনঙ্গদেব শিষ্যকে কুক্ষীর ভিতরে প্রবিষ্ট করাইয়া স্বচ্ছন্দে আগাইয়া চলিলেন। এ তুষার ঝড় তিনি গুরুদেবের নবসৃষ্ট কলেবরের আশ্রয়ে থাকিয়াই আত্মরক্ষা করেন।

গুরুদেব রামঠাকুরের ভোজনের জন্য ফল সংগ্রহ করিয়া আনেন। ঠাকুর বলিয়াছেন, "এই ফল যেন স্বর্গীয় ফল। উহা খাওয়া মাত্রই আমার দেহে ও মনে এক দিব্য আনন্দের সঞ্চার হইল।"

গুরুর আলৌকিক কায়া নির্মাণ ও সেই কায়ার আশ্রয়ে বাস করিবার ঘটনাটি শিষ্যের মনে সেদিন চিরঅঙ্কিত হইয়া গেল। "তিনি যে দেহধারী হইয়াও সর্বতোভাবে দেহাতীত, স্থুল দেহ বলিয়া যে তাঁহার কিছুই নাই দেহাতীত মহাসত্ত্বারূপে গুরুদেব তাঁহার সদাবিরাজিত, শুধু তাহাই নহে, পঞ্চভূত তাঁহার নিয়ন্ত্রণাধীন, শাসনাধীন।"

যৌগিক ও তান্ত্রিক নানা বিভূতি লীলা প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে গুরুদেব নিজের স্বরূপতত্ত্বকে মাঝে মাঝে প্রকট করিয়া তুলিতেন। অতঃপর উপস্থিত হইলেন কৌশকী পর্বতে।

ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন তাঁহারা হিমালয়ের শিখরস্থিত বশিষ্ঠাশ্রমের এক গুহায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গুরুদেবের ইচ্ছা, এখানে কিছুকাল বিশ্রাম করিবেন।

এতদিন গুরুই শিষ্যকে বহন করিয়া তাঁহার জন্য ফলমূল আহরণ করিয়া আনিয়াছেন। গুরুর সেবাধিকার শিষ্যের ভাগ্যে জুটে নাই।

ফলমূলের কথা দূরে থাকুক, নিরন্তর তুষারপাতের ফলে এ অঞ্চলে সব একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। রামঠাকুর গুহা হইতে বাহির হইলেন। ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন এক অপরূপ যুগলমূর্তি তাঁহার দিকে তাকাইয়া প্রসন্ন মধুর হাসি হাসিতেছেন। রামঠাকুর ভক্তিভরে এই যুগলমূর্তির চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। মাতৃমূর্তিটি পরম স্নেহভরে একটি সুস্বাদু ফল রামের করপুটে প্রদান করিলেন। ক্ষণপরেই তাঁহারা অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। রামঠাকুর গুরুদেবকে কহিলেন "প্রভু আপনার সেবার জন্য ফল সংগ্রহ করিতে বাহির হইয়াছিলাম। ভাগ্যক্রমে এক দিব্যদর্শনা মাতৃমূর্তি এই ফলটি আমায় দিয়াছেন। আপনি কৃপা করিয়া গ্রহণ করুন।

গুরুদেব কহিলেন, ''বৎস এ ফল তোমারই। পার্বতী দেবী আবির্ভূতা হইয়া নিজ হাতে এ ফল তোমায় দিয়াছেন''।

ঠাকুর শ্রদ্ধাভরে গুরুর নির্দেশমত উহা ভোজন করিয়া ফেলিলেন।

একদিন গুরুর সংগে ভ্রমণকালে অনঙ্গদেব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন রাম, এখন তুমি কি করিবে?

ঠাকুর মহাশয় বলিলেন আমি কিছু জানি না আপনি যা ইচ্ছা করিবেন, তাহাই হইবে।

উত্তর শুনিয়া তিনি বলিলেন তাহা হইলে আমাকে স্পর্শ করিয়া এখানে বসিয়া থাক। ঠাকুর মহাশয় তাহাই করিলেন। গুরুকে স্পর্শ করিবার সংগে সংগে প্রথমে তাহার তন্দ্রাভাব আসিল। এরপর হইলো সমাধি। ঐভাবে কতকাল অতিক্রম হইল তাহা কেহ জানে না তারপর গুরু বলিলেন, রাম ওঠো। রামের সমাধি ভাঙ্গিল এ ডাকে! চক্ষু খুলিয়া দেখিলেন গুরু সম্মুখে। আর দেখিলেন যে সে দেশ ও নাই। সে কালও নাই। এক গভীর বনে তিনি একলা বসিয়া আছেন। তাঁহার মুখমণ্ডল দীর্ঘ শ্বশ্রু গুম্ফে আবৃত, নখ হয়েছে দীর্ঘ।

অবশেষে এ গুহার অভ্যন্তরে অনুষ্ঠিত হইল এক বিশেষ যজ্ঞানুষ্ঠান। গুরুর আদেশে এই যজ্ঞাগ্নিতে পূর্ণাহূতি দিয়া রাম হইল আপ্তকাম।

গুরুকৃপায় সর্বসিদ্ধি তাঁহার করতলগত হইল।

ভারত সাধনার অমৃতধারা নিরন্তর নিঃসৃত হয় এই হিমালয় হইতে। কত তপস্যাপূত গিরিগুহা ইহার স্তরে স্তরে বিরাজিত। কত মহাযোগী কত সমাধিবান তাপস আত্মগোপন করিয়া আছেন এই সুপ্রাচীন গিরি অঞ্চলে। রহস্যময় দেবভূমি হিমালয় শক্তিধর সাধকদের পরিচয় গুরু এই নবীন শিষ্যকে দিতে চাহেন।

কত নদ নদী, বন পাহাড়, উপত্যকা তাঁহারা অতিক্রম করিলেন, তারপরে উপস্থিত হইলেন হিমালয়ের পূর্বাঞ্চলের এক দুরধিগম্য সিদ্ধপীঠে। স্থানটির নাম যোগেশ্বর আশ্রম। হিমবন্তের তুষার রাজ্য সেখানে শুরু হয় নাই। কোন মন্দিরাদি এখানে নাই। চারটি প্রস্তর স্তম্ভের মধ্যস্থলে উন্মুক্ত প্রান্তরে অবস্থিত রহিয়াছেন স্ফটিক নির্মিত তুষারশুভ্র এক বিশাল শিবলিঙ্গ। এক অপার্থিব অপরূপ জ্যোতি এই স্ফটিকলিঙ্গের চতুর্দিক হইতে অবিরাম বিচ্ছুরিত হইতেছে। এই অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়া রামঠাকুরের বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

এই যোগেশ্বর শিবলিঙ্গের আরাধিকা এক শক্তিশালী সাধিকা। জটাজূট মণ্ডিতা অপরূপ রূপলাবণ্যবতী এই তাপসী নারী দিনের পর দিন ধ্যানস্থা হইয়া এই জ্যোতির্ময় শিবলিঙ্গের সম্মুখে উপবিষ্টা রহিয়াছেন। রামঠাকুর এই ধ্যানমগ্না সাধিকার নাম দিয়াছিলেন গৌরী।

এই পীঠস্থলীর দিব্য পরিবেশে পাঁচ দিন অবস্থান করেন। রোজই এ সময়ে সবিস্ময়ে দেখিতেন, তেরোটি সমবয়স্কা পাহাড়ী মেয়ে নীচের উপত্যকা হইতে পুষ্পাভরণে সাজিয়া এখানে আসে, নাচিয়া গাহিয়া স্থানটিকে আনন্দমুখর করিয়া তোলে। তার পর নৃত্যগীত শেষে সন্ধ্যার-প্রাক্কালে সকলে পরমানন্দে যোগেশ্বর শিব ও তাঁহার এই রহস্যময়ী সাধিকার গলায় ফুলের মালা পরাইয়া দেয়। বালিকাদের বয়স এগার বার বৎসর তারপর আবার নীচে তাহাদের উপত্যকায় ফিরিয়া যায়।

এই দেবস্থানে অপরূপ শান্তি ও আনন্দ বিরাজিত। "যোগেশ্বরের মত এমন শান্তি এমন পবিত্রতা সারা হিমালয়েও ছিল দুর্লভ।"

ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহারা সেবার এক সুড়ঙ্গপথে প্রবেশ করেন। সূচীভেদ্য অন্ধকারে এ পথ সমাচ্ছন্ন। জীবজগতের কোন অস্তিত্বই অনুভূত হয় না। ধীরে ধীরে এই বন্ধুর অনালোকিত পথ অতিক্রম করার পর রামঠাকুর দেখিলেন, অন্ধকারের আবরণ ক্রমেই যেন স্বচ্ছতর হইয়া আসিতেছে। তারপরই সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল গোধূলির রাগচ্ছটা।

তবে কি সুড়ঙ্গপথের শেষে অস্তগামী সূর্যের আলোকস্পর্শ পাইতে চলিয়াছেন? অল্পক্ষণ পরেই কিন্তু ভুল ভাঙ্গিল। দেখা গেল, অদূরে অপরূপ মহিমায় উপবিষ্ট রহিয়ছেন এক বিশালকায় মহাপুরুষ। তপঃসিদ্ধ দেহ হইতে যে দিব্য জ্যোতি নিরন্তর নিঃসৃত হইতেছে তাহারই আলোকে এই সুড়ঙ্গপথ আলোকিত। সুড়ঙ্গ পথটি দক্ষিণ হইতে উত্তর পর্বত ভেদ করিয়া গিয়াছে বলিয়া অনুমান হয়।

রামঠাকুরকে উদ্দেশ্য করিয়া গুরু অস্ফুটস্বরে কহিলেন, এই ব্রহ্মবিদ্ মহাত্মাকে প্রণাম করিয়া আবার রওনা হইতে হইবে। কিছুকালের মধ্যে সুড়ঙ্গের প্রান্তভাগে আসিয়া পৌঁছিলেন। মাথার উপর আবার দেখা দিল নিঃসীম আকাশের মহাবিস্তার। হিমালয়ের এই সকল অপ্রাকৃত সাধনভূমিতে প্রবেশের অধিকার সহজলভ্য নয়। এই অধিকার রামঠাকুর লাভ করিয়াছিলেন তাঁহার মহাসমর্থ গুরুদেবেরই কৃপায়।

এই সময়কার একটি অত্যাশ্চর্য, অলৌকিক অভিজ্ঞতার কথা ঠাকুর বলিয়াছিলেন। পার্বত্য অঞ্চলের এক গহন অরণ্যে সে বার উপস্থিত হইয়াছেন সম্মুখেই রহিয়াছে এক প্রাচীন সাধন-গুহা। এই গুহার সম্মুখে ধুনি জ্বালাইয়া এক অতিবৃদ্ধ বিশালকায় মহাপুরুষ সমাসীন।

গুরুদেব রামকে কহিলেন, "এই মহাত্মা হচ্ছেন কে দেবকল্প মহাসাধক।

ইঁনির দেহটি অতি প্রাচীন। বহুশত বৎসর ধরে এখানে বসে তিনি সাধনা করিতেছেন। এবার তাহার সঙ্কল্প হইয়াছে, কায়া পরিবর্তনের। বহু পুণ্যবলে এ

অলৌকিক অনুষ্ঠান দেখিবার সুযোগ মিলিয়াছে। মহাত্মার ধুনি থেকে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে এই অপরূপ দৃশ্য দেখে নাও।"

যোগাসনে উপবিষ্ট, মহাপুরুষের মুখে শুনা যাইতেছে মন্ত্রের গুঞ্জরণ। ধুনির অগ্নিতে প্রদত্ত হইতেছে আহুতি, আর থাকিয়া থাকিয়া অগ্নিশিখা ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে।

কিছুক্ষণ মধ্যেই সেখানে আবির্ভাব হইল এক অতিকায় নাগরাজ। মহাসর্পটি ধুনির অগ্নি কয়েকবার প্রদক্ষিণ করিল। তারপর মহাপুরুষের সম্মুখে আসিয়া হইল নতশির।

রামঠাকুর সবিস্ময়ে দেখিলেন, মহাপুরুষ ঐ সর্পটিকে ধরিয়া কুণ্ডলী পাকাইতেছেন ক্ষণপরেই সর্পটিকে তিনি ঐ প্রজ্বলিত আগুনে নিক্ষেপ করিলেন।

সর্পদেহটি তখনো পুড়িয়া একেবারে নিঃশেষ হয় নাই। চিমটা দিয়া টানিয়া আনার পর পাওয়া গেল অর্দ্ধদগ্ধ গলিত মাংসপিণ্ড।

মহাপুরুয কয়েকটি পিণ্ড প্রস্তুত করিলেন। এইবার শুরু হল তাঁহার অভিনব হোমক্রিয়া।

ধুনির আগুন তেমনি ভাবে প্রজ্বলিত রহিয়াছে। মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সর্পদেহের একটি করিয়া পিণ্ড উহাতে আহুতি দিতেছেন। সর্বশেষ পিণ্ডটি নির্বিকার চিত্রে তিনি গলাধঃকরণ করিলেন।

সর্পের ঐ দেহপিণ্ডটি ভক্ষণের পরই বৃদ্ধ তাপস নিজ আসনের উপর দেহখানি এলাইয়া দিলেন। স্পন্দনহীন, নীরব নিশ্চল দেহটি দেখিয়া মনে হয় না যে, উহাতে প্রাণের চিহ্নমাত্র রহিয়াছে। খানিক পরে দেখা গেল, মহাপুরুষের দেহটি ক্রমে ক্রমে স্ফীত হইয়া উঠিতেছে। এই স্ফীতি আরো বৃদ্ধি পাইলে উহা সশব্দে বিদীর্ণ হইয়া গেল, অভ্যন্তর হইতে বাহির হইয়া আসিল এক তরুণ তাপসমূর্তি।

বিগতপ্রাণ, মহাপুরুষের দেহটি এক পাশে নিঃসাড় অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। নবসৃষ্ট তরুণ সাধক এটিকে তুলিয়া নিয়া অবলীলায় ধুনির অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন।

তারপর দেখা গেল, বৃদ্ধ তাপসের পরিত্যক্ত আসন, চিমটা ও কমণ্ডলু লইয়া ধীরে ধীরে তিনি অরণ্যের গভীরে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন।

অতঃপর উপস্থিত হন কৌশিকী পর্বতে । এই পর্বতেরই কোলে বিধৃত রহিয়াছে এক রহস্যময় আশ্রম। আমার মনে হয় এই আশ্রম আমার গুরুদেবের জ্ঞানগঞ্জের ন্যায় কোন স্থান। আপ্তকাম যোগী ও উচ্চকোটি সাধকদের স্পর্শপুত এই স্থান। উর্ধ্বে

ত্রৈলঙ্গস্বামী
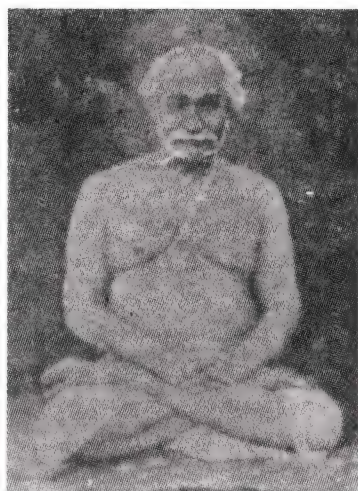
যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী

রামদাশ কাঠিয়াবাবা

কালীপদ গুহরায়

আকাশের বুকে তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়াছে তুষারমণ্ডিত শুভ্র পর্বতশ্রেণী আর নীচে তুষার এবং শৈত্যযুক্ত এক শিলাময় পবিত্র আশ্রম। অদূরে নীচে দিয়া খরবেগে বহিয়া চলিয়াছে ক্ষীণকায়া স্রোতস্বিনী।

এতদিন কৌপীনবন্ত হইয়া হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিব্রাজন করিতেছিলেন। এবার পবিত্র কৌশিকী আশ্রমের প্রবেশদ্বারে শেষ পরিধেয়টুকু ছাড়িয়া একেবারে উলঙ্গ হইতে হইল।

সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে কৌশিক পর্বতমালা। চারদিক বরফে আচ্ছন্ন। কিন্তু আশ্চর্য গুহার ভিতরে কোন বরফ নাই।

রামঠাকুর এখানকার স্থান মাহাত্ম্য দেখিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া গিয়াছেন। সমগ্র আশ্রমটিতে মৃত্তিকার লেশমাত্র নাই, সমস্তই শিলাময়। কিন্তু কি আশ্চার্য কাণ্ড। এখানকার শিলাখণ্ড ভেদ করিয়া নানা শ্রেণীর অজস্র লতাগুল্ম গজাইয়া উঠিয়াছে। প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে নানাবিধ সুস্বাদু ফল; কন্দজাতীয় খাদ্যেরও অভাব এখানে নাই।

আশ্রম-গুহার প্রশস্ত কক্ষমধ্যে একদল 'যোগিপুরুষ সারি সারি বসিয়া আছেন; সকলেই নিমীলিতনয়ন—নীরব, নিস্পন্দ সমাধিস্থ। হঠাৎ দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয়, এ যেন প্রাচীন যুগের প্রস্তরীভূত এক সারি মানব-দেহ।

কাহারও জটা খসিয়া কাঁধের উপর পড়িয়াছে। তাঁহারা এত দীর্ঘকায় যে উপবিষ্ট অবস্থায়ও তাঁহাদের মস্তক ঠাকুর দাঁড়ইয়াও নাগাল পান নাই। পাশে পা দিয়া উঠিয়া গলায় গলায় ফুলের মালা দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহাদের মুখমণ্ডল অতি বৃহৎ— চক্ষুর্দ্বয় চর্মে আবৃত এবং প্রায় এক বিতস্তি পরিমাণ ভিতরে কোটরাগত। বৃহৎ নেত্র-গোলক জ্বল্ করিতেছে। মুখমণ্ডলের লোহিত্যে জীবন চিহ্নরূপে বিদ্যমান। তাঁহারা কত যুগ যুগান্তর যে একাসনে উপবিষ্ট তাহার ইয়ত্তা নাই।

ঠাকুর বলিয়াছেন, 'কায়া পরিবর্তন করিয়া তাঁহারা বাঁচিয়া নাই—করিলে তাঁহাদের দেহ নবীনাকার ধারণ করিত। তাঁহাদের শরীরই তপোবলে একেবারে চৈতন্যময় হইয়া গিয়াছে—তাঁহাদের আর দেহপাত হইবে না।'

এই সময়ে গুরুদেব অনঙ্গস্বামী কিছুদিনের জন্য কোথায় অন্তর্হিত হইলেন। যাইবার পূর্বে নির্দেশ দিলেন, কিছুদিন এই মহাত্মাদের সান্নিধ্যে থাকো মনপ্রাণ দিয়ে এঁদের সেবা-যত্ন কর। এঁদের কৃপা লাভ করিলে সর্ব অভীষ্ট পূর্ণ হবে।" রামঠাকুর এই যোগীদের সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। রোজই সযত্নে ইহাদের সম্মুখে ফলমুল রাখিয়া যাইতেন। ভক্ত প্রাণের এ নৈবিদ্য কিন্তু একদিনও উপেক্ষিত হয় নাই। মহাত্মারা কৃপাভরে এগুলি হইতে কিছু ভোজন করিতেন। রামঠাকুর কৌশিকী

আশ্রমের এই দেবপ্রতিম তাপসদের সান্নিধ্যে বাস করেন। অতঃপর গুরুদেব তাঁহার সাময়িক অজ্ঞাতবাস হইতে ফিরিয়া আসিলে আবার বাহির হন পরিব্রাজনে।

হিমালয়ের এই সকল অপ্রাকৃত সাধন-ভূমিতে প্রবেশর অধিকার সহজলভ্য নয়। আশ্রমে তেরোটি আসনে দশজন মহাপুরুষ যুগ যুগ থেকে তপস্যায় নিরত। তাঁদের শরীর অত্যন্ত দীর্ঘ, মনে হয় তাঁরা যেন পাথরের মূর্তি। একমাত্র মুখের লালিমা দেখে মনে হয় তাঁরা সজীব! অক্ষি গোলক লম্বিত চর্মে আবৃত! তাঁহাদের শরীর দীর্ঘ তপস্যায় চিন্ময়তা লাভ হইয়াছিল।

কৌশিক পর্বতের পর কৌশিক আশ্রম নামে প্রসিদ্ধ এক রমণীয় স্থান বিদ্যমান। ইহা পদ্মফুলের আকার, আধ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার মাটি শিলাময়। ইহার নিচে মন্দাকিনী নামে এক বেগবতী নদী বহিয়া চলিয়াছে! এই নদী পার হওয়া অতীব দুরূহ।

শেষ তিনটি খালি আসনের মহাপুরুষগণ জগতের কল্যাণের নিমিত্ত নিম্ন ভূমিতে বিচরণ করিতেছেন।

তেরটি আসন এমনভাবে বিন্যস্ত যে ব্যবধানবশতঃ তাহাতে উপবিষ্ট ব্যক্তিগণ কেহ কাহাকেও দেখিতে পান না। প্রথম দশটি আসনে তাহারা দশজনকে উপবিষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন। অচল অটল ও স্পন্দহীন, হাত দুটি নামানো। হাতের অন্যান্য অঙ্গের চর্ম পাথরের ন্যায় কর্কশ স্থানে যেন ফাটিয়া গিয়াছে।

শিলাময় আশ্রমে শিলাভেদ করিয়া নানারূপ ফুল ও ফলের গাছ বিরাজমান। ঠাকুর পাঁচপ্রকার ফলের বর্ণনা করিয়াছেন।

১। এক প্রকার আম্রজাতীয় ফল। আঁটি অত্যন্ত ছোট। লতায় জন্মে ঠিক আম ও নহে। ২। আর এক প্রকার লতায় বিল্ব ফলের মতন ফল জন্মে। ৩। ছোট ছোট কলাগাছে কলা হয়। ৪। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একপ্রকার হলদে ফল অত্যক্ত মিষ্টি ও স্নিগ্ধকর। ৫। একপ্রকার আলু জাতীয় কন্দ প্রস্তর বিদীর্ণ করিয়া জন্মে। এই সকল ফল প্রচুর পরিমাণ গ্রহণ করা সত্ত্বেও এদের সংখ্যা হ্রাস পায় না;

একদিন কথা প্রসঙ্গে রামঠাকুরকে কৌশিকী আশ্রমের অবস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।

তিনি বলিলেন—মানস সরোবর এই আশ্রম থেকে বহুদূরে অবস্থিত। আমি বলিলাম মানস সরোবরে বহু তীর্থযাত্রী যান—কিন্তু কেহই কৌশিকী আশ্রমের মত কোন স্থানের সন্ধান পায় নাই। ঠাকুর মহাশয় এই প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, দিব্য আশ্রম সহজে গোচর হয় না। কেবলমাত্র যোগ সিদ্ধও তাঁহাদের অনুগৃহীত ব্যক্তিই ইহারা সন্ধান লাভ করিতে পারেন। মনের সব কিছু আসক্তি দেহের সব কিছু পরিচ্ছদ আবরণ ছেড়ে তবে সেখানে যাইতে হয়। আমরা তো উলঙ্গ হইয়াই সেখানে গিয়াছিলাম।

পরিশিষ্ট

(১) একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ এই ১৩৬৬ পৌষ মাসের প্রবাসী পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। প্রবন্ধ লেখকের নাম শ্রী সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়।

১৯৩৭ সনের সেপ্টেম্বর মাস রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে গুরুতর রূপে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মনীষী নীলরতন সরকার মহাশয় ছুটে এলেন তাঁর চিকিৎসার জন্য। তাঁর সঙ্গে এলেন বাংলাদেশের সেরা সেরা ডাক্তার।

কবি আরোগ্য লাভ করলেন। এবার নিশ্চিত হয়ে সরকার মহাশয় তাঁর সাঙ্গো-পাঙ্গো নিয়ে আশ্রম দর্শনে বাহির হলেন।

চীন ভবন নূতন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মাঝখানে মাত্র দুখানি বৃহৎ প্রকোষ্ঠ। তার একটিতে চীনা গ্রন্থাগার। অন্যটিতে তিব্বতী পুস্তকাদি এবেং গবেষণা গৃহ। ....সরকার মহাশয় ধীর পদক্ষেপে সেথায় উপস্থিত হলেন। শুভ্র কেশ প্রশান্ত মূর্তি।

..বৌদ্ধ শাস্ত্রের তীব্বতী অনুবাদ রাশি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। আমরা তার পরিচয় দিলাম।

সপ্তম শতাব্দীতে তিব্বতের সঙ্গে ভারতের ধার্মিক ও সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। তারপর থেকে বহু শতাব্দী ধরে ভারতীয় পণ্ডিতগণ তিব্বতে যান। এবং তিব্বতীগণ ভারতেআসিতে থাকেন। সমস্ত বৌদ্ধ ত্রিপিটক তিব্বতী ভাষায় অনুদিত হয়। ত্রিপিটকের অন্তর্গত নয় এরূপ বহু বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থেরও তিব্বতী অনুবাদ আছে। সপ্তদশ শতাব্দীতেও পানিনি ব্যাকরণের (প্রক্রিয়া কৌমুদীর) তিব্বতী অনুবাদ করা হয়েছে তদানীন্তন দলাইলামার নির্দেশে। তারপর থেকে তিব্বতের সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়।

মণীষি নীলরতন তাঁর স্বাভাবিক শান্তস্বরে বললেন, কিন্তু ধার্মিক যোগসূত্র আজও হয় নাই। তিব্বতী ও ভারতীয় যোগীদের সম্বন্ধ আজও অটুট রয়েছে।

আপনারা হয়তো বিশুদ্ধানন্দের নাম শুনে থাকবেন। কাশীতে তিনি গন্ধবাবা বলে পরিচিত। তাঁর গুরু তিব্বতী। গুরু শিষ্য উভয়েই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন।

আমি তাঁর অলৌকিক শক্তির প্রত্যক্ষ করি। কলিকাতায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। আমি তাঁকে শ্রদ্ধাভরে একটি ফুল দেই তিনি আমাকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত করে দিয়ে ঐ ফুলটিকে হীরাতে পরিণত করেন। যাদু বিদ্যার হীরা নয়, যথার্থ হীরা। মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয় ও আমি উভয়েই সে হীরা পরীক্ষা করলাম। এর পূর্বেও

তিনি এইভাবে হীরা তৈরী করেছেন এবং আমি জানি তাঁর প্রদত্ত সেই হীরা বাজারে ত্রিশ হাজার টাকায় বিক্রী হয়েছে।

আমি করজোড়ে প্রণাম করে তাঁকে সেই হীরা ফেরত দিলাম। বিনীতভাবে বললাম—আমায় আর প্রলোভন দেখাবেন না "আশীর্বাদ করুন আমার যেন অর্থাসক্তি দূর হয়।"

আমরা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় ঐ অপূর্ব অলৌকিক কাহিনী শ্রবণ করলাম। অন্য কোনোও ব্যক্তির মুখ হইতে এ কথা শুনলে আমরা তা "গাঁজাখুরি" বলে উড়িয়ে দিতাম। কিন্তু বাংলার সর্বজন শ্রদ্ধেয় সত্যনিষ্ঠ নীলরতন সরকার মহাশয়ের প্রত্যক্ষ দৃষ্টি ঘটনার অবিশ্বাস করি কিরূপে?

(২) এই লেখাটি প্রকাশিত হইয়াছিল দৈনিক বসুমতীতে।

সংবাদটি ছিল এইরূপ

।। বারাণসীর একজন *বাঙালী সাধু (নাম ছিলোনা) কতিপয় দিন পূর্বে একজন মার্কিন দেশীয় ভ্রমণকারীর অনুরোধে, তাহারই সমক্ষে কয়েক মিনিটের মধ্যে একখানি লেন্সের সাহায্যে একখানি শুষ্ক কাষ্ঠের কিয়দংশ প্রস্তরে পরিণত করেন। এই উপলক্ষ্যে ইহাও প্রকাশ পায় যে, উহা যে বিজ্ঞানের কার্য্য তদ্বারা অতি দুরারোগ্য ব্যাধি সকল অত্যল্পকাল মধ্যে আরোগ্য করা সম্ভব। সাধুর শক্তিতে বিস্মিত মার্কিন দেশীয় ভদ্রলোক প্রস্তাব দেন যে, তিনি যদি এই কার্য্য জগতের কল্যাণের জন্য প্রয়োগ করেন, তাহাতে তার যত অর্থের প্রয়োজন, তাহা আমেরিকা থেকে সংগ্রহ করে দাওয়া যাইতে পারে। এর উত্তরে উক্ত সাধু বলেন যে, শিষ্য ভিন্ন কাহারো নিকট এক কপর্দ্দক গ্রহণ করিবার ও তাহার গুরুর অনুমতি নাই।

তবে দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার জন্য একটি মন্দির নির্মার্ণের ইচ্ছা আছে, এবং তজ্জন্য চেষ্টাও হইতেছে।"

(৩) ঘটনাটি ঘটে ১৯২০ সালে।

নেপালে তদানিন্তন বৃটিশরাজ, তাদের এক গভর্ণর জেনারেলকে নিযুক্ত করেন। তাঁর নাম ইয়ং হাস্‌বেণ্ড। ইনি নেপালের রাজার সান্মানিক অতিথি হিসাবে রাজসভায় বসতেন, এবং সমস্ত খবর বৃটিশ রাজসভায় প্রেরণ করতেন। এই ইয়ং হাস্‌বেণ্ড একদিন নেপালের তরাই অঞ্চলে প্রহরীবিহীন অবস্থায় একটি অদ্ভুত জায়গার দর্শন পান। তখন অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। ইয়ং হাস্‌বেণ্ড দিক নির্ণয় ঠিকভাবে না করতে পেরে সামনের দিকে এগিয়ে যান। হঠাৎ বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ "থামো ইয়ং হাস্‌বেণ্ড

*এই সাধুর নাম যোগীরাজ শ্রী শ্রী বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস

আর এগিয়ো না। এর পরেই ভগবানের স্থান শুরু হচ্ছে। ইয়ং হাস্‌বেণ্ড ভয় পাইয়া তাঁর রিভলবার উঁচিয়ে সেই ভীষণাকায় সাধুটিকে বললেন, জানো আমি কে? আমি এই নেপালের অনারেবল বৃটিশ ক্রাউনের একমাত্র প্রতিনিধি। তোমার এতবড় দুঃসাহস তুমি আমার পথ আটকাও। সাবধান! এই বলিয়া ইয়ং হাস্‌বেণ্ড পর পর তিনটি গুলি সেই সাধুটির উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করেন। কিন্তু আশ্চর্য্যে ব্যাপার, সেই গুলি সাধুটির বুকবিদীর্ণ করিয়া চলিয়া গেলেও সাধুটি তাহাতে কোনো ভ্রূক্ষেপ করিল না। এরপর সাধুটি হাসিয়া কহিল ইয়ং হাস্‌বেণ্ড তুমি পথ হারাইয়াছো, আজ তুমি আমার সঙ্গে এসো—কারণ বনে হিংস্র জীব-জন্তু আছে, আর তোমার বন্দুকে কোন গুলিও নাই। তারচেয়ে বরং তুমি আমাদের কাছে থাকো, কাল প্রত্যুষে তুমি তোমার স্থানে ফিরিয়া যাইও। এই বলিয়া সাধুটি ইয়ং হাস্‌বেণ্ডের হাত ধরিয়া তাকে *দেবতার স্থানে প্রবেশ করাইলেন।

সেখানে তিনি দেখেন ছয়জন বিশালাকায় সাধু তপস্যায় রত। তাদের চেহারা দেখিলে দৈত্য বা জিন্‌ বলিয়া ভয় হয়। তাদের সামনে একটি গৃহ দূরথেকে মন্দির বলিয়াই মনে হয়। মন্দিরের সামনে একটি পরিখা— পরিক্ষার উপর একটি ছোট্ট সাঁকো। এই সাঁকো পার হইয়া ঐ মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিতে হয়। ইয়ং হাস্‌বেণ্ড এই ব্যপার দেখিয়া হতচকিত হইয়া যান। পূর্বে এই স্থানে তিনি বহুবার আসিয়াছিলেন, কিন্তু এমন স্থান যে এখানে আছে তা তিনি কখনো দেখেন নাই। মন্দিরটি ছোট ছোট গুল্ম, লতা-পাতা প্রভৃতি দিয়ে ঘেরা। ইয়ং হাস্‌বেণ্ড আস্তে আস্তে ঐ মন্দিরে প্রবেশ করেন। মন্দিরে প্রবেশ করিয়া বুঝিতে পারেন যে, এটি কোনো মন্দির নয়। এটি পূর্বাঞ্চলের এক দূরধিগম্য সাধনণপীঠ। এর পিছনে চারটি প্রস্তর স্তম্ভের মধ্যস্থলে প্রান্তরে অবস্থিত রহিয়াছেন—স্ফটিক নির্মিত তুষার শুভ্র এক বিশাল শিবলিঙ্গ। এই শিবলিঙ্গের অপার্থিব অপুরূপ চতুর্দিক আলোকিত হইতেছে। এরই সামনে জটাধারী এক মহিলা বসিয়া আছেন। ইয়ং হাস্‌বেণ্ড মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অনেক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া থাকেন। তারপর আস্তে আস্তে ঐ স্থান থেকে প্রস্থান করেন। পরের দিন তিনি যখন রক্ষীসহ ঐস্থানে আসেন তখন আর তিনি ঐ মন্দির আর ঐ সাধুদের সন্ধান পান না। পুরো স্থানটাই জনমানব শূণ্য। এই দেখিয়া ইয়ং হাস্‌বেণ্ড খুব আশ্চর্যান্বিত হইয়া

---

*এই প্রসঙ্গে জানাই যে আজো বণ্ডুল গ্রামে শ্রীশ্রী বিশুদ্ধানন্দ আশ্রমে জ্ঞানগঞ্জের সেই শিবলিঙ্গ বর্তমান। যে শিবলিঙ্গ প্রতিক্ষণে তাঁর রূপ পরিবর্তন করিতেছে।

জনশ্রুতি, আজো জ্ঞানগঞ্জের সাধু-সন্ন্যাসীরা রাত্রিতে ঐ মন্দিরে আসিয়া সাধনা করেন। কোনো গৃহস্থ লোকের রাত্রিবেলা ঐ মন্দিরে প্রবেশ নিষিদ্ধ।

যান। পরবর্তীকালে এই ইয়ং হাস্‌বেণ্ড ভারতেই থাকিয়া যান এবং সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহন করেন। তিনি রামকৃষ্ণমিশন বেলুড় মঠে সেন্টেনারীতেও বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁর লেখা ডাইরী ''মাই রেডবুক'' বইটি এখন দুস্প্রাপ্য। সেই বইতে এই কথা বিস্তারিত লেখা আছে।

প্রকাশকের সংযোজন

এই গ্রন্থের পূর্বে কয়েকজন মহাত্মার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। এদের সঙ্গে ''জ্ঞানগঞ্জ'' বা সেই সিদ্ধপীঠের যোগাযোগ ছিল নিয়মিত। কিন্তু এদের সমন্ধে বিশদ বিবরণ গোপীনাথ কবিরাজের কোনো লেখাতে পাইনা। কিন্তু তা সত্ত্বেও পাঠকদের কৌতূহল নিবৃত্ত করার জন্য এদের দু একজন সমন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও জ্ঞানগঞ্জের সহিত এদের কয়েকজনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের কথা উল্লেখ না করে পারছিনা।

যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী

সাল ১৮৬১। হিমালয়ের রাণীক্ষেত অঞ্চলে সেনা বিভাগ কর্তৃক একটি বৃহৎ সেনানিবাস নির্মানের আয়োজন চলিতেছে।

এই সামরিক পূর্ত বিভাগে এক বাঙালী সবেমাত্র দানাপুর থেকে এই রাণীক্ষেতে বদলী হয়ে এসেছেন।

প্রাতেঃ কিছু সামান্য কাজকর্ম—তারপরে আবার অখণ্ড অবসর। প্রায়সই এই অবসর সময় কুলী-মজুর-ডাকবিভাগের পিয়ন প্রভৃতি ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ চারিতার মধ্যেই কাটে।

সম্মুখে নাগাধিরাজ হিমালয়। কন্দরে কন্দরে ইহার কত যোগী, কত সিদ্ধ সাধু-সন্ন্যাসী তপস্যায় রত। জন্মজন্মান্তরের পুণ্যফলে কোনো কোনো ভাগ্যবানের জীবনে ঘটে তাঁহাদের আবির্ভাব, প্রকাশিত হয় দেবাতাত্মা হিমালয়ের প্রকৃত স্বরূপ।

পূর্তবিভাগের এই কর্মচারীটি স্থানীয় লোকেদের মুখে নানা অলৌকিক কাহিনী, নানা জনশ্রুতি শুনেছেন। আরও জানিয়েছেন অদূরস্থ দ্রোণগিরি শিবকল্প তাপসদের এক বিচরণভূমি। এখানে তাঁহাদের নানা কৃপালীলা নাকি অনুষ্ঠিত হয়।

সেদিন তাঁহার অন্তরে কৌতুহল জাগিয়া উঠিল। পাহাড়টিকে ভাল করিয়া একবার দেখিয়া আসা মন্দ কি? বিকালবেলায় এ উদ্দেশ্যে তাঁবু হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

রানীক্ষেত হইতে চারগাছের দল দল। অদূরে দুর্গম পাহাড়ের সারি পর পর উঁচু হইয়া গিয়াছে ঊর্ধ্বে নীলাকাশের মহাশূন্যে।

পাকদণ্ডির আঁকাবাঁকা বনপথ দিয়া চলিতে চলিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল। সম্মুখেই চোখ পড়ে নন্দাদেবীর গিরি-চূড়ায় অস্তরাগের অপরূপ সমারোহ। দূরে দিক্‌চক্রবালে চিরতুষারমণ্ডিত পর্বতশৃঙ্গের তরঙ্গমালায় ছাড়াইয়া পড়ে তাহার বর্ণচ্ছটা। দেবাদিদেব ধূর্জটির তাম্রাভ জটাজালে যেন দিগন্ত ঢাকিয়া গিয়াছে।

আত্মবিস্মৃত তরুণ এ মহিমময় দৃশ্যের দিকে চাহিয়া আছেন।

অকস্মাৎ নির্জন দ্রোণগিরি কম্পিত করিয়া ধ্বণিত হইল—

"শ্যামাচরণ! শ্যামাচরণ লাহিড়ী!"

একি! কে এই জনমানবহীন পার্বত্য অঞ্চলে তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিতেছে? সরকারী টেলিগ্রাম পাইয়া শ্যামাচরণ হঠাৎ দানাপুর হইতে পাঁচশত মাইল দূরে এই রাণীক্ষেতে চলিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু এই অঞ্চলে কোন লোকই তো তাঁহার পরিচিত নয়! অন্তরে কিছুটা ভয়ের সঞ্চার হইল। আবার কৌতুহলও জাগিল।

কণ্ঠস্বর অনুসরণ করিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইয়া গেলেন! দেখিলেন, অদূরে পর্বত গুহার দ্বারে তেজঃপুঞ্জকলেবর, জটাজুটসমন্বিত কে যোগী সন্ন্যাসী একাকী দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি যেন শ্যামাচরণের জন্যই অপেক্ষমাণ!

আয়ত নয়ন দুইটিতে দিব্য আনন্দের দ্যুতি। যোগীবর নিকটে আসিয়া প্রসন্ন মধুর কণ্ঠে কহিলেন, "শ্যামাচরণ, অব্ তুম আগয়া! ব্যয়ঠ্ যাও বিশ্‌রাম কর্ লো। ম্যাঁয়হী তুমহে পুকার রহা থা!" অর্থাৎ—শ্যামাচরণ, তুমি তাহলে এসে গিয়েছ! এবার বিশ্রাম কর। আমিই তোমায় এতক্ষণ ডাকছিলাম।

শঙ্কা ও সন্দেহ শ্যামচরণের মনে ভিড় করিতেছে। তাড়াতাড়ি কোনমতে একটি শুষ্ক প্রণাম জানাইয়া দাঁড়ালেন।

যোগী সাদরে আহ্বান জানাইলে কি হইবে, শ্যামাচরণের মনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব সহজে যাইতে চায় না। মনে মনে কেবলই ভাবিতেছেন, তাই তো, এ সাধু আমার নাম কি ক'রে জানলো? হয়তো কোনো পিয়ন বা পাহারাদারের কাছে জেনে নিয়েছে।

পরম আশ্চর্য্যের কথা, মনে এই চিন্তা খেলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই যোগী অবলীলায় শ্যামাচরণের পিতৃপুরুষের নাম, ধাম পরিচয় সবকিছু এক নিঃশ্বাসে বলিয়া দিলেন। শুধু তাহাই নয়, ঘনিষ্ট লোকের মতো তাঁহার দিকে তাকাইয়া কেবলই তিনি মধুর হাসি হাসিতেছেন।

ক্ষণপরে কহিলেন, "বেটা, মন তোমার বৃথা সন্দেহে আলোড়িত হচ্ছে। জেনে রেখো আমি তোমার নিতান্ত আপন জন— তোমারই প্রতীক্ষায় এ দুর্গম গিরিশিখরে

বসে আছি। একবার ভালো করে ভেবে দেখ দেখি, এ পাহাড়ে আগে তুমি আর কখনো এসেছিলে কিনা?"

সস্নেহে হাতটি ধরিয়া শ্যামারচণকে তিনি গুহার অভ্যন্তরে নিয়া গেলেন। স্বল্পালোকে দেখা গেল, এক কোণে পড়িয়া আছে একটা বাঘছাল, ধুনি, দণ্ড ও কমণ্ডল।

রহস্যময় মহাপুরুষ শ্যামাচরণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখতো, এগুলো চিনতে পারছো কিনা? এসব যে তোমরই পরিত্যক্ত জিনিস। এসব কথা কি একটুও কি তোমার স্মরণে আসছে না?"

বিস্ময়বিমূঢ় শ্যামারচরণ স্মৃতির দুয়ারে আঘাত করিতেছেন, কিন্তু কোন কিছুই মনে করিতে পারিতেছেন না।

যোগীবর স্মিতহাস্যে আরো কাছে আসিলেন, হস্তদ্বারা স্পর্শ করিলেন শ্যামাচরণের মেরুদণ্ড। এ কি ইন্দ্রজাল! শ্যামাচরণের মনোলোকের যবনিকাটি মুহূর্তমধ্যে কোথায় অপসৃত হইয়া গিয়াছে। তড়িং সঞ্চালিত তন্ত্রীর মতো সাড়া দেহটি তাঁহার বার বার কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, দেহে জাগিতেছে অলৌকিক আনন্দের শিহরণ।

পূর্বজন্মের অধ্যত্ম-জীবনের চিত্রপট শ্যামাচরণের নয়ন সমক্ষে সহসা উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল। জন্মন্তরের ব্যবধান শক্তিধর মহাযোগীর পুণ্যকরস্পর্শে এক নিমিষে আজ ঘুচিয়া গিয়াছে। তিনি চিনিলেন— এই দণ্ড, কমণ্ডলু, বাঘছাল ও পবিত্র ধুনি তাঁহারই পূর্বজন্মের ব্যবহৃত বস্তু; সম্মুকে দণ্ডায়মান এ যোগী তাঁহার পূর্বজন্মের গুরু—আর তিনি তাঁহার ইহকালের পরকালের পরমাশ্রয়।

সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া শ্যামাচরণ যুক্তকরে দণ্ডয়মান রহিলেন।

যথাসময়ে দীক্ষা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া গেল। একদিকে উপযুক্ত অধিকারী শিষ্য, অপরদিকে কৃপাবর্ষণে উন্মুখ মহাশক্তিধর সদ্‌গুরু—এ যেন মণিকাঞ্চন সংযোগ। বিস্ময়কর দ্রুততার সহিত লাহিড়ী মহাশয় যোগসাধনার পদ্ধতিসমূহ আয়ত্ত করিলেন। নবীন সাধক গুরুশক্তিতে উদ্দীপিত—তাই গুরুর কৃপায় একের পর এক লাভ করিলেন অতীন্দ্রিয় রাজ্যে বহুতর দুর্লভ অনুভুতি।

শক্তিধর গুরু যোগসিদ্ধির অনেক কিছু ঐশ্বর্য এ সময়ে অকৃপণ করে ঢালিয়া দেন, আর আত্মনিবেদিত শ্যামাচরণ তাহা গ্রহণ করেন অপুর্ব নিষ্ঠায়।

রোজকার সাধনা ও যোগক্রিয়া শেষ হইলে লাহিড়ী মহাশয় গুরুর সান্নিধ্যে আসিয়া বসেন, যোগ-রাজ্যের নানা সাধনা রহস্য শ্রবণ করেন। যোগীজীবনের বিচিত্র কাহিনী একএকদিন তাহাকে বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া ফেলে। সিদ্ধযোগী মহা

আত্মিয়দের লীলাভূমি এই পবিত্র হিমালয়। প্রতিশৃঙ্গে, প্রতি কন্দরে ইহার অধ্যাত্মলোকের কত নিগূঢ় ধন সঞ্চিত রহিয়াছে তাহার পরিমাপ কে করিবে!

বাবাজী মহারাজের মুখ হইতে শ্যামাচরণ এ সময়ে স্থনীয় এক মহাযোগীর কথা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হন—

দ্রোণগিরির এই জনমানবহীন গুহা হইতে মাইল পাঁচেক দূরে দেখা যায় এক সুপ্রাচীন জীর্ণ দেবালয়। স্থাটি এক সিদ্ধ মহাপুরুষের বিচরণক্ষেত্র। সাধু-সন্ন্যাসীদের মতে এই যোগসিদ্ধ মহাপুরুষের বয়সের কোনো হিসাব নাই। স্থনীয় অধিবাসীরা বলে—এই মহাত্মা দ্রোণগিরির অভিভাবক, পৌরাণিক আমলের অমর মানুষ, ‘অশ্বত্থমা’ নামে অনেকে এ রহস্যময় মহাপুরুষকে অভিহিত করে।

কাঠের খড়ম পায়ে, গভীর রাত্রে খট্‌খট্ শব্দে ইনি একবার করিয়া পূর্বোক্ত ভগ্ন দেবালয়ে প্রবেশ করেন, দিব্য দেহ-জ্যোতিতে চতুর্দিক তখন আলোকিত হইয়া উঠে।

যোগসাধন-পথের নতুন পথিক লাহিড়ীমহাশয় কৌতূহলী হইয়া উঠেন এবং তাঁহার সনির্বন্ধ অনুরোধে গুরুজী এক নিশীথে দূর হইতে তাঁহাকে এই মহাত্মার দেহজ্যোতি দর্শন করান।

বাবাজী মহারাজ বলিতেন, ‘‘ওখানকার অনেক মৃতকল্প রোগীদের এই মহাত্মার কৃপার উপর নির্ভর করে পাহাড়ে ফেলে রেখে যায়। তাঁর কৃপা-দৃষ্টিপাতে তারা বেঁচে ওঠে।’’

লাহিড়ীমহাশয় নিজেও একদিন ইহার কিছু পরিচয় পান—।

একদিন দুই তিনজন সাধুর সহিত তিনি ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। পথ চলিতে চলিতে একজন সঙ্গী হঠাৎ অরণ্যের এক বিযাক্ত ফল খাইয়া পীড়িত হইয়া পড়ে। প্রবল ভেদবমি দেখা দেয়। এদিকে রাত্রির অন্ধকার ধীরে ধীরে ঘনাইয়া আসিতে থাকে। এই আকস্মিক বিপদে সকলে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন।

সম্মুখে মহাত্মা ‘অশ্বত্থমা’র ভগ্ন দেউলের চূড়া। অপর কোনো উপায় না দেখিয়া তাঁহার দ্রোণগিরির ঐ রহস্যময় মহাপুরুষের আশ্রয়ই সাধুটিকে রাখার সিদ্ধান্ত করিলেন। সে তখন মৃত্যুপথের যাত্রী। সকলে ধরাধরি করিয়া আনিয়া জরাজীর্ণ দেউলের একপাশে তাহাকে শোয়াইয়া রাখিলেন।

সাধুটি কিন্তু পরদিনই সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসে। তাহার মুখে পর্বতশীর্ষচারী মাহাত্মার কৃপা কাহিনী শুনিয়া লাহিড়ীমহাশয়ের বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

মৃতকল্প সাধুটি জীবন সম্বন্ধে হাতাশ হইয়া পড়িয়া আছে, এমন সময় রহস্যময় পুরুষ সেখানে আবির্ভূত হন, রোষকষায়িত নেত্রে গর্জন করিয়া বলেন, ‘‘এখানে কে রে তুই?’’

সঙ্গে সঙ্গেই আসে প্রচণ্ড পদাঘাত। এ আঘাতের ফলে রোগী গড়াইতে গড়াইতে সন্নিহিত নিম্নভূমিতে পড়িয়া যায়। কিন্তু পরম বিস্ময়ের কথা, কিছুকাল পরেই তাহার দেহে বলের সঞ্চার হইতে থাকে। তারপর পায়ে হাঁটিয়া সে নিচে চলিয়া আসে।

দ্রোণগিরি অঞ্চলের এইসব সিদ্ধ-যোগীদের লীলা কাহিনী নবীন সাধক লাহিড়ীমহাশয়ের চেতনায় প্রচণ্ডভাবে নাড়া দেয় অতীন্দ্রিয় রাজ্যের নানা কাহিনী, নানা অলৌকিক তথ্য শুনিয়া তিনি আরও উদ্বুদ্ধ হইয়া ওঠেন।

এ সময়ে চমকপ্রদ যোগবিভূতি দেখাইয়া দু-একজনের গুরুভ্রাতাও তাঁহাকে কম বিস্মিত করেন নাই।

একদিন লাহিড়ী মহাশয় তাঁহার এক গুরুভ্রাতা ও কয়েকটি সাধুসহ খরস্রোত পার্বত্য নদী গর্গাস-এর অপর শৌচাদির জন্য গিয়াছেন। ফিরতে সেদিন তাঁহাদের বেশ দেরি হইয়াগেল। ইতিমধ্যে নদীতে হড়্‌কা বাণ আসিয়া পড়ে, দুই কুলের বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হইয়া যায়। তরুণ সাধকেরা তো প্রমাদ গণিলেন, তাই তো এ জলোচ্ছ্বাস অতিক্রম করা যে অসম্ভব!

গুরুভ্রাতাদের একজন ছিলেন অষ্টসিদ্ধিপ্রাপ্ত যোগী। মস্তক হইতে তাড়াতাড়ি পাগড়ীটি খুলিয়া নিয়া তিনি এ সময়ে এক অলৌকিক কাণ্ড করিয়া বসিলেন। পাগড়ীটি জলের মধেয নিক্ষেপ করিয়া সঙ্গীদের কহিলেন, "তোমরা এক মুহূর্ত দেরি না ক'রে এর ওপর হাত রেখে একে একে অপর পারে চলে যাও।"

সঙ্গীরা অগৌণে জলে নামিয়া পড়িলেন। শক্তি সঞ্চারিত এই ভাসমান বস্ত্রখণ্ড ধারণ করিয়াই সেদিন সকলে নদীর অপর পারে আসিয়া পৌঁছিলেন।

উত্তরকালে লাহিড়ীমহাশয়ের মুখে সেদিনকার এ ঘটনাটির চমকপ্রদ বর্ণনা মাঝে মাঝে শোনা যাইত।

ঐ অলৌকিক বস্ত্র-সেতুর রহস্য সম্বন্ধে তিনি গুরুদেবকে একদিন প্রশ্ন করিয়াছিলেন। উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "বেটা, এতে বিস্ময়ের তো কিছু নেই। অষ্টসিদ্ধি পেয়েছে বলেই তোমার সাধন পন্থা অনুসরণ করলে তুমিও অতি সহজে এ ধরণের যোগবিভূতি প্রকাশের মধ্যে দিয়া গুরুদেব সেদিন তাঁহারই অন্তরে উদ্দীপনার সঞ্চার করিতে চাহিয়াছিলেন।

গুরুভ্রাতাদের কাছে বসিয়া নবীন যোগী এই সময়ে বাবাজী মহারাজের যোগবিভূতির নানা কাহিনী শুনিতেন। দ্রোণগিরিতে থাকিতে তিনি নিজেও ইহার কিছু পরিচয় পাইয়াছিলেন।

[শ্যামাচরণ লাহিড়ীর অত্যাশ্চর্য্য জীবনের কথা আপনারা পাঠ করলেন। এবং এই অত্যাশ্চর্য্য জীবনীটিও বহুল প্রচারিত। এবার আপনাদের কাছে এক কলিকাতার

গৃহস্থ সন্ন্যাসীর কথা বলিব। যার জীবনী এক কথায় অসাধারণ। এই যোগী সর্বদাই নিজেকে অন্যদের থেকে গুটিয়ে রাখতেন। প্রথম জীবনে ছিলেন বিপ্লবী, পরবর্ত্তীকালে সাধারণ মানুষ জানতে পারে তাঁর যোগবিভূতির কথা। শোনা যায় পূর্ব জন্মে ছিলেন মহর্ষি যাজ্ঞবাল্কের অংশ। পরবর্ত্তীকালে অদ্ভুতভাবে গুরু তাঁর কাছে ধরা দেয়। নাঙ্গাবাবা, রামঠাকুর, মহর্ষিরমন সবাই এক কথায় তাঁকে যোগী শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিয়া নিয়াছিলেন। যার অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা অনেকটাই গাঁজাখুরি বা রূপকথার গল্পের মতোই শোনায়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সব ঘটনাই ছিলো সত্য। এই একটা আশংকা করেছিলেন "ভারতের সাধকের" লেখক শঙ্করনাথ রায় (প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য)। ১৯৬৬তে যোগীশ্বরের দেহত্যাগের পর কাশীর শিবকল্প পুরুষ গোপীনাথ কবিরাজের অনুরোধে কলম ধরেন প্রমথনাথ। তাঁর সেই লেখা আজও অপ্রকাশিত। সেই লেখা প্রকাশিত হলে বাঙালী পাঠক সমাজ যে আজ উপকৃত হোতো এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু এই মহাত্মার জীবনী লেখার অর্ধেক কাজ করার পর প্রমথ নাথ দেহ রাখেন। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের ব্যাপার আজ পর্যন্ত যতজন—তাঁর জীবনী লিখতে শুরু করেছেন প্রত্যেকেই জীবনীর অর্ধেক লিখে— দেহ রাখেন। এটাও এক ট্রাজেডি। তাই এই মহাত্মার জীবনের কয়েকটা দিক আলোকিত করার চেষ্টা করলাম—বিশদ্ জীবনী লেখার দুঃসাহস দেখালামনা।]

"যোগীশ্বর কালীপদ গুহরায়"

—যোগীশ্বর শ্রীশ্রী কালীপদ গুহ রায়ের মহাশক্তি রূপ, তাঁর ভগবত্তার অন্যতম বৈশিষ্ঠ্য এই শাস্তা ও দত্তদাতার রূপ, রুদ্ররসের এই প্রাণ কাপানো রূপের কথা অনেকেরই অজানা।

তাই এখানে তাঁর পরিচয় কথঞ্চিৎ উদ্ঘাটন করার প্রয়াস। এ দুরবগাহ জীবন ও ব্যক্তিত্বের সম্যক পরিচয় দান যে মানুষের সাধ্যাতীত। এখানে একটা কথা বলার প্রয়োজন যে, যোগীরা কালীপদ গুহ রায়, তাঁর গুরুকে "বন্ধু ও ছোট কর্ত্তা সম্বোধন করেছেন। এই বন্ধু প্রকৃতপক্ষে হচ্ছেন, এক মহাযোগী—যার নাম অণঙ্গদেব প্রকৃতপক্ষেশ্রীশ্রী রামঠাকুরের গুরু, ও যোগীরাজ শ্রীশ্রী কালীপদ গুহ রায়ের গুরুদেব একই ব্যক্তি। অনেকস্থানে এনাকে "লালবাবা" নামে অভিহিত করা হয়। অনেকে এই মহাত্মাকে *দারাশিকোর" গুরু বলে অভিহিত করেন। তাঁহার শরীর কাশ্মীর দেশীয় ছিল বলিয়াই মনে হয়।

---

*যোগীরাজ শ্রী শ্রী কালীপদ গুহরায়ের জীবনী গোপীনাথ কবিরাজ লিখিত "সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গের" ষষ্ঠ খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

যোগীশ্বর কালীপদ গুহ রায়ের মুখে শোনা, সে বিশ্বামিত্রের শক্তি ধারণ করেন, এমন সব মহাসাধক ও আবির্ভূত হয়েছিলেন এই সময়ে। এদের দমন করে ঈশ্বরমুখীন করাই হচ্ছে তপস্যার সার্থকতা।

এ ভূমিকাও ছিল যোগীস্বরের।

তবে এখানে যে পরিচয় আমারা দিতেছি, তা ব্যবহারিক জ্ঞানগঞ্জের। অনেক সময়ে কালীপদ গুহ রায়ের সহিত, বন্ধু বা—ছোটকর্ত্তার সাক্ষাৎ ঘটতো এই কলকাতার ময়দানে। ওঁরা কাছে বসলেই একটা শুভ্রজ্যোতি ছড়িয়ে পড়তো আসে-পাশে। সেই জ্যোতির আলোক অতি প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি থেকে কলকাতার দৈহিক সংবাদপত্র সবই পড়া যেতো, কিন্তু বিস্ময়ের কথা—সেই দিব্য আলো, আশাপাশ দিয়ে ময়দানে ভ্রমণকারী বা প্রণয়ী যুগলেরা কখনই দেখিতে পাইতোনা।

এই প্রসঙ্গে পাঠকদের অবগতের জন্য জানাই যে, ব্যবহারিক জ্ঞানগঞ্জ যোগীরা যে কোনো স্থানে সৃষ্টি করিতে পারে। কিন্তু ভৌম জ্ঞানগঞ্জ কৈলাসের পরে এবং উর্দ্ধে অবস্থিত। প্রকৃত যোগীভিন্ন এইস্থানের সন্ধান কেহ পাইতে পারে না।

আর একটি কথা এ প্রসঙ্গে বলি।

স্থান নেপালের তরাই অঞ্চল।

একদিন রাত্রি দুটোর সময়ে একটা চেনা কণ্ঠের ডাকে যোগীরাজের ঘুম ভেঙে যায়। দেখেন—পাশে দাঁড়িয়ে আছেন, ছোট কর্ত্তা যিনি বন্ধুর প্রধান সহযোগী। ব্যস্ত হয়ে তিনি বলেন যে, তাড়াতাড়ি ওঠ অত্যন্ত জরুরী কাজ। এই বলে, ছোট কর্ত্তা যোগীরাজের হাত ধরে—উর্দ্ধ আকাশের পথে মিলিয়ে গেলেন। মিনিটপনেরোর পর পৌঁছালেন এক পর্ব্বত গুহার সম্মুখে। গুহার ভিতর থেকে ঝল্‌কাচ্ছে মৃদু শুভ্র আলোকের দ্যুতি। এক প্রৌঢ় তাপসের অঙ্গ থেকে সে আলোক নির্গত হচ্ছে। ছোটকর্ত্তা কালীদার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে নিচু স্বরে বললেন ''লগ্ন উপস্থিত''। তপস্বী এবারে তাঁর সংকল্প বাণী উচ্চারণ করে হোমকুণ্ডে পূর্ণহুতি দেবে।

এক মুহূর্ত দেরী করোনা এগিয়ে যাও ওর সমস্ত শক্তি আকযর্ণ করে নাও।

এবার গুহার ভেতরে দৃপ্ত পদে প্রবেশ করেন যোগীশ্বর, ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে দুটো হাত উত্তলোন করে বলেন, ''তিষ্ঠ!''

সঙ্গে সঙ্গে দ্বিদল থেকে একটা অত্যুজ্বল জ্যোতির প্রবাহ নির্গত হয়, ছড়িয়ে পড়ে ঐ তপস্বীর সর্ব শরীরে। ক্ষণপরেই সে জ্যোতি আবার ফিরে আসে স্বস্থানে!

গুহাস্থিত তপস্বী জোড়হস্তে নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকেন, দুই গণ্ড বেয়ে ঝরছে অশ্রু ধারা। কম্প্রকণ্ঠে বলেন, প্রভু, তুমি এসেছো?

"হ্যাঁ, বৎস, উত্তর দেন যোগীশ্বর। দক্ষিণ করতলে তাঁর তখন ফুটে উঠেছে বরাভয় মুদ্রা।

"কিন্তু আমার অভীষ্ট তো সাধিত হলোনা? দীর্ঘ বৎসরের তপস্যা হলো ব্যর্থ। সংকল্পিত পূর্ণাহুতিতে পড়লো বাধা। প্রভু নিজে আবির্ভূত হয়ে কেন করলে একাজ? আমার অর্জিত মহাশক্তির সবটা আকর্ষণ করে নিলে! তাহলে এবার আমি কি করবো?"

কিছু করতে হবেনা। নব সৃষ্টির যে সংকল্প নিয়ে তুমি পঞ্চাশ 'বৎসর কাটিয়েছ সিদ্ধাসনে বসে, এবার সে সংকল্পকে বিসর্জন দাও এই হোম কুণ্ডে। এবার তুমি আমার হয়ে যাও, আমাতে মিলিয়ে দাও তোমার সর্ব্বসত্তা।"

করঙ্গের সবটা জল হোমকুণ্ডে ঢেলে দিয়ে, আসন ছেড়ে উঠে আসেন মহাতপস্বী, সষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়েন শ্রীশ্রীযোগীশ্বরের চরণতলে।

এ প্রসঙ্গে আরো বলেছিলেন শ্রীযুক্ত কালীদা, 'যোগ ও তন্ত্রের তুঙ্গে ব'সে প্রকৃতিকে বশ ক'রে এক বিরাট কাণ্ড শুরু করেছিলেন এই মহাত্মা। ঐশ বিধানে, তাঁর সৃষ্টি উন্নয়নের সংকল্প ব্যর্থ হয়ে গেল, কিন্তু সাধন শক্তি বলে এবং ঈশ্বর কৃপায় বিলীন হলেন তিনি পরব্রহ্মের পরম সত্তায়।

এ প্রসঙ্গে জানাই যে, যোগীশ্বরের গুরুদেব "বন্ধু" ও তাঁর প্রধান সহচর ছোটকর্ত্তা, স্বামী বিশুদ্ধানন্দের গুরুদেব ভৃগুরাজ স্বামী, তাঁর প্রধান তিন সহচর শ্যামানন্দ — নীমানন্দ — জ্ঞানানন্দ।

যোগীরাজ শ্যামাচরণের গুরুদেব বাবাজী মহারাজ, কিন্তু—আমরা আর শক্তিধর মহাপুরুষের সন্ধান পাই যিনি দ্রোণপাহাড়ে অবস্থান করেন।

এদের প্রত্যেকেই নামে ভিন্ন, কিন্তু এদের কার্য্য প্রণালী প্রায় সবই এক। এরা তিনজনই আকাশ মার্গে গমন করতে সক্ষম। বিশুদ্ধানন্দ ছাড়া এরা দুইজনই কিন্তু ওই স্থানের নাম "জ্ঞানগঞ্জ" বলেন নি। এদের কথায় এই অঞ্চল দুটিতে পরম যোগীরা বাস করেন। বিশুদ্ধানন্দ যেহেতু এই যোগীদের বাসস্থান কে—"জ্ঞানগঞ্জ" বলিয়াছেন—সেহেতু আমিও তাহা "জ্ঞানগঞ্জ" বলিয়া অভিহিত করলাম। এখন গুরু ধাম না গুরুরাজ্য না "জ্ঞানগঞ্জ" তাহা বলা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। পাঠকরাই ইহার বিচার করিবেন।

সমাপ্ত

আমাদের প্রকাশনার পুস্তক সমূহ

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ঠাকুর শাস্ত্রী পঞ্চতীর্থের

চিকিৎসা বিধানে তন্ত্রশাস্ত্র (১—৩) ১৪৫ ৲

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীনিত্যানন্দ

(বৈষ্ণব সংস্কৃতি ও গবেষণা বিষয় গ্রন্থ) ৪০ ৲

সজল বসু সম্পাদনা

ভারতের সমাজ ভাবনা— দুখণ্ডে ৪০ ৲

ওয়েষ্ট বেঙ্গল দ্যা ভাইয়োলেন্ট ইয়াস্ ২৫ ৲

শিবনাথ শাস্ত্রীর

মহান পুরুষদের সান্নিধ্যে ৩০ ৲

ডঃ বেণীশংকর শর্মার

বিবেকানন্দের জীবনের এক বিস্মৃত অধ্যায় ৫০ ৲

রামদয়াল মজুমদারের

গীতা পরিচয় ৩০ ৲

গীতা তিন খণ্ডে [যন্ত্রস্থ]

স্বামী মুক্তানন্দের

মাধব পাগলা ও রামঠাকুরের কথা— দুই খণ্ডে ৫০ ৲

ডঃ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়ের

যোগের কথা [খুব শিঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে]

তন্ত্রের কথা [খুব শিঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে]
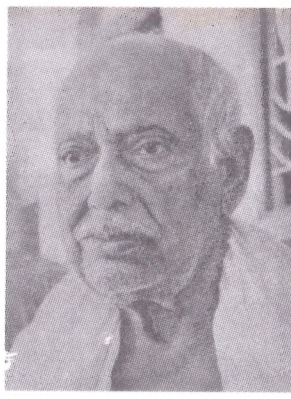
মহামহোপাধ্যায় শ্রী গোপীনাথ কবিরাজ ভারতীয় সাধনা ও মনীষার ক্ষেত্রে একটি স্মরণীয় নাম। অলোক সামান্য প্রতিভা ও তত্বজ্ঞানের আলোকে তাঁহার জীবন সমুজ্জ্বল। কাশীধামে অর্ধ-শতকের উর্ধকাল তিনি জ্ঞানচর্চায় ও সাধনার অনুশীলনে নিমগ্ন আছেন এবং সকলের কাছে সচল বিশ্বনাথ রূপে পূজিত ও সমাদৃত হইয়া আসিতেছেন।

জন্ম ১৮৮৭ সালে, ৭ই সেপ্টেম্বর পূর্ববঙ্গের ধামরাই গ্রামে।

ঢাকা জুবিলী স্কুল হইতে ১৯০৫ সালে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বাস্থ্যের কারণে উচ্চতর শিক্ষালাভার্থে জয়পুরে গমন করেন। পরে স্নাতকোত্তর শিক্ষার জন্য কাশীতে আসেন এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়া এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

কর্মজীবনও আরম্ভ হয় কাশীতেই, প্রথম বেনারস কুইন্স কলেজের (অধুনা সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়) সরস্বতী ভবনের গ্রন্থাগারিকরূপে পরে তাহারই অধ্যক্ষরূপে বিশিষ্ট কীর্তি অর্জন করেন। এই সময়ই সরস্বতী ভবন টেক্সট ও স্টাডিজ এই শিরোনামে তাঁহার সম্পাদনায় বহু অমূল্য প্রাচীন গ্রন্থ ও সে সম্বন্ধে আলোচনাত্মক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া তাঁহার অজস্র নিবন্ধ ও গ্রন্থাবলী ক্রমশঃ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে থাকে। ভারত সরকার তাঁহাকে মহামহোপাধ্যায় ও পদ্মবিভূষণ উপাধিতে ভূষিত করেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সামাজিক ডি. লিট উপাধি প্রদান করেন।

কিন্তু এসব পরিচয় তাঁহার বাহ্য পরিচয় মাত্র তাঁহার অন্তর্জীবনের অতলস্পর্শী অনুভবের মধ্যেই তাঁহার

উদ্বোধন — ১৯৯৪, ২৮শে এপ্রিল

মহাপুরুষদের আবাসস্থল

তাপস বসু

অনেক মহাপুরুষ, দিব্যজ্ঞানী সাধক লোকালয় থেকে বহুদূরে নির্জনে বাস করেন। এই নির্জনবাসের মধ্য দিয়ে তাঁরা আহরণ করেন মহাজ্ঞান। পারমার্থিক পূর্ণতা অর্জনে মহাপুরুষদের নির্জনবাস প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। আলোচ্য গ্রন্থে হিমালয় কেন্দ্রিক তিব্বতের এক অংশে গ্রন্থকারের দীক্ষাগুরু এবং রাম ঠাকুরের কৌশিকী আশ্রমকে 'জ্ঞানগঞ্জ' রূপে চিহ্নিত করেছেন।

'জ্ঞানগঞ্জ' আসলে সিদ্ধ-পুরুষদের চরম সাধনার পরমস্থান। সেদিক থেকে অভিনব তো বটেই। গোপীনাথ কবিরাজ লিখছেন ঃ "এই স্থান সাধারণ ভৌগোলিক স্থানের ন্যায় নহে, ইহা যদিও গুপ্তভাবে ভূ-পৃষ্ঠে বিদ্যমান আছে, তথাপি ইহার প্রকৃত স্বরূপ বহুদূরে প্রকৃত যোগী ভিন্ন এই স্থানের সন্ধান কেহ পাইতে পারে না, ইহাতে প্রবেশলাভ তো দূরের কথা।"

চরম সাধনার পর্যায়ে উন্নীত হয়ে যে মহাজ্ঞান অর্জন করা সম্ভব আসলে সেই মহাজ্ঞানার্জনের স্থান 'জ্ঞানগঞ্জ' — লেখক এটাই বোঝাতে চেয়েছেন। পারমার্থিক সাধনের এই পথ সাধারণজনের জন্য নয়। সিদ্ধপুরুষ, মহাজ্ঞানী মহাজনের আবাসভূমিই 'জ্ঞানগঞ্জ'।

আনন্দবাজার পত্রিকা

৫ই এপ্রিল, ১৯৯২

সহজ করে বলা চাই

মণি গঙ্গোপাধ্যায়

ভারতবিশ্রুত মনীষী ও সাধক মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজের রচনাবলী যাঁরা পড়েছেন তাঁদের কাছে 'জ্ঞানগঞ্জ' নামটি সুপরিচিত। এই জ্ঞানতপস্বী তাঁর গুরু শ্রীশ্রী বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস দেবের কাছে আধ্যাত্মিক জগতের দুটি বিস্ময়বস্তু সূর্যবিজ্ঞান ও জ্ঞানগঞ্জের কথা প্রথম শুনেছিলেন। বিশুদ্ধানন্দের জীবনীতেও এই জ্ঞানগঞ্জের অনেক বিস্ময়কর কাহিনী এবং এই গোপন রহস্যপীঠ প্রেরিত অনেক নির্দেশের উল্লেখ আছে। পরবর্তীকালে সাধুসঙ্গে ব্রতী কবিরাজ মহাশয় পরমযোগী রাম ঠাকুরের সান্নিধ্যলাভ করেন এবং হিমালয়ের প্রত্যন্ত প্রদেশে গোপন, জ্ঞানগঞ্জের সমতল কৌশিকী আশ্রমের বৃত্তান্ত অবগত হন। এইভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জ্ঞানগঞ্জ নামক অপ্রাকৃত ভূমির সম্পূর্ণ কাহিনী জানার কৌতুহল অধ্যাত্মপিপাসু পাঠকবর্গের ছিলই। আলোচ্য গ্রন্থটি প্রকাশ করে সেই কৌতুহল তৃপ্ত করার জন্য প্রকাশক অবশ্যই ধন্যবাদার্হ।